নজরুল-রচনাবলী

নজরুল-রচনাবলী

জন্মশতবর্ষ সংস্করণ

একাদশ খণ্ড

বাংলা একাডেমী ঢাকা

বাএ ৪৮২৫

প্রথম প্রকাশ : কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড (আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় তিন খণ্ডে যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭, ১৯৭০ সালে) বাংলা একাডেমী সংস্করণ (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড যথাক্রমে ১৯৭৭ এবং প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধ ১৯৮৪)। পুনর্মুদ্রণ : ১৯৭৫, ১৯৭৬ ও ১৯৮৪ সালে। নতুন সম্পাদকমণ্ডলীর সম্পাদনায় সংশোধিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ (চার খণ্ডে) ১৯৯৩ সালে। নতুন সম্পাদনা পরিষদ–সম্পাদিত নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ একাদশ খণ্ড, ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭, ২৫শে মে ২০১০। পাণ্ডুলিপি : সংকলন উপবিভাগ। প্রকাশক : জাহিদুর রহমান, পরিচালক, গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী, ৩ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা ১০০০। মুদ্রক : মোবারক হোসেন, ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমী প্রেস, বাংলা একাডেমী। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। মুদ্রণসংখ্যা : ২২৫০। মূল্য : ২০০.০০ টাকা।

Abdul Quadir (ed.), Nazrul-Rachanabali, Central Board for the Development of Bengali edition (Three Volumes in 1966, 1967 & 1970 respectively), Bangla Academy edition (Fourth & Fifth Volumes) in 1977 & 1984. New edition (Four Volumes in 1993). Nazrul Birth Centenary edition : Vol. XI, May, 2010. Manuscript : Compilation Department. Published by : Zahidur Rahman, Director, Research, Compilation & Folklore Division, Bangla Academy, 3 Kazi Nazrul Islam Avenue, Dhaka 1000, Bangladesh. Printed by : Mobarak Hossain, Manager, Bangla Academy Press, Dhaka 1000. Cover design : Dhruba Esh. Print-run : 2250. Price : Taka 200.00 only.

ISBN 984-07-4833-5

নজরুল-রচনাবলী

জন্মশতবর্ষ সংস্করণ

একাদশ খণ্ড

সম্পাদনা-পরিষদ

রফিকুল ইসলাম

সভাপতি

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌

সদস্য

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ

সদস্য

আবদুল মান্নান সৈয়দ

সদস্য

আবুল কাসেম ফজ্‌লুল হক

সদস্য

নজরুল-রচনাবলী

প্রথম সংস্করণের সম্পাদক

আবদুল কাদির

নতুন সংস্করণের (১৯৯৩) সম্পাদনা-পরিষদ

আনিসুজ্জামান
সভাপতি

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম
সদস্য

রফিকুল ইসলাম
সদস্য

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌
সদস্য

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
সদস্য

মনিরুজ্জামান
সদস্য

আবদুল মান্নান সৈয়দ
সদস্য

করুণাময় গোস্বামী
সদস্য

সেলিনা হোসেন
সদস্য-সচিব

নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমী নজরুল জন্মশতবার্ষিক উৎসবের পরপরই কবির ইতোপূর্বে বাংলা উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলা একাডেমী-প্রকাশিত রচনাবলীর একটি কালক্রমিক, পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত ও অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ বিন্যাস ও নবসংযোজনযুক্ত নতুন সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। কারণ, নজরুল এমন এক বিস্ময়কর প্রতিভা ও বিপুলপ্রজ কবি যে, স্বল্পসময়ের সাহিত্য জীবনেও তাঁর রচনাসংখ্যা বেশুমার ; এবং সেই অবিরল ধারায় সৃষ্ট রচনা কবি কখন, কোথায়, কীভাবে লিখেছেন তার হদিস পাওয়া যেমন সহজ নয়, তেমনি তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেছেন কি-না সে সম্পর্কেও নিশ্চিত সংশয় আছে। ধারণা করা হয়, তাঁর সে-সব বিপুল রচনার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন জনের সংগ্রহে অগ্রন্থিত অবস্থায় থেকে গিয়েছিল ; এবং কিছু রচনা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও তা সংগৃহীত না হওয়ায় কোনো গ্রন্থভুক্ত হয়নি। জন্মশতবার্ষিক অনুষ্ঠানের পর এদিকে লক্ষ্য রেখে কবির রচনাবলীর একটি পরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশের জন্যে বাংলা একাডেমী ২০০৫ সালে 'নজরুল রচনাবলী জন্মশতবর্ষ সংস্করণ' প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ-কাজে কবি আবদুল কাদিরের সুদক্ষ সম্পাদনায় প্রকাশিত আদি নজরুল রচনাবলীর ভিত্তিমূলক সংস্করণ, অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে গঠিত সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে চারখণ্ডে বাংলা একাডেমী-প্রকাশিত নজরুল রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির 'নজরুল ইসলামের রচনাসমগ্র' এবং নজরুলের বিভিন্ন গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ও তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের বিভিন্ন সংস্করণের পাঠপর্যালোচনার পর সম্পাদকমণ্ডলী বর্তমান সংস্করণের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। এ সংস্করণের সম্পাদকমণ্ডলী নজরুলের কোনো কোনো গানের বাণীর ভিন্ন ভিন্ন পাঠ এতে প্রথমবারের মতো অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। বিশেষ করে নজরুলের গানের রেকর্ডে তাঁর গানের বাণীর যে-পাঠ পাওয়া যায় কবিকর্তৃক পরে তার সংশোধনকৃত পাঠও বর্তমান সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করায় বর্তমান সংস্করণটি এক ভিন্নমাত্রিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য লাভ করেছে। এই জটিল ও পরিশ্রমসাধ্য কাজটি অসীম ধৈর্য ও যত্নের সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন বিশিষ্ট নজরুল অনুরাগী গবেষক মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ।

নজরুল রচনাবলীর একাদশ খণ্ডটি প্রকাশিত হলো। এতে কবির 'নতুন সংযোজিত গান' এবং ইতোপূর্বে 'অগ্রন্থিত গান' সংকলিত হয়েছে। এছাড়াও 'বিবিধ' শিরোনামে নজরুলের কিছু রচনা, তাঁকে দেয়া অভিনন্দনপত্র, তাঁর কিছু চিঠিপত্র ও খুচরো রচনা এবং তাঁর লেখা বিভিন্ন লেখকের বইয়ের ভূমিকা, ধূমকেতু পত্রিকায় নামে-বেনামে ছদ্মনামে প্রকাশিত রচনা, কোরআন শরীফের একটি অংশের অনুবাদ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই লেখাগুলো আপাতদৃষ্টিতে তাঁর প্রধান লেখা হিসেবে বিবেচিত না হলেও, এ লেখাগুলোর গুরুত্বও সামান্য নয়। বিশেষ করে নজরুলের সৃষ্টি বৈচিত্র্য ও বহুমাত্রিকতা বোঝার জন্য এই রচনাগুলো যেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে পারে, তেমনি সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতিসহ তাঁর চিন্তাচেতনার নানাদিকের পরিচয়কে নতুনভাবে আমাদের দৃষ্টিগোচর করতে পারে। এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত আইরিশ বিদ্রোহী 'রবার্ট এমেট' শীর্ষক রচনাটি তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা বিশেষ করে বিদ্রোহী চেতনার স্বরূপ উন্মোচনে সহায়ক। 'বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক ক্ষুদ্র রচনাখানিও তাঁর সাহিত্য চিন্তাকে বুঝে নেয়ার জন্য মূল্যবান বলেই আমরা মনে করি। এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত কবির নানা আঙ্গিক ও দৃষ্টিভঙ্গির খুচরো রচনাগুলো কোনো না কোনোভাবে তাঁর স্বকীয়তা এবং জীবনদৃষ্টির পরিচয় বহন করে।

এই খণ্ডের 'নতুন সংযোজিত গান' এবং 'অগ্রন্থিত গানের' গুরুত্ব আলাদা। এইসব গানের কোনো কোনোটি গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডে ধারণ করা হয়েছে। মূল গানের সঙ্গে রেকর্ডে ধারণকৃত গানে যদি কোনো পার্থক্য বা পরিবর্তন থেকে থাকে তাহলে তার তাৎপর্য বুঝে নেয়ার জন্য এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত গানগুলো স্বতন্ত্রমূল্যে চিহ্নিত হবে। অন্যদিকে যারা অগ্রন্থিত গানগুলো আগে পড়বার সুযোগ পাননি তারা এই খণ্ডে গানগুলো পড়তে পেরে আনন্দিত বোধ করবেন। নতুন সংযোজিত গানের ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। আমরা আশাকরি, নজরুল রচনাবলীর একাদশ খণ্ডটি নজরুল প্রতিভার সামগ্রিক মূল্যায়নে বিশেষ সহায়ক হবে।

নানা সূত্র ও উৎস থেকে এইসব রচনা উদ্ধার করে বর্তমান খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরোনো দিনের হাতের লেখার উপর সময়ের অভিঘাতে লেখা অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় কবির পরিপূর্ণ পাঠ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সেসব ক্ষেত্রে ... দিয়ে বাক্য শেষ করা হয়েছে। এই অসম্পূর্ণতার জন্য পাঠকদের কাছে আমরা ক্ষমা প্রার্থী। আশা করি বর্তমান খণ্ডটি পাঠকদের সন্তুষ্টি লাভে সক্ষম হবে।

নজরুল রচনাবলীর বর্তমান সংস্করণ প্রস্তুত করার ব্যাপারে নজরুল-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম যে-নিষ্ঠায় সামগ্রিক কাজের তত্ত্বাবধান করেছেন এবং দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তা অতীব প্রশংসনীয়। কবি-সমালোচক-প্রবন্ধকার আবদুল মান্নান সৈয়দ, অধ্যাপক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ও অধ্যাপক আবুল কাসেম

ফজলুল হক তাঁদের স্ব স্ব কাজে যে আন্তরিক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন সেজন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও প্রকাশনার কাজে সম্পাদকমণ্ডলীকে সার্বক্ষণিকভাবে সহযোগিতা করেছেন সংকলন উপবিভাগের উপপরিচালক মাহবুব-উল-আজাদ চৌধুরী, কর্মকর্তা ফারহানা খানম এবং প্রকাশন সহকারী আবু মোঃ ইমদাদুল হক। বাংলা একাডেমী প্রেসের ব্যবস্থাপক মোবারক হোসেন, সহপরিচালক শেখ সারোয়ার হোসেন ও শুভ্রা বড়ুয়াকে তাঁদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।

বাংলা একাডেমী, ঢাকা
১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭॥ ২৫শে মে ২০১০

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রসঙ্গে

'নজরুল-রচনাবলী'র তিনটি খণ্ড প্রখ্যাত কবি, সমালোচক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় 'কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড' থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭ এবং ১৯৭০ সালে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সালে 'কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড' একীভূত হয় 'বাংলা একাডেমী'র সঙ্গে। সরকার কর্তৃক এই পরিবর্তন ও ব্যবস্থা গ্রহণের পর বাংলা একাডেমী থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র চতুর্থ খণ্ড ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড দুই ভাগে ১৯৮৪ সালে (প্রথমার্ধ জুনে ও দ্বিতীয়ার্ধ ডিসেম্বরে) কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায়ই প্রকাশিত হয়। 'নজরুল-রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে এবং তা পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৩ সালে। দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৭৬ এবং ১৯৮৪ সালে। ১৯৮৪ সালেই প্রকাশিত হয় তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ। আগেই বলেছি, চতুর্থ খণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড ১৯৮৪ সালে দুই ভাগে। চতুর্থ খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৪ সালে। কবি আবদুল কাদিরের জীবদ্দশায়, তাঁর সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র সব খণ্ডেরই নতুন সংস্করণ এবং পুনর্মুদ্রণ হয়েছে সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে ও তাঁর লেখা 'সম্পাদকের নিবেদন'সহ।

'নজরুল-রচনাবলী'র ব্যাপক চাহিদা থাকায় অল্পকালের মধ্যেই রচনাবলী-র সব খণ্ড বিক্রি ও নিঃশেষ হয়ে যায়। এই পটভূমিতেই 'নজরুল-রচনাবলী' পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ উদ্দেশ্যে এবং মরহুম কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশের জন্য ১৯৯২ সালে 'বাংলা একাডেমী' নয় সদস্য বিশিষ্ট সম্পাদনা-পরিষদ গঠন করে। এই পরিষদের সম্পাদনায় ১৯৯৩ সালে চার খণ্ডে 'নজরুল-রচনাবলী'র পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ব্যাপক চাহিদার ফলে 'নজরুল-রচনাবলী'র এই নতুন সংস্করণও যথারীতি নিঃশেষ হয়ে যায়। এই নতুন সংস্করণের প্রতিটি খণ্ড একাধিকবার পুনর্মুদ্রণের পরও 'নজরুল-রচনাবলী'র চাহিদা শেষ হয়নি। ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'-র নতুন সংস্করণ (১৯৯৩) একাধিকবার পুনর্মুদ্রিত হওয়া সত্ত্বেও, নজরুল-জন্মশতবার্ষিকীর সময় থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র অধিকতর সংশোধিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। বাংলা একাডেমী 'নজরুল-রচনাবলী'র জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং একটি নতুন সম্পাদনা পরিষদের ওপর এই

কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে। এই নতুন সম্পাদনা পরিষদ অদ্যাবধি ঢাকা ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'-র বিভিন্ন সংস্করণ এবং নজরুলের বিভিন্ন গ্রন্থের আদি বা পরবর্তী সংস্করণসমূহে সন্নিবেশিত প্রতিটি রচনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিলিয়ে বর্তমান সংস্করণের পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত করেন।

'নজরুল-রচনাবলী' : নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ একাদশ খণ্ডে 'নতুন সংযোজিত গান', 'অগ্রন্থিত গান' এবং 'বিবিধ রচনা' সংযোজিত হয়েছে। এই খণ্ডে নজরুলের অগ্রন্থিত প্রায় একশটি গান সংকলিত হলো। 'নজরুল-রচনাবলী'র নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণের প্রতিটি খণ্ডের শেষে নজরুলের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি এবং তাঁর গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক সূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একাদশ খণ্ডের পরিশিষ্টে নজরুলের অগ্রন্থিত গানের বাণীর পাঠান্তর যথাসম্ভব নির্দেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। 'নজরুল-রচনাবলী' একাদশ খণ্ডে সংকলিত ১৫টি আলোকচিত্র ভারত সরকারের বিদেশ মন্ত্রক মন্ত্রণালয়ের কূটনীতি বিভাগের সহযোগীতায় 'wisdom tree' প্রকাশিত কল্যাণী কাজী সম্পাদিত 'Nazrul The Poet Remembered' নামক অ্যালবাম থেকে সংগৃহীত। অপর একটি আলোকচিত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ভূঁইয়া ইকবালের সৌজন্যে প্রাপ্ত। 'নজরুল-রচনাবলী'র বিভিন্ন সংস্করণে মুদ্রণজনিত ত্রুটির দরুন এবং অন্যান্য কারণে যেসব বিচ্যুতি ঘটেছে, বর্তমান সংস্করণে সেগুলো সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে।

'নজরুল-রচনাবলী'র এই সংস্করণে নজরুলের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের কালানুক্রম বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে, তবে কবির অসুস্থতার পর সংকলিত এবং প্রকাশিত রচনাবলী তথ্যসূত্রের অভাবে কালানুক্রমিকভাবে প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব। এই বাস্তবতায় 'নজরুল-রচনাবলী' : নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণকে যথাসম্ভব প্রামাণিক করার চেষ্টা ও শ্রম সম্পাদনা-পরিষদ আন্তরিকভাবেই করেছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও নজরুলের সমস্ত রচনা এ সংস্করণে সংকলিত—এমন দাবি করা যাবে না। কারণ, আমাদের বিশ্বাস, এই রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডের অন্তর্গত রচনাসমূহের বাইরেও নজরুলের কিছু রচনা থাকা সম্ভব—যা এখনও জানা বা সংগ্রহ করা যায়নি। বস্তুত, 'নজরুল-রচনাবলী' সম্পাদনা ও প্রকাশনা একটি চলমান প্রক্রিয়া ; ভবিষ্যতে নজরুলের দুষ্প্রাপ্য কোনো রচনা সংগৃহীত হলে সেগুলোকে 'নজরুল-রচনাবলী'র পরবর্তী সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। আমরা এ-পর্যন্ত সংগৃহীত নজরুলের রচনাসমূহ সংকলন করার যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি। তবু হয়তো কিছু রচনা বাদ পড়ে যেতে পারে। শত সতর্কতা সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণপ্রমাদ এবং ত্রুটি-বিচ্যুতিও ঘটে থাকতে পারে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

উল্লেখযোগ্য যে, 'নজরুল-রচনাবলী' সম্পাদনার পথিকৃৎ কবি আবদুল কাদির। 'নজরুল-রচনাবলী'র শুধু প্রথম সংস্করণই নয়, পরে প্রকাশিত সব সংস্করণ আবদুল কাদির-সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র ভিত্তিতেই করা হয়েছে। সব সংস্করণেই সম্পাদক হিসাবে মুদ্রিত রয়েছে তাঁর নাম, অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাঁর লেখা প্রতিটি

সংস্করণের 'সম্পাদকের নিবেদন' এবং গ্রন্থপরিচয়। সুতরাং কবি আবদুল কাদিরের প্রয়াণের পর প্রকাশিত বিভিন্ন সংস্করণ নতুন সম্পাদনা-পরিষদ কর্তৃক পরিমার্জন এবং কিছু রচনা সংযোজন করা হলেও 'নজরুল-রচনাবলী'র আদি ও মূল সম্পাদক আবদুল কাদির। বাংলা একাডেমী 'নজরুল-রচনাবলী' : নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে একটি জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন করলেন। এই সংস্করণের 'সম্পাদনা পরিষদ'-এর পক্ষ থেকে আমরা বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ঢাকা
১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭॥ ২৫শে মে ২০১০

রফিকুল ইসলাম
সম্পাদনা-পরিষদের সভাপতি

প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন

১৯৬৪ সালের শেষের দিকে কেন্দ্রীয় বাঙ্‌লা-উন্নয়ন-বোর্ড বিদ্রোহী-কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমগ্র রচনাবলী কয়েক খণ্ডে প্রকাশের এক সময়োচিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তদনুসারে রচনাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলো। এই খণ্ডে নজরুল ইসলামের সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগের—যেই যুগে তাঁর অন্তরে দেশাত্মবোধ ছিল প্রধানতম প্রেরণা—সকল রচনা সংগ্রথিত হয়েছে। অবশ্য 'সংযোজন'-বিভাগে কবির কিশোর বয়সের রচনার নিদর্শনস্বরূপ তাঁর কয়েকটি কবিতা ও গান সন্নিবেশিত হয়েছে। এই যুগে তিনি যে-সকল শিশুপাঠ্য কবিতা লিখেছিলেন সেগুলি রচনাবলী-র তৃতীয় খণ্ডে স্থান পাবে।

নজরুলের দেশাত্মবোধের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা নানাজনে নানাভাবে করেছেন। রাজনীতিক পরাধীনতা ও আর্থনীতিক পরবশতা থেকে তিনি দেশ ও জাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তি চেয়েছিলেন। তার পথও তিনি নির্দেশ করেছিলেন। সেদিনের তাঁর সেই পথকে কেউ ভেবেছেন সন্ত্রাসবাদ—কারণ তিনি ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগের উদাহরণ দিয়ে তরুণদের অগ্নিমন্ত্রে আহ্বান করেছিলেন ; কেউ ভেবেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নিয়মতান্ত্রিকতা—কারণ তিনি 'চিত্তনামা' লিখেছিলেন ; কেউ ভেবেছেন প্যান-ইসলামিজম—কারণ তিনি আনোয়ার পাশার প্রশস্তি গেয়েছিলেন ; আবার কেউ ভেবেছেন মহাত্মা গান্ধীর চরকা-তত্ত্ব—কারণ তিনি গান্ধীজীকে তাঁর রচিত 'চরকার গান' শুনিয়ে আনন্দ দিয়েছিলেন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, এসব ভাবনার কোনোটাই সত্যের সম্পূর্ণ স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের সহায় নয়। প্রকৃতপক্ষে নজরুল তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগে ছিলেন কামাল-পন্থী,—কামাল আতাতুর্কের সুশৃঙ্খল সংগ্রামের পথই তিনি ভেবেছিলেন স্বদেশের স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য সর্বাপেক্ষা সমীচীন পথ। ১৩২৯ সালের ৩০শে আশ্বিন তারিখের ১ম বর্ষের ১৪শ সংখ্যক 'ধূমকেতু'তে তিনি 'কামাল' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন : 'সত্য মুসলমান কামাল বুঝেছিল' যে, 'খিলাফত উদ্ধার' ও 'দেশ উদ্ধার' করতে হলে 'হায়দারী হাঁক হাঁকা চাই ; .... ও-সব ভণ্ডামি দিয়ে ইসলাম উদ্ধার হবে না। ... ইসলামের বিশেষত্ব তলোয়ার।' কামাল আতাতুর্কের প্রবল দেশপ্রেম, মুক্ত বিচারবুদ্ধি ও উদার মানবিকতা নজরুলের এই যুগের রচনায় যে প্রভূত প্রেরণা যুগিয়েছিল তা বর্তমান খণ্ডের লেখাগুলো একত্রে পড়ে সম্যক উপলব্ধ হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

'নজরুল-রচনাবলী' প্রকাশের কাজে হাত দিয়ে আমরা দেখেছি যে, কবির অনেক কাব্যগ্রন্থেরই প্রথম সংস্করণ সংগ্রহ করা ইতোমধ্যেই দুষ্কর হয়ে উঠেছে। তাঁর কোনো

কোনো কাব্যগ্রন্থ পরের সংস্করণে অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'দোলন-চাঁপা'র উল্লেখ করা যেতে পারে। তার তৃতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের বহু বিখ্যাত কবিতা বাদ পড়েছে ; সে-স্থলে 'ছায়ানট' ও 'পূবের হাওয়া'র কিছু কবিতা সংযুক্ত হয়েছে। 'দোলন-চাঁপা'র গোড়ার দিকে 'সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে' স্থান পেয়েছিল ; তৃতীয় সংস্করণে সেটি বর্জিত হয়েছে। এই খণ্ডের গ্রন্থ-পরিচয়ে তা সঙ্কলিত হলো। বলা বাহুল্য যে, আমরা রচনাবলীতে কবির কবিতাগ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণই অনুসরণ করেছি।

আমাদের ধারণা যে, 'সংযোজন'-বিভাগে আমরা যেসব লেখা দিয়েছি, তাছাড়াও সে-সময়কার পত্র-পত্রিকাগুলি খুঁজলে কবির আরো কিছু লেখা পাওয়া যাবে—যা অদ্যাবধি গ্রন্থবদ্ধ হয়নি। কেউ যদি তেমন কোনো লেখার সন্ধান দিতে পারেন, তবে তা আমরা আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করবো এবং পরবর্তী সংস্করণে বা খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করবো।

কবির কোনো কোনো কবিতার রচনা-কাল ও উপলক্ষ নিয়ে ইতোমধ্যেই বহু বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। আমরা গ্রন্থ-পরিচয়ে যেসব তথ্য দিয়েছি, তাতে সে-বিতর্কের নিরসনে কিছু সহায়তা হবে। কিন্তু আমাদের হাতে প্রয়োজনীয় মাল-মশলা সব নেই ; সেজন্যই কবির অনেক রচনার প্রথম প্রকাশ-কাল নির্দেশ করা সম্ভবপর হলো না। আমাদের তরুণ গবেষকরা এ-বিষয়ে সন্ধান করে সকল জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করবেন, এ আশাই আমরা করছি।

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩

আবদুল কাদির

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন

কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ডের সুনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী 'নজরুল-রচনাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। এই খণ্ডে নজরুল ইসলামের সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় যুগের রচনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অবশ্য 'সংযোজন'-বিভাগের প্রথম তিনটি কবিতা তার সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগে রচিত ; এগুলি রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে সংযোজিত হলেই কালানুক্রম রক্ষিত হতো। প্রথম খণ্ডের 'নিবেদন'-এ বলা হয়েছিল যে, সে খণ্ডের 'সংযোজন'-বিভাগে যে সকল লেখা সংকলিত হয়েছে তাছাড়াও সে সময়কার পত্র-পত্রিকাগুলি খুঁজলে কবির আরো কিছু লেখা পাওয়া যাবে—যা গ্রন্থবদ্ধ হয়নি, এবং সেরূপ কোনো লেখা পাওয়া গেলে তা পরবর্তী খণ্ডে পরিবেশন করা হবে। বলা বাহুল্য যে, উক্ত তিনটি কবিতা রচনাবলী প্রথম খণ্ড প্রকাশের অব্যবহিত পরে আমাদের লক্ষ্যগোচর হয়েছে। 'প্রবন্ধ' বিভাগের শেষ দুটি নিবন্ধ কবির সাহিত্য-জীবনের চতুর্থ অর্থাৎ শেষ যুগে রচিত। সে যুগে কবির সম্পাদিত দৈনিক 'নবযুগ'-পত্রে তাঁর স্বাক্ষরিত এরূপ বহু সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সে-সকল দুর্লভ লেখা সংগ্রহ করা সম্ভবপর হলে চতুর্থ খণ্ডে সন্নিবেশিত হবে।

নজরুল তাঁর সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় যুগের সূচনায় যে মতবাদের প্রবক্তা হন, তা প্রত্যক্ষত গণতান্ত্রিক সমাজবাদ (ডেমোক্রেটিক সোস্যালিজ্‌ম)। তাঁর পরিচালিত 'লাঙলে' হয়েছিল তারই কালোপযোগী কর্ষণা। 'লাঙল' ছিল 'শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায়ের সাপ্তাহিক মুখপত্র' ; ১লা পৌষ ১৩৩২ মুতাবিক ১৬ই ডিসেম্বর ১৯২৫ তারিখে তার প্রথম (বিশেষ) সংখ্যাতেই সে-সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য ও 'চরম দাবি' বিবৃত করে নজরুল এক ইশতেহারে বলেন :

'নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ-স্বাধীনতা-সূচক স্বরাজ লাভই এই দলের উদ্দেশ্য। ...।

আধুনিক কলকারখানা, খনি, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ট্রামওয়ে, স্টীমার প্রভৃতি সাধারণের হিতকরী জিনিস, লাভের জন্য ব্যবহৃত না হইয়া, দেশের উপকারের জন্য ব্যবহৃত হইবে এবং এতৎসংক্রান্ত কর্মিগণের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিচালিত হইবে।

ভূমির চরম স্বত্ব আত্ম-অভাব-পূরণ-ক্ষম স্বায়ত্তশাসন-বিশিষ্ট পল্লী-তন্ত্রের উপর বর্তিবে—এই পল্লী-তন্ত্র ভদ্র শূদ্র সকল শ্রেণীর শ্রমজীবীর হাতে থাকিবে।'

ডেমোক্রেটিক সোস্যালিজমের প্রতি নজরুলের মনের প্রগাঢ় অনুরাগ তাঁর 'সাম্যবাদী', 'সর্বহারা' ও 'ফণি-মনসা'র বহু কবিতা ও গানে সুপরিস্ফুট। তাঁর 'মৃত্যু-ক্ষুধা' উপন্যাসের 'আনসার'-চরিত্র এই আদর্শবাদের আলোকে বিকশিত।

কিন্তু সেদিন কবি প্রবল আবেগ নিয়ে দেশের গণ-আন্দোলনের পুরোযায়ী চারণ হয়েছিলেন, তাতে ভাটা পড়লো দুটি কারণে। প্রথম কারণ : ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২রা এপ্রিল শুক্রবার থেকে কলকাতায় রাজরাজেশ্বরী মিছিল উপলক্ষে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সূত্রপাত। দ্বিতীয় কারণ : ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২২শে মে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে কংগ্রেস-কর্মী-সংঘের সদস্যদের উদ্যোগে 'হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট' নাকচ করে প্রস্তাব গ্রহণ। নজরুল কৃষ্ণনগর সম্মেলনের উদ্বোধন করেছিলেন 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' গেয়ে, কিন্তু কাণ্ডারিদের কানে তাঁর আবেদন পৌঁছলো না। অগত্যা নজরুল আত্মরতির সন্ধান করলেন 'মাধবী-প্রলাপ' ও 'অনামিকা'র রোমান্টিক রূপ-জালে ক্রমে আত্মমগ্ন হলেন 'বুলবুল' ও 'চোখের চাতক'-এর সুর-লোকে। কিন্তু সেই রূপ ও সুরের মোহন মায়াজাল ভেদ করেও বারবার তাঁর কানে বেজেছে নিপীড়িত মানবতার কাতর আর্তনাদ ; তিনি নিরাসক্ত শিল্পীর আনন্দময় আসন ছেড়ে এসে রুদ্র কণ্ঠে গেয়েছেন 'সন্ধ্যা', 'প্রলয়-শিখা', 'চন্দ্রবিন্দু'র বেদনার্ত গাথা-গান।

'মৃত্যু-ক্ষুধা' উপন্যাসের 'আনসার' একস্থানে বলেছেন, 'নীড়হারাদের সাথী আমি। ওদের বেদনায়, ওদের চোখের জলে, পরিপূর্ণরূপে দেখতে পাই। ... আমার রাজনৈতিক মত বদলে গেছে।' এই আনসারের কণ্ঠে সেদিন পরোক্ষে ফুটেছে নজরুলেরই অন্তরের বাণী। বস্তুত তাঁর সাহিত্যের দ্বিতীয় স্তরে যে তাঁর রাজনৈতিক মতামত পরিবর্তিত হয় এবং তাঁর সাহিত্যধারা নূতন খাতে প্রবাহিত হয়, তা বর্তমান খণ্ডের লেখাগুলো একত্রে পড়ে নিঃসন্দেহে হৃদয়ঙ্গম হবে বলেই আমাদের নিশ্চিত ধারণা।

এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত 'সিন্ধু-হিন্দোল' ও 'জিঞ্জীর' বহুদিন বাজারে নাই। এ দুটি কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণও হয় নাই। ইতিমধ্যেই 'বুলবুল' হয়েছে দুর্লভ। 'সর্বহারা', 'ফণি-মনসা' ও 'চক্রবাক' নূতন সংস্করণে অনেক অদল-বদল হয়েছে। এই খণ্ডের জন্য 'বুলবুল'-এর গানগুলি আমাকে নকল করে পাঠিয়েছেন হুগলি থেকে শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়। 'সিন্ধু-হিন্দোল' দেখতে দিয়েছেন অধ্যাপক আবদুল কাইউম। 'চক্রবাক' প্রথম সংস্করণ সংগ্রহ করেছি 'আল ইসলাহ্' সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ নূরুল হকের সৌজন্যে সিলহেট কেন্দ্রীয় সাহিত্য-সংসদের পাঠাগার থেকে। 'গ্রন্থ-পরিচয়' লিখতে কিছু তথ্য সরবরাহ করেছেন অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। এঁরাও নজরুল-সাহিত্যের প্রচারকামী ; অতএব আমার কাছে কৃতজ্ঞতা দাবি করেন না।

এ-খণ্ডেরও 'গ্রন্থ-পরিচয়' অসম্পূর্ণ ; তারও কারণ আমাদের হাতে মালমশলার অভাব। তবে নজরুল-সাহিত্যের আলোচনা ক্রমশ যেরূপ বিস্তারিত হচ্ছে তাতে খুবই আশা করা যায় যে, নবীন গবেষকদের কল্যাণে কবির সকল লেখারই প্রথম প্রকাশকাল ও উপলক্ষ সম্পর্কে আবশ্যক তথ্যাদি পাঠকদের পরিজ্ঞাত হতে বেশি বিলম্ব ঘটবে না।

ঢাকা
২৫শে ডিসেম্বর ১৯৬৭

আবদুল কাদির

তৃতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন

কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ডের সুবিবেচিত পরিকল্পনা অনুসারে নজরুল-রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। এই খণ্ডে নজরুল ইসলামের সাহিত্য-জীবনের তৃতীয় যুগের প্রায় সমুদয় রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অবশ্য 'প্রবন্ধ' বিভাগে পরিবেশিত 'সত্যবাণী' তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগে বিরচিত, অতএব রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে স্থান পেলেই কালানুক্রম রক্ষিত হতো। কিন্তু ১৩২৮ ভাদ্রের 'সাধনা'য় প্রকাশিত এ-লেখাটি সম্প্রতি আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে। এ-লেখাটিতে যে-সুর ধ্বনিত, নজরুলের সমগ্র গদ্য-রচনায় তার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত আর নেই। তাই রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের 'পরবর্তী সংস্করণে'র অপেক্ষা না করে এই মহামূল্য লেখাটি এই খণ্ডেই অন্তর্ভুক্ত হলো।

দ্বিতীয় খণ্ডের 'প্রবন্ধ'-বিভাগের শেষ দুটি লেখা দৈনিক 'নবযুগ'-এ সম্পাদকীয় নিবন্ধ-রূপে পত্রস্থ হয়েছিল। এই খণ্ডের 'ধর্ম ও কর্ম' শীর্ষক লেখাটিও 'নবযুগ'-এ প্রকাশিত কবির স্বাক্ষরিত এরূপ একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ। এ লেখাটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন আমার পুত্রপ্রতিম স্নেহভাজন অধ্যাপক আবদুল কাইউম। দ্বিতীয় খণ্ডের 'সম্পাদকের নিবেদন'-এ আমরা বলেছিলাম যে, কবির সম্পাদিত দৈনিক 'নবযুগ'-পত্রে প্রকাশিত তাঁর স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলি 'সংগ্রহ করা সম্ভবপর হলে চতুর্থ খণ্ডে সন্নিবেশিত হবে।' কিন্তু 'সে-সকল দুর্লভ লেখা' সংগৃহীত হওয়ার আশা খুব উজ্জ্বল প্রতিভাত হচ্ছে না বলেই 'ধর্ম ও কর্ম' লেখাটি এই খণ্ডেই পরিবেশিত হলো।

[প্রথম খণ্ডের 'সম্পাদকের নিবেদন'-এ আমরা বলেছিলাম যে, নজরুল ইসলাম তাঁর 'সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগে যে-সকল শিশুপাঠ্য কবিতা লিখেছিলেন সেগুলি রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডে স্থান পাবে।' কিন্তু এই খণ্ডেরও কলেবর সীমিত ও সুমিত রাখা আবশ্যক বিধায় অবশেষে স্থির হয়েছে যে, নজরুলের 'ঝিঙে ফুল', 'পুতুলের বিয়ে', 'মক্তব-সাহিত্য', 'পিলে-পট্‌কা পুতুলের বিয়ে' (১৩৭০), 'ঘুম-জাগানো পাখি' (১৩৭১) প্রভৃতি শিশু-পাঠ্য।]*

নজরুল তাঁর সাহিত্য-জীবনের তৃতীয় যুগে প্রধানত গীতিকার ও সুরস্রষ্টা রূপেই প্রথিতকীর্তি ও প্রতিষ্ঠাপন্ন। রোমান্টিক কবি-কৃতির সকল লক্ষণ তাঁর এ-যুগের সাহিত্য সৃষ্টিতে সুস্পষ্ট। বঞ্চনাহত অরণ্যের আন্দোলক ও উন্মত্ত সমুদ্রের ঊর্মিলতা নজরুলের কাব্যে যেমন বাঙ্‌ময়, মিলনের উদ্দাম ও বিরহের ব্যাকুল বেদনা তাঁর প্রেমের

---

* সম্পাদনা-পরিষদ বর্তমান সংস্করণে নজরুলের রচনা কালানুক্রমভাবে সংকলিত হওয়ার দরুন গ্রন্থসমূহ বন্ধনীর অংশটুকু বর্তমান খণ্ডের গ্রন্থানুক্রমের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

গানে তেমনি ব্যঞ্জনাময়। তাঁর দেশাত্মবোধ ও ভক্তিভাবমূলক গানগুলিতেও প্রকৃতিপ্রেম ও প্রতীকপ্রীতি অভূতপূর্ব চিত্রকল্পে সমৃদ্ধ ও সৌন্দর্যময়। তাই অনবদ্য সৃষ্টির দিক দিয়ে নজরুলের শিল্পী-জীবনের দ্বিতীয় যুগকে যদি বলা হয় তাঁর কাব্য-সাধনার শ্রেষ্ঠ যুগ, তাহলে এই তৃতীয় যুগকে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে তাঁর সংগীত-সাধনার শ্রেষ্ঠ যুগ।

'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ'-এর ১০টি রুবাইর নজরুলের স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি এই খণ্ডে পরিবেশিত হয়েছে। তাতে দেখা যাবে যে, এগুলি গ্রন্থিত করার সময় কবি কোথাও কোথাও কিঞ্চিৎ পরিশোধিত করেছেন। কিন্তু 'কাব্যে আমপারা'-র মূল পাণ্ডুলিপি তিনি মুদ্রণ-কালে পরিবর্তন করেন বিস্তর। মূল পাণ্ডুলিপিখানি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল ; তা ছন্দের বিচারে ছিল সম্পূর্ণ নিখুঁত। কিন্তু পরে 'কোরআন-পাকের একটি শব্দও এধার-ওধার না করে তার ভাব অক্ষুণ্ণ' রাখতে গিয়েই তিনি অগত্যা অনুবাদে বাংলা ছন্দের প্রচলিত বিধান বহু স্থানে লঙ্ঘন করতে বাধ্য হন। ফলে এই পদ্যানুবাদের অনেক চরণেই ছন্দসাম্যের ব্যতিক্রম কানে বাজে। মরহুম আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন এই গ্রন্থখানির 'প্রুফ দেখা, তাকিদ দিয়ে লেখানো ইত্যাদি সমস্ত কাজ' শুধু সম্পন্ন করেননি, কবি-কর্তৃক পরিমার্জিত মূল পাণ্ডুলিপিখানিও সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। প্রায় ২৭ বৎসর পূর্বে সুহৃদ্বয় আবদুল মজিদ অকালে ইন্তেকাল করেছেন, অতঃপর তাঁর সংরক্ষিত সেই অমূল্য সম্পদ কোথায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কে জানে।

নজরুলের অনেক গান সাময়িকপত্রে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, গ্রন্থে তার কোনো কোনো চরণ সামান্য পরিবর্তিত হয়েছে,—এরূপ কিছু দৃষ্টান্ত আমি 'গ্রন্থ-পরিচয়ে' দিয়েছি। আমার ধারণা যে, ভাবের প্রেরণায় নজরুল সে-সকল গান প্রথমে যেরূপ লিপিবদ্ধ করেন সেরূপেই সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়, কিন্তু পরে সেগুলি রেকর্ড করার সময় সুরের প্ররোচনায় যেভাবে পরিবর্তন করেন সেভাবেই গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে। অবশ্য এই জটিল বিষয়ে একমাত্র গীতি-বিশেষজ্ঞরাই সঠিক অভিমত ব্যক্ত করতে পারেন।

আবদুল কাদির

চতুর্থ খণ্ডের প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন

'নজরুল-রচনাবলী'র প্রথম খণ্ড ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৭৪ বঙ্গাব্দের ৯ই পৌষ এবং তৃতীয় খণ্ড ১৩৭৬ বঙ্গাব্দের ৯ই ফাল্গুন তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের মধ্যে চতুর্থ খণ্ড প্রকাশের পরিকল্পনা ছিল ; কিন্তু দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বারংবার পরিবর্তনের দরুন তা প্রকাশিত হতে পাঁচ বছর সময় বেশি লেগে গেল। এই অস্বাভাবিক বিলম্বের জন্য আমাদেরও দুঃখের অন্ত নেই।

নজরুল ইসলামের সাহিত্য-জীবনের চতুর্থ যুগের প্রায় সমুদয় রচনা এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'কুহেলিকা' উপন্যাসখানি তাঁর সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় যুগে বিরচিত,—যে যুগে তাঁর সচেতন মনে দেশের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা ও সমাজতান্ত্রিক মানবিকতা (Socialistic Humanism) রাজনৈতিক চিন্তাদর্শরূপে প্রবলতম প্রেরণার সঞ্চার করেছে। এই 'কুহেলিকা' ছাড়া এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত আর কোনো গ্রন্থই কবির সম্বিতহারা হওয়ার আগে প্রকাশিত হয়নি। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জুলাই তারিখে কবির মস্তিষ্কের অবশীর্ণতা-রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রথম লক্ষণ আকস্মিকরূপে দেখা দেয় ; তারপর তাঁর যে-সকল রচনা গ্রন্থিত হয়েছে, তাদের সজ্জা ও বিন্যাস তিনি সুস্থ থাকলে নিজে কিভাবে করতেন তা অনুমান করা কঠিন। এই খণ্ডে 'কবিতা ও গান' অংশের শেষে ১১১টি গান 'সঙ্গীতাঞ্জলি' নামে সন্নিবেশিত হয়েছে ; এই নামকরণও তিনি অনুমোদন করতেন কি না তা কে বলতে পারেন ?

নজরুলের কবি-জীবনের চতুর্থ স্তরে ধর্মতত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা (metaphysical poetry) ও মরমীয়া গান (mystical songs) এক বিশেষ স্থান ও মহিমা লাভ করেছে। এই যুগের একটি কবিতায় তিনি বলেছেন :

আল্লা পরম প্রিয়তম মোর, আল্লা তো দূরে নয় ;
নিত্য আমাকে জড়াইয়া থাকে পরম সে প্রেমময়। ...
দিনে ভয় লাগে, গভীর নিশীথে চলে যায় সব ভয় ;
কোন্ সে রসের বাসরে লইয়া কত কী যে কথা কয় !
কিছু বুঝি তার, কিছু বুঝি নাকো, শুধু কাঁদি আর কাঁদি ;
কথা ভুলে যাই, শুধু সাধ যায় বুকে লয়ে তারে বাঁধি !
সে প্রেম কোথায় পাওয়া যায় তাহা আমি কি বলিতে পারি ?
চাতকী কি জানে কোথা হতে আসে তৃষ্ণার মেঘ-বারি ?

কোনো প্রেমিক ও প্রেয়সীর প্রেমে নাই সে প্রেমের স্বাদ ;
সে-প্রেমের স্বাদ জানে একা মোর আল্লার আহলাদ।

আধ্যাত্মিকতার যে স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে নজরুল এ-সকল কথা বলেছেন, তার অন্তর্গূঢ় রস-রহস্য পৃথিবীর একমাত্র মর্মবাদী সূফি সাধকেরাই উপলব্ধি করতে পারেন,—সাধারণ মানুষেরা সেই বাণীর রসে আপ্লুত হলেও তার রহস্য অনুধাবন করতে অক্ষম। নজরুল-সাহিত্যের চতুর্থ স্তরে এই অন্তর্জ্যোতিদীপ্ত আধ্যাত্মিকতাই পেয়েছে প্রাধান্য অথবা বৈশিষ্ট্য। প্রচলিত ধর্মের ও ধর্মসংস্কারের নানা রূপ ও রীতির আশ্রয়ে এই আধ্যাত্মিকতার অভিব্যক্তি হয়েছে জনমন-রঞ্জনের পরম উপযোগী,—অথচ ধর্মীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে আহরিত উপমা, রূপক ও চিত্রকল্পের সুমিত ব্যবহারে সম্পূর্ণ শিল্পসম্মত ও রসোত্তীর্ণ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে আগস্ট তারিখে তাঁর বন্ধু ও সতীর্থ রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে লিখেছিলেন : 'Poor Man! When you sit down to read poetry, leave aside all religious bias'. কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর প্রায় এক শতাব্দীকাল পরেও দেখা যাচ্ছে নজরুলেরও শ্রেষ্ঠ অনুরাগীদেরই কেউ কেউ তাঁর সাহিত্য-বিচারেও হয়েছেন ধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব-দোষে দিশাহারা। নজরুলের 'দেবীস্তুতি' নামক রচনাটির রূপকাশ্রিত ভাবতত্ত্ব ব্যাখ্যাচ্ছলে তার 'ভূমিকা'য় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় বলেছেন : 'নজরুলের আসল পরিচয় : কাজী নজরুল ইসলাম স্বভাবে ও স্বরূপে মাতৃসাধক বা পরম শাক্ত।'—এ-প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করব। ১৩৩৮ সালের শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যক 'জয়তী' পত্রিকায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে আমি লিখেছিলাম : 'নজরুল ইসলাম বাংলার মুসলিম রিনেসাঁসের প্রথম হুংকারই শুধু নহেন, কাব্যচর্চায় ইসলামের নিয়ম-কঠোরতা উপেক্ষা করিয়া neopaganism-এর সাহায্য-গ্রহণ ব্যাপারেও তিনি অগ্রণী।'—আমার সেই লেখাটি পড়ে নজরুল ইসলাম দৃঢ়স্বরে মন্তব্য করেন যে, তাঁর কবিতায় ও গানে বাহ্যত neo-paganism বলে যা আমাদের কাছে প্রতিভাত হচ্ছে, তা প্রকৃতপক্ষে pseudo-paganism। নজরুলের কোনো কোনো রচনায় বৈষ্ণবীয় লীলাবাদ ও শৈবসুলভ শক্তি-আরাধনা দেখে যাঁরা তাঁকে স্থূল কথায় প্রতীক-পূজারী বলতে চান, তাঁদের কাছে কবির বক্তব্য যে, তিনি কখনই প্যাগান বা নিউ-প্যাগান নন, তিনি কখনো কখনো কাব্য বিষয়ের অনুসরণে ও অন্তরের অনুপ্রাণিত ভাব-প্রকাশের প্রয়োজনে পরেছেন pseudo-pagan-এর (নকল প্যাগানের) সাময়িক কবিবেশ।

আধুনিককালে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার অসামান্য জীবনবৃত্ত নিয়ে কাব্য বিরচনের চেষ্টা করেছিলেন মীর মশাররফ হোসেন ও মোজাম্মেল হক ; কিন্তু সেই প্রয়াস সম্পূর্ণাঙ্গ হতে পারেনি। নজরুল ইসলাম পরিণত বয়সে এই বিষয় নিয়ে 'মরু-ভাস্কর' রচনা শুরু করেন ; কিন্তু ৪২ বছর বয়সে দুরন্ত ব্যাধির কালগ্রাসে পড়ে এই প্রদীপ্ত প্রতিভা-সূর্য অকালে সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ হয়ে যাওয়ায় এই কাব্যখানিও অসমাপ্ত রয়ে

গেছে। নজরুল তাঁর 'মরু-ভাস্কর' কাব্যে বাংলা ভাষার প্রথাবদ্ধ ছন্দগুলি ব্যবহারে যে বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন, তা নূতন সম্ভাবনার ইঙ্গিতবহ।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে যাঁরা পরমাত্মার সহিত সাযুজ্য লাভের আনন্দ-সংবাদ দিয়েছেন, সামাজিক ঐক্য ও আর্ত-মানবতার প্রতি সুগভীর সহানুভূতি তাঁদের অমূল্য শিক্ষার এক বড় অঙ্গ। নজরুল-সাহিত্যের চতুর্থ স্তরে স্বভাবতই তাঁর সৌন্দর্য-প্রিয়তা ও প্রেম-বিহ্বলতা পেয়েছে প্রগাঢ়তম রূপ ; কিন্তু উদাসীন শিল্পীর সেই প্রসন্ন ধ্যানের আসনে বসেই নিপীড়িত মানবতার জন্য তাঁর বেদনা বোধের প্রকাশ হয়েছে পূর্বের চেয়ে আরও তীক্ষ্ণ ও প্রত্যক্ষ। 'নজরুল-রচনাবলী'র চতুর্থ খণ্ড এই বৈশিষ্ট্যেরই দাবিদার।

এই খণ্ডে সংকলিত 'অপরূপ রাস' এবং 'আবিরাবির্মএধি' শীর্ষক কবিতা দুটির প্রতিলিপি পাঠিয়েছেন হুগলি থেকে কবির পরম ভক্ত শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়। 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' কাব্যানুবাদের কবি-লিখিত 'ভূমিকা' সংগ্রহ করে দিয়েছেন কল্যাণীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম।

দৈনিক 'নবযুগ'-এ প্রকাশিত নজরুলের একটি মাত্র নিবন্ধ : 'বাঙালির বাঙলা' এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উক্ত পত্রিকায় কবির স্বাক্ষরযুক্ত আরও অনেক সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল ; কিন্তু সেগুলি সংগ্রহের উদ্যোগ নিবেন কে?

এই খণ্ডের বর্ণানুক্রমিক সূচি প্রস্তুত করেছেন স্নেহভাজন খোন্দকার গোলাম কিবরিয়া।

ঢাকা

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪

আবদুল কাদির

পঞ্চম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের প্রথমার্ধের সম্পাদকের নিবেদন

•

সাবেক কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড 'নজরুল-রচনাবলী' কয়েক খণ্ডে প্রকাশের যে বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, তদনুসারে ১৩৭৯ সনের ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের মধ্যে 'নজরুল-রচনাবলী' চতুর্থ খণ্ডের প্রকাশ আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু দেশের রাষ্ট্রনীতিক পরিস্থিতিতে পুনঃ পুনঃ পরিবর্তনের দরুন তা পাঁচ বৎসর বিলম্বিত হয়ে ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে ১১ই জ্যৈষ্ঠ মুতাবিক ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে মে তারিখে প্রকাশিত হয়। তার কয়েক মাস আগে, ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে, আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন উপদেষ্টা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মরহুম আবুল ফজল সাহেবের সমীপে পঞ্চম খণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত পরিকল্প উপস্থাপন করেছিলাম এবং তিনি তা তখনই অনুমোদন করেন। তার প্রায় দুবছর পরে ১২-২-১৯৭৯ তারিখে আমি বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালকের কাছে উক্ত পরিকল্পের প্রতিলিপি-সহ একখানি পত্র প্রেরণ করি। সেই পত্রের উত্তরে একাডেমীর 'মহাপরিচালক সাহেবের আদেশক্রমে' ৬-৩-১৯৭৯ তারিখে আমাকে জানানো হয় যে, ১৫-২-১৯৭৯ তারিখে অনুষ্ঠিত 'বাংলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদের ৪৭-তম সংখ্যক মূলতবি অধিবেশনে' 'নজরুল-রচনাবলী' পঞ্চম খণ্ড প্রকাশের প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে এবং ২৪-৫-১৯৭৯ ইং তারিখের ৭৭১৪-সংখ্যক পত্রে আমাকে পঞ্চম খণ্ডের 'সমগ্র পাণ্ডুলিপি' ১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দের 'জুন মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে' দাখিল করতে বলা হয়। তদনুসারে ১১ই জুন তারিখে আমি 'পঞ্চম খণ্ডের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি' একাডেমীর মহাপরিচালক সাহেবের হাতে অর্পণ করি।

এরূপ স্বল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও সম্পাদনা করতে হয়েছিল বলে আমাকে নজরুলের কিছু সংখ্যক রচনা সংকলন করার ব্যাপারে স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক শাহাবুদ্দীন আহমদ সাহেবের সহায়তা চাইতে হয়। তিনি সে-সময়ে আমার সহায়তা করতে সম্মত না হলে আমার ক্লেশ খুবই বৃদ্ধি পেতো। বলা বাহুল্য যে, তাঁকে তাঁর সেই অতি দ্রুততা-সহকারে সম্পন্ন কাজের জন্যে যথোপযুক্ত 'সম্মানী', পাণ্ডুলিপি একাডেমীতে দাখিল করার পূর্বেই, পরিশোধ করা হয়েছিল।

কিন্তু এই প্রায় পাঁচ বৎসরের ব্যবধানে পঞ্চম খণ্ডের মাত্র পাঁচ শত পৃষ্ঠা পর্যন্ত মুদ্রণ সম্ভবপর হয়েছে। পুস্তক প্রকাশের ব্যয় বর্তমানে যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তদনুপাতে পুস্তকের দাম বাড়াতে হয়েছে, তা বিবেচনা করে গ্রন্থমূল্য সহৃদয় পাঠকদের ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে রাখবার উদ্দেশ্যে উক্ত পাঁচ শত পৃষ্ঠার মূল পাঠ দিয়েই পঞ্চম খণ্ডের 'প্রথমার্ধ' প্রকাশ করা হলো। দ্বিতীয়ার্ধে থাকবে : (ক) হাসির গান,

(খ) নাট্যগীতি, (গ) নাটিকা ও প্রহসন, যথা—'ঈদ', 'গুল-বাগিচা', 'অতনুর দেশ', 'বিদ্যাপতি', 'বিষ্ণুপ্রিয়া', 'বিজয়া', 'পণ্ডিত মশায়ের ব্যাঘ্র শিকার' প্রভৃতি, (ঘ) প্রবন্ধ ও রস-রচনা, (ঙ) অভিভাষণ, (চ) চিঠিপত্র ও (ছ) গ্রন্থ-পরিচয়।

নজরুলের শিশুপাঠ্য গ্রন্থ 'ঝিঙে ফুল' ১৩৩৩ সালের আশ্বিন মাসে এবং 'পুতুলের বিয়ে' ১৩৪০ সালের শেষ দিকে প্রকাশিত হয়। এই দু'টি গ্রন্থ ছাড়া 'নজরুল-রচনাবলী' পঞ্চম খণ্ডের প্রথমার্ধে অন্তর্ভুক্ত আর কোনো গ্রন্থই কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি।

এই খণ্ডে কবির জাগরণধর্মী কবিতা ও কাব্যগীতিগুলি 'অগ্রনায়ক' অভিধায় পরিবেশিত হলো। এই জাগরণ হচ্ছে আত্মার জাগরণ, জনগণের, রাজনৈতিক, অর্থনীতিক ও সামাজিক ন্যায়সঙ্গত অধিকারসমূহ আদায়ের জন্যে চিত্তের জাগরণ। কবিতাগুলিতে পরমাত্মার সহিত কবি-প্রাণের সাযুজ্য, কবির উদার মানবিকতার আদর্শ ও গভীর স্বদেশপ্রীতি পরম হৃদয়স্পর্শী রসমূর্তি লাভ করেছে।

'মৃত তারা' বিভাগের কবিতা ও কাব্যগীতিগুলোতে কবির ব্যক্তি-স্বরূপের পরিচয় দেদীপ্যমান। কবির উপচেতন মনের নিগূঢ় স্বাক্ষর, মানুষের প্রতি অপরিমেয় প্রেম ও কল্যাণ-কামনা, এর রচনাগুলোকে করেছে তাৎপর্যপূর্ণ।

'ঝিঙে ফুল' ও 'পুতুলের বিয়ে' গ্রন্থদ্বয়ে অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলো ছাড়া, কবি যে-সকল কিশোর-পাঠ্য কবিতা, ব্যঙ্গকবিতা ও নাটিকা লিখেছেন, সেগুলো এই খণ্ডে 'কিশোর' নামে সন্নিবেশিত হলো।

নজরুল ইসলাম কলিকাতা বেতারে 'হারামণি', 'গীতি-বিচিত্রা' ও 'নবরাগ-মালিকা' নামে তিনটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের মারফতে ক্লাসিক্যাল রাগ ও নবতর রাগের বহু সঙ্গীত প্রচার করে তাঁর অলোকসামান্য সৃষ্টিধর্মী শিল্পপ্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন। এই তিনটি অনুষ্ঠানে কবি বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর অনুমিশ্রণ ঘটিয়ে এবং নানা নতুন সুরের সৃষ্টি করে বহুসংখ্যক সঙ্গীত প্রচার করেন। তাদের কোন বিভাগে তিনি কোন কোন সঙ্গীত ও কতগুলি সঙ্গীত প্রচার করেছিলেন, তা বাংলা সঙ্গীত-সাহিত্যের গবেষকদের এক বড় গবেষণার বিষয়। আমি কবির দেওয়া উক্ত নামগুলির অনুসরণে এই খণ্ডের গানগুলিকে 'সন্ধ্যামণি', 'গীতি-বিচিত্রা' ও 'নবরাগমালিকা', এই তিন নামের অধীনে বিন্যস্ত করেছি। 'সন্ধ্যামণি' আখ্যায় কবির প্রেমমূলক গানগুলি সংকলিত হয়েছে। 'গীতি-বিচিত্রা' আখ্যায় ভক্তিমূলক ও ধর্মতত্ত্বাশ্রয়ী সঙ্গীতগুলি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। 'নবরাগ-মালিকা' শ্রেণীতে স্থান পেয়েছে প্রধানত কবির উদ্ভাবিত নবরাগের গানগুলি। সেগুলিতে আছে রাগ-রাগিণীর সূক্ষ্মতম কারুকার্য ও বিস্ময়প্রদ সুরবৈচিত্র্য।

নজরুল ইসলাম কলিকাতা বেতারে প্রতি মাসে একবার 'হারামণি' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অপ্রচলিত ও লুপ্তপ্রায় রাগ-রাগিণীর পুনঃপ্রচলনের জন্যে নূতন গান প্রচার করতেন। সে-সকল গানের অধিকাংশই আজ পাওয়া যায় না। একবার খবর বেরিয়েছিল যে, 'হারামণি' অনুষ্ঠানের জন্যে লেখা নজরুলের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একটি খাতা কবির অন্যমনস্কতাবশত হারিয়ে গেছে। কিন্তু সেই হারানো সম্পদ উদ্ধারের কোনো চেষ্টা কি আজ অবধি কোথাও হয়েছে?

প্রতি মাসে দুইবার 'গীতি-বিচিত্রা' অনুষ্ঠানটি হতো। সেই পৌনে এক ঘণ্টাব্যাপী অনুষ্ঠানে সম্প্রচারিত হতো গীতি-আলেখ্য। কলিকাতা বেতারে নজরুলের রচিত প্রায়

আশিটি গীতি-আলেখ্য প্রচারিত হয়েছে। প্রতিটি গীতি-আলেখ্যে একটি মূল বিষয়কে আশ্রয় করে ছয়টি করে গান পরিবেশিত হতো। নজরুলের 'শেষ সওগাত' কাব্যের 'কাবেরী-তীরে' সেই অনুষ্ঠানেই প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু 'কাফেলা', 'ছন্দসী' প্রভৃতি নামে যে-সকল গীতি-আলেখ্য প্রচারিত হয়েছিল, তাদের কোনও পাঠ অদ্যাবধি সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়নি। নজরুলের 'ছন্দিতা' নামক গীতিগুচ্ছের 'স্বাগতা', 'প্রিয়া', 'মধুমতী', 'রুচিরা', 'দীপক-মালা', 'মন্দাকিনী' ও 'মণিমালা' নামক গানগুলি সংস্কৃত বৃত্তচ্ছন্দে সংরচিত। বাংলা ভাষায় প্রাকৃত মাত্রাচ্ছন্দে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গান লিখেছেন ; কিন্তু নজরুল ইসলাম ছাড়া আর কেউই সংস্কৃত বৃত্তচ্ছন্দে বাংলা গানের বাণী বিরচন করতে সক্ষম হননি ; এই রীতিতে বাংলা সঙ্গীতে নজরুলের অচিন্তিতপূর্ব অবদান তাঁর অলৌকিক কবি-প্রতিভার বিস্ময়প্রদ পরিচয় বহন করে। তাঁর 'ছন্দসী' নামক সঙ্গীত-আলেখ্যের দুটি অনুষ্ঠানে সংস্কৃত 'মালিনী', 'বসন্ত তিলক', 'তনুমধ্যা', 'ইন্দ্রবজ্রা', 'মন্দাক্রান্তা', 'শার্দূলবিক্রীড়িত' প্রভৃতি বৃত্তচ্ছন্দে বিরচিত তাঁর ১২টি গান প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু সে-সকল মহামূল্যবান গানের বাণী কে সংগ্রহ করবেন? নজরুল ইসলামের এ-সকল অবলুপ্তিমুখীন বিচিত্র গীতাবলী ও কীর্তন-গান সংগৃহীত হলে নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপন্ন হবে যে, নজরুল ইসলাম বাংলা ভাষার সঙ্গীত-সম্রাট।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা', শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাহাঙ্গীর' ও 'অন্নপূর্ণা', শ্রীমন্মথ রায়ের 'মহুয়া' ও 'লায়লী-মজনু' প্রভৃতি নাটকের জন্যে নজরুল ইসলাম অনেক গান লিখে দিয়েছিলেন। 'চৌরঙ্গী', 'দিক্শূল', 'নন্দিনী', 'পাতালপুরী', 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন' প্রভৃতি বাণীচিত্রের জন্যেও নজরুল বহু গান প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু তাদের সকল গান নজরুলের গীতিগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কি না, তা অনুসন্ধেয়।

নজরুল ইসলাম ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে 'বিদ্যাপতি' ছায়াছবির কাহিনী এবং ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে 'সাপুড়ে' ছায়াছবির কাহিনী রচনা করেন। এ দুটি ছায়াচিত্রের রেকর্ডবদ্ধ বাণী লিপিবদ্ধ করবার কোনো উদ্যোগ অদ্যাবধি কেউ নিয়েছেন বলে শুনিনি। এ দুটি ছায়ানাট্যের সমগ্র পাঠ পাওয়া গেলে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে, সন্দেহ নেই।

১৩৯১ সনের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ আমার বয়স ৭৮-বৎসর পূর্ণ হয়ে ৭৯-বৎসর শুরু হবে। বর্তমানে আমি বহুব্যাধিগ্রস্ত জরাজীর্ণ ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধ। প্রায় সতেরো বছর আগে আমার ডান চোখের ছানি কাটা হয়েছিল ; কিন্তু সেই চোখ এখনও কাজে লাগছে না। ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর আমার বাম চোখের ছানি কাটা হয়েছে। এই অবস্থায় আমার পক্ষে নজরুল ইসলামের অবলুপ্তিমুখীন রচনাবলী সংগ্রহের চেষ্টা করা আর সম্ভবপর নয়। আমি আশা করব যে, নজরুল-রচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত এবং তা সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন করতে আমাদের নবীন নজরুল-গবেষক ও নজরুল-অনুরাগীরা সাগ্রহে এগিয়ে আসবেন।

ঢাকা
১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১

আবদুল কাদির

পঞ্চম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয়ার্ধের সম্পাদকের নিবেদন

যে-কোনো সমাজ-সচেতন সৃষ্টিশীল সাহিত্য-প্রতিভার মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবাদর্শে মোড় পরিবর্তন দেখা যায়। কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ-সচেতন কবি ; সুতরাং তাঁর রচনাবলীর কালানুক্রমিক বিচারে তাঁর চিন্তা-চেতনার ধারা-বদলের নিদর্শন পাওয়া যাবে এ খুবই স্বাভাবিক। 'নজরুল-রচনাবলী'র পঞ্চম খণ্ডের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত তাঁর মনন-ধারার অনুসরণ করে আমার মনে এই ধারণা হয়েছে যে, কবি শেষ পর্যন্ত যে-সামাজিক ভাবনার স্তরে পৌঁছেছেন তাকে বলা চলে Spiritual Communism—আধ্যাত্মিক ধন-সাম্যবাদ। নজরুলের অবশিষ্ট রচনাবলী সংগৃহীত হয়ে গ্রন্থবদ্ধ হলে তাঁর ভাবাদর্শের সামগ্রিক স্বরূপ সম্বন্ধে হয়ত পাঠকদের মনে নূতনতর উপলব্ধি হতে পারে। অতএব তাঁর অবশিষ্ট রচনাসমূহ সংগ্রহ করে 'নজরুল-রচনাবলী' ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশের যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে, এই-ই আমি আশা করছি।

ঢাকা
১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪

আবদুল কাদির

নতুন সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৯৪তম জন্মবার্ষিকীর প্রাক্কালে তাঁর রচনাবলী একসঙ্গে প্রকাশ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। ইতঃপূর্বে বাংলা একাডেমী থেকে কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় 'নজরুল-রচনাবলী' পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। জনাব আবদুল কাদির যখন কবির রচনাবলী সংকলন ও সম্পাদনার কাজ শুরু করেন তখন নজরুলের গ্রন্থাবলীর বিভিন্ন সংস্করণ ও ধারাবাহিকভাবে নজরুলের সমস্ত রচনা পাওয়া ছিল বেশ দুরূহ ব্যাপার। ফলে তাঁর সম্পাদিত রচনাবলী পূর্ণাঙ্গ ও ত্রুটিমুক্ত নয়। কিন্তু 'নজরুল-রচনাবলী' সংকলন ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ও অগ্রযাত্রীর ভূমিকা আমরা চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব।

বর্তমান রচনাবলী বাংলা একাডেমী প্রকাশিত কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত উক্ত 'নজরুল-রচনাবলী'রই আরো সংহত, পূর্ণাঙ্গ, কালানুক্রমিক ও পরিমার্জিত রূপ। এই সংস্করণটির সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন বাংলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদ-মনোনীত দেশের বরেণ্য নজরুল-বিশেষজ্ঞগণ।

কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য এদেশের মানুষকে তাঁদের আন্দোলনে ও সংগ্রামে, কার্য ও ভাবনায় উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করে আসছে, ভবিষ্যতেও করবে। নজরুল-সাহিত্য সুলভে এদেশের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার ইচ্ছা আমাদের মন্ত্রণালয়ের অর্থানুকূল্য ব্যতীত এই প্রত্যাশা পূরণ সম্ভব ছিল না। এ-প্রসঙ্গে এই মন্ত্রণালয়ের—বিশেষভাবে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপিকা জাহানারা বেগমের ব্যক্তিগত উৎসাহ এবং আগ্রহের কথা আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

এই রচনাবলীর সংকলন, সম্পাদনা, মুদ্রণ ও প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

আমাদের এই প্রয়াস যদি নজরুল-অনুরাগ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় এবং রচনাবলীর এই নতুন সংস্করণ আদৃত হয় তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

ঢাকা
১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০।। ২৫ মে ১৯৯৩

মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

নতুন সংস্করণের মুখবন্ধ

বিশিষ্ট কবি, সমালোচক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় পাঁচ খণ্ডে নজরুল-রচনাবলী প্রকাশিত হয় সুদীর্ঘ আঠারো বছর ধরে। কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড থেকে এর প্রথম তিনটি খণ্ড প্রকাশ লাভ করে যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭ ও ১৯৭০ সালে। ১৯৭২ সালে কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড একীভূত হয় বাংলা একাডেমীর সঙ্গে। তারপর বাংলা একাডেমী থেকে 'নজরুল-রচনাবলী' চতুর্থ খণ্ড ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড দুই ভাগে ১৯৮৪ সালে (প্রথমার্ধ জুনে ও দ্বিতীয়ার্ধ ডিসেম্বরে) প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ মুদ্রিত হয় ১৯৭৫ সালে, তৃতীয় খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৭৬ সালে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৪ সালে। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই মুদ্রিত গ্রন্থের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে যায়।

'নজরুল-রচনাবলী' পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তার একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশের পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং বাংলাদেশ সরকার এজন্যে বিশেষ অর্থ মঞ্জুরি প্রদান করেন। অন্যদিকে একথাও উপলব্ধ হয় যে, আবদুল কাদিরের গভীর পাণ্ডিত্য ও বিপুল শ্রমের স্বাক্ষরবহ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র বিন্যাসে কিছু যৌক্তিক পরিবর্তন করা প্রয়োজন এবং এর পাঁচ খণ্ডে যেসব রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়নি, এখন তার সন্ধান পাওয়া যাওয়ায়, সেসবও এতে সন্নিবেশিত হওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমী নয় সদস্যবিশিষ্ট সম্পাদনা-পরিষদ গঠন করে 'নজরুল-রচনাবলী'র সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণ সম্পাদনার দায়িত্ব তাঁদের উপর অর্পণ করেন।

এই নতুন সংস্করণে যে-সব পরিবর্তন করা হয়েছে, তা এই :

১. কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বইগুলি যথাসম্ভব কালানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। যেমন আগে 'অগ্নি-বীণা'র পরে 'বিষের বাঁশী' এবং তারপরে 'দোলন-চাঁপা' বিন্যস্ত হয়েছিল। নতুন সংস্করণে ক্রম হয়েছে 'অগ্নি-বীণা', 'দোলন-চাঁপা', 'বিষের বাঁশী'। এসব বইয়ের ক্ষেত্রে কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত সর্বশেষ সংস্করণের পাঠ তাঁর অভিপ্রেত পাঠ বলে গণ্য করে তা অনুসরণ করা হয়েছে।

২ কবির অসুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বইগুলিও কালানুক্রমিকভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। এসব বইয়ের ক্ষেত্রে প্রথম সংস্করণের পাঠ যথাসম্ভব অনুসরণ করা হয়েছে।

৩. গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা কোনো কোনো খণ্ডে 'সংযোজন' শিরোনামে রচনাবলীতে মুদ্রিত হয়। আবার পঞ্চম খণ্ডে এ ধরনের কিছু কিছু রচনা একেক নামের গ্রন্থরূপে সন্নিবেশিত হয়। যেমন, 'সঙ্গীতাঞ্জলি', 'সন্ধ্যামণি', 'নবরাগমালিকা'। কিন্তু ওসব নামে কোনো গ্রন্থ কখনো প্রকাশিত না হওয়ায় অনুরূপ বিন্যাস আমরা সংগত বিবেচনা করিনি। ওসব শিরোনামের অন্তর্গত রচনা এবং সংযোজন পর্যায়ের রচনা 'গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা'র পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে।

৪. নজরুল ইসলামের বিভিন্ন সংগীতগ্রন্থের গান বর্তমান সংস্করণে গৃহীত হয়েছে, তবে স্বরলিপি মুদ্রিত হয়নি। আমরা মুদ্রিত গানের পাঠ অনুসরণ করেছি, রেকর্ডে ধারণকৃত বা স্বরলিপিতে বিধৃত গানের পাঠে ভেদ থাকলে তা নির্দেশ করা হয়নি।

৫. নজরুল ইসলামের নামে প্রকাশিত যে-সব গ্রন্থের সন্ধান আগে পাওয়া যায়নি কিংবা যেসব গ্রন্থ 'নজরুল-রচনাবলী' প্রকাশের পর বেরিয়েছে, সেগুলো বর্তমান সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ-ধরনের অনেক গ্রন্থে নজরুলের পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থের উপকরণ গ্রহণ করা হয়। সেক্ষেত্রে আমরা একই রচনা দু'বার মুদ্রণ না করে গ্রন্থপরিচয়ে তার উল্লেখ করেছি।

৬. আবদুল কাদির-প্রদত্ত গ্রন্থপরিচয় অক্ষুণ্ন রেখে 'পুনশ্চ' শিরোনামে গ্রন্থ-সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

৭. নজরুল ইসলামের প্রকাশিত গ্রন্থে বানানের সমতা নেই। সেজন্যে আমরা আধুনিক বানানপদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। অবশ্য বইয়ের নামের বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, যেমন 'বিষের বাঁশী' কিংবা 'পূবের হাওয়া'। তবে দ্বিত্ব বর্জিত হয়েছে, যেমন 'সর্বহারা'। যে-সব ক্ষেত্রে বানানের কোনো বিশেষত্ব অক্ষুণ্ন রাখা সংগত মনে হয়েছে, সেখানে আমরা কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত সংস্করণের বানান বজায় রেখেছি।

৮. পাঁচ খণ্ডের জায়গায় চার খণ্ডে এবারে নজরুল-রচনাবলী প্রকাশিত হলো বলে বিভিন্ন খণ্ডের বিন্যাসের বড়রকম পরিবর্তন ঘটেছে। আবদুল কাদির প্রত্যেক খণ্ডের একটা ভাবগত সামঞ্জস্যের কথা ভেবেছিলেন। তা যে সর্বত্র রক্ষা করা যায়নি, সেকথাও তিনি স্বীকার করেছিলেন। নতুন সংস্করণে প্রথম খণ্ডে ১৯২২ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত নজরুল ইসলামের সকল গ্রন্থ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ১৯৩০ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ তাঁর সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বাকি সব বই সন্নিবেশিত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হয়েছে কবির অসুস্থাবস্থায় প্রকাশিত কাব্য ও গীতি-গ্রন্থ এবং গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা ও গান। চতুর্থ খণ্ডে আছে কবির অসুস্থাবস্থায় প্রকাশিত গদ্য ও নাট্যগ্রন্থ, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত গদ্য ও নাট্যরচনা এবং চিঠিপত্র। এই দুই খণ্ডের রচনাবিন্যাসে কালক্রম রক্ষা করা সম্ভবপর হয়নি।

৯. কবির নির্বাচিত কবিতার সংগ্রহ 'সঞ্চিতা' এই রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়নি, তবে 'সঞ্চিতা'র প্রকাশ সম্পর্কিত তথ্য ও সূচি প্রথম খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে দেওয়া হয়েছে।

১০. 'মক্তব-সাহিত্য' বইটির একটি কীটদষ্ট কপি নজরুল ইন্সটিটিউটে রক্ষিত আছে। কীটদষ্ট অংশের পাঠ উদ্ধার করা সম্ভবপর না হওয়ায় রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে 'মক্তব-সাহিত্যে'র উদ্ধারযোগ্য অংশ সন্নিবিষ্ট হলো।

'নজরুল-রচনাবলী'র সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণের পাঠ-নির্ধারণের বিষয়ে সম্পাদনা-পরিষদের সদস্যেরা যে শ্রম ও সময় ব্যয় করেছেন, তার জন্যে আমি তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। এই কাজে কবির রচনার বিভিন্ন সংস্করণ দিয়ে সাহায্য করেছেন নজরুল ইন্সটিটিউট-কর্তৃপক্ষ। তাছাড়া অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল কাইউমের কাছ থেকে আমরা বিভিন্ন গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্য সংস্করণ দেখার সুযোগ পেয়েছি। অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ও জনাব মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্র ব্যক্তিগত সংগ্রহও আমরা ব্যবহার করেছি। সম্পাদনা-পরিষদের সদস্য-সচিব সেলিনা হোসেনের উদ্যম ও মোবারক হোসেনের পরিশ্রমের কথা উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ সকল পর্যায়ে আমাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা দিয়েছেন। আমি এঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

'নজরুল-রচনাবলী'র সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করা একটি দুরূহ কর্ম। বিশিষ্ট কবি, সমালোচক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদির এই কাজে অগ্রসর হয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। নতুন সংস্করণে আমরা কিছু উন্নতিবিধানের চেষ্টা করেছি। তবে এটিই চূড়ান্ত নয়। আমরা আশা করব, ভবিষ্যতে গবেষকরা 'নজরুল-রচনাবলী'র আরো শুদ্ধ ও আরো সম্পূর্ণ সংস্করণ-প্রকাশে উদ্যোগী হবেন।

ঢাকা
১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪০০ ॥ ২৫শে মে ১৯৯৩

আনিসুজ্জামান
সম্পাদনা-পরিষদের সভাপতি

সূচিপত্র

কাজী নজরুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইসলাম

যুবক কাজী নজরুল ইসলাম

জন্মদিনে কবি

ধানমন্ডির কবিভবনের আঙিনায় চেয়ারে বসে নজরুল

হাবিলদার নজরুল

সোভিয়েত প্রতিনিধিদের মাঝখানে নজরুল। রুশ ভাষায় অনূদিত নজরুল রচনা-প্রকাশ অনুষ্ঠানে (১৯৬৭)

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের অনুষ্ঠানে নজরুল

কলকাতার রাজভবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে (বাঁদিক থেকে) কাজী অনিরুদ্ধ, কল্যাণী কাজী এবং কাজী সব্যসাচী। বাংলাদেশের রণসঙ্গীত 'চল্ চল্ চল্' এর স্বরলিপি অনিরুদ্ধর হাতে
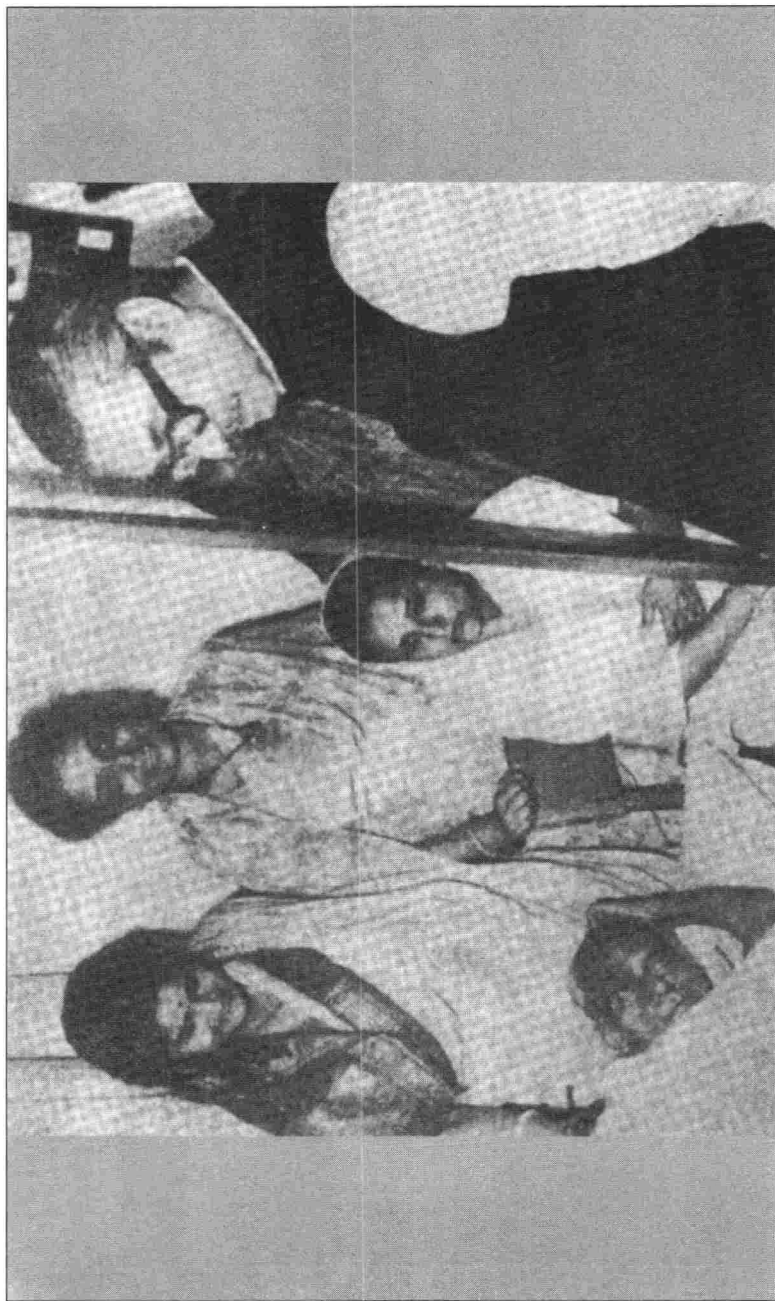
ধানমন্ডি কবিভবনে কবিকে দেখতে এসেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। (পাশে ডান দিক থেকে) শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব, ডা. অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় এবং কল্যাণী কাজী

কাজী নজরুল ইসলামের দুই পুত্র : অনিরুদ্ধ এবং সব্যসাচী

এইচ. এম. ভি থেকে প্রকাশিত 'বিদ্রোহী' কবিতা আবৃত্তির রেকর্ড পুত্র কাজী সব্যসাচী পিতাকে দেখাচ্ছেন
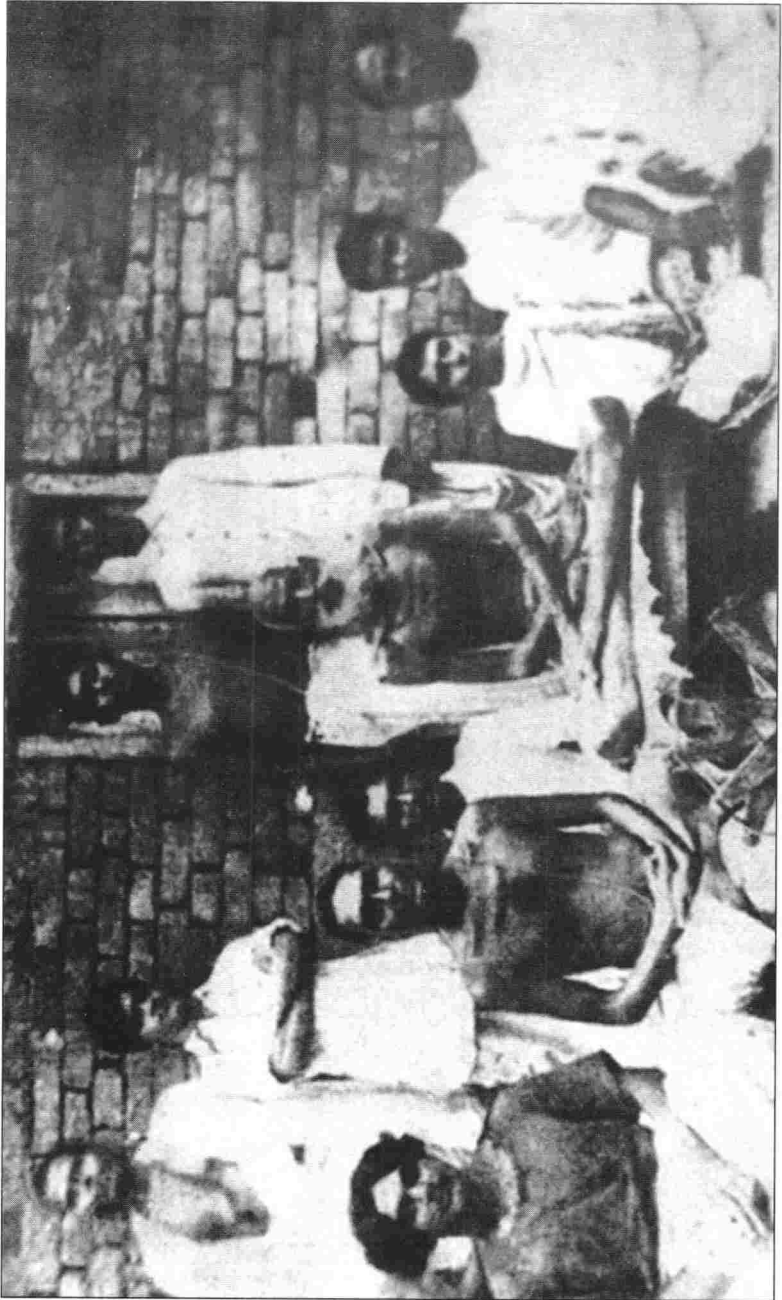
যোগ সাধনায় রত নজরুল

ফজিলাতুন্নেসা, ১৯২৮ সালে নজরুল যখন ঢাকায় আসেন তখন এই বিদুষী মহিলার সঙ্গে পরিচয় হয়। নজরুল এর জন্য গান লেখেন 'জাগিলে পারুল কি গো সাত ভাই চম্পা ডাকে'

পরিণত বয়সে নার্গিস আসার খানম

কৃষক

ঈদুলফেৎর—১৩৪৮

আগুন

[কাজী নজরুল ইসলাম]

কাজী নজরুল ইসলাম

পেটে জ্বলে তোর ক্ষুধার আগুন
আগুন জ্বলিছে চোখে,
মনে জ্বলে তোর ক্রোধের আগুন
বুক জ্বলে দুখে শোকে।

ঘরে জ্বলে কেরোসিনের আগুন,
প্রাণে লাগে তার ধোঁওয়া
মাঠের ফসল পুঁড়ে যায়
লেগে কাহার তপ্ত ছোঁওয়া ?

তোর চারিদিকে আগুন,
তবুও আগুন লাগেনা কেন,
তার বুকে—যে উৎপীড়ক
এ বহ্নি লাগাল যেন ?

'কৃষক' পত্রিকার ইদুলফেৎর ১৩৪৮ সংখ্যায় সংকলিত নজরুলের 'আগুন' কবিতা ;
সৌজন্যে প্রফেসর ভূঁইয়া ইকবাল

অগ্রন্থিত গান

১

নমো নমো নমো হে নটনাথ
নব ভবনে করো শুভ চরণপাত।
নৃত্য-ভঙ্গিতে সৃজন-সংগীতে
বিশ্বজন-চিতে আনো নব প্রভাত॥

তোমার জটাজুটে বহে যে জাহ্নবী
তাহারি সুরে প্রাণ জাগাও আদি কবি
শুচি ললাট-তলে
যে শিশু শশী ঝলে
তারি আলোকে হর দুঃখ তিমির রাত॥

হে চির সুন্দর, দেহ আশীর্বাদ—
হউক দূর সব অতীত অবসাদ
লঙ্ঘি সব বাধা
তব পতাকা বহি
ফুল্ল মুখে সহি সকল সংঘাত॥

নব জীবনে লয়ে আশা অভিনব
ভুলি সকল লাজ গ্লানি পরাভব
এ নাট-নিকেতনে আরতি করি তব
হে শিব, করো নব জীবন সঞ্জাত॥

২

ভোর হলো, ওঠ জাগ মুসাফির, আল্লা-রসুল বোল।
গাফলিয়তি ভোল রে অলস, আয়েশ-আরাম ভোল॥

এই দুনিয়ার সরাইখানায়
(তোর) জনম গেল ঘুমিয়ে, হায়!
ওঠ রে সুখ-শয্যা ছেড়ে, মায়ার বাঁধন খোল॥

দিন ফুরিয়ে এলো যে রে দিনে দিনে তোর,
দীনের কাজে অবহেলা করলি জীবন-ভোর।
যে দিন আজো আছে বাকি
খোদারে তুই দিসনে ফাঁকি,
আখেরে পার হবি যদি পুল-সেরাতের পোল॥

৩

ও কি ঈদের চাঁদ গো।
ও কি ঈদের চাঁদ চলে মদিনারই পথে, গো!
যেন হাসীন য়ুসোফ ফিরে এলো ফিরদৌস হতে গো॥

যাহারা তার রূপ দেখে তারা ঝুরিছে আসমানে,
গুল ভুলে তাই বুলবুলি চেয়ে আছে গুলিস্তানে;
বুঝি বেহেশতেরই বাদশাজাদা এলো সোনার রথে গো॥

সাদা কবুতরের মতো চরণ দুটি ছুঁয়ে
গোলাপ চাঁপা উঠছে ফুটে ধূলি-মাখা ভুঁয়ে গো।

সেই চাঁদের মুখে জ্যোৎস্নাসম খোদার কালাম ঝরে
তার রূপ দেখে, তার গুণ শুনে মোর মন রহে না ঘরে লো;
আমি উন্মাদিনী সেই মাদানী নবীর মোহব্বতে গো॥

৪

মদিনাতে এসেছে সই নবীন সওদাগর।
সে হীরা জহরতের চেয়ে অধিক মনোহর॥
সই, দেখতে তারে লাখো হাজার লোক ছুটেছে পথে,
সে কোহিনূর মানিক এনেছে কোহিতূর হতে।
সে কোরান জাহাজ বোঝাই করে এনেছে সোনার মোহর॥

একবার যে কলমা পড়ে আল্লা বলে এসে
তারে বিনি-মূলে সলমা চুনি বিলিয়ে দেয় সে হেসে,
দুলিয়ে সে দেয় নামাজ রোজার হীরের তাবিজ বুকের পর।

সে বেহেশতের কুজিত লয়ে ডাকে অহরহ,
বলে, মান এনে বেহেশত যাবার সোনার চাবি লহ,
আমি প্রাণ দিয়েছি নজরানা, সই, দেখে তারে এক নজর॥

৫

কেন তুমি কাঁদাও মোরে, হে মদিনাওয়ালা !
অবরোধ–বাসিনী আমি কুলের কুলবালা,
হে মদিনাওয়ালা॥

ঈদের চাঁদের ইশারাতে
কেন ডাক নিঝুম রাতে,
হাসিন য়ুসোফ ! জুলেখারে কত দিবে জ্বালা।
হে মদিনাওয়ালা॥

একি লিপি পাঠালে নাথ, কোরানের আয়াতে,
পড়তে গিয়ে অশ্রুবাদল নামে আঁখি–পাতে।

বাজিয়ে শাহাদতের বাঁশি
কেন ডাক নিত্য আসি,
হাজার বছর আগে তোমায় দিয়েছি তো মালা।
হে মদিনাওয়ালা॥

৬

ওগো আমার নবী প্রিয় আল–আরবি !
তোমায় যেমন করে ডেকেছিল আরব মরুভূমি,
আমি তেমনি করে ডাকি যদি আসবে না কি তুমি॥

যেমন কেঁদে দজলা ফোরাত নদী
ডেকেছিল নিরবধি—
হে মোর মরুচারী, নবুয়ৎ–ধারী,
আমি তেমনি করে কাঁদি যদি, আসবে নাকি তুমি॥

মজলুমেরা কাবা–ঘরে
কেঁদেছিল যেমন করে
হে আমিনা–লালা, হে মোর কমলীওয়ালা,
আমি তেমনি করে চাহি যদি, আসবে না কি তুমি॥

৭

রোজ-হাশরে আল্লাহ আমার করো না বিচার।
বিচার চাহি না, তোমার দয়া চাহে এ গোনাহ্‌গার॥

জেনে শুনে জীবন ভরে
আমি দোষ করেছি ঘরে পরে,
এখন আশা নাই যে যাব তরে বিচারে তোমার॥

বিচার যদি করবে, কেন 'রহমান' নাম নিলে;
ঐ নামের গুণেই তরে যাবো—কেন এ জ্ঞান দিলে।

দীন ভিখারি বলে আমি
ভিক্ষা যখন চাইব স্বামী—
তখন শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিতে পারবে না কো আর॥

৮

আমার যখন পথ ফুরাবে, আসবে গহীন রাতি—
তখন তুমি হাত ধরো মোর, হয়ো পথের সাথী॥

অনেক কথা হয়নি বলা, বলার সময় দিও (খোদা),
আমার তিমির অন্ধ চোখে দৃষ্টি দিও প্রিয় (খোদা);
বিরাজ করো বুকে আমার আরশ খানি পাতি॥

সারা জীবন কাটলো আমার বিরহে, বঁধু,
পিপাসিত কণ্ঠে এসে দিও মিলন-মধু।

তুমি যেথায় থাকো প্রিয়, সেথায় যেন যাই (খোদা),
সখা বলে ডেকো আমায়, দীদার যেন পাই (খোদা);
সারা জনম দুঃখ পেলাম, (যেন) এবার সুখে মাতি॥

৯

ইরানের বুলবুলি কি এলে
গোলাপের স্বপ্ন লয়ে সিন্ধু-নদীকূলে॥
চন্দনের গন্ধে কবি
মিশালে হেনার সুরভি,
তোমার গানে মরুভূমির দীর্ঘশ্বাস দুলে॥

কোন সাকির আঁখির করুণা নাহি পেয়ে
মরুচারী হে বিরহী এলে মেঘের দেশে ধেয়ে।

হেথা কাজল আঁখি নিরখি
তৃষ্ণা তব জুড়াল কি,
লালা ফুলের বেদনা ভুলিবে কি পলাশ ফুলে॥

১০

অরুণ-রাঙা গোলাপ-কলি
কে নিবি সহেলি আয়।
গালে যার গোলাপি আভা
এ ফুল-কলি তারে চায়॥

ডালির ফুল যে শুকায়ে যায়—
কোথায় লায়লি, শিরী কোথায়,
কোথা প্রেমিক বিরহী মজনু
এ ফুল দেব কাহার পায়॥

পূর্ণ চাঁদের এমন তিথি
ফুল-বিলাসী কই অতিথি,
বুলবুলি বিনে এ গুল যে
অভিমানে মুরছায়॥

১১

অগ্নিগিরি ঘুমন্ত উঠিল জাগিয়া।
বহ্নিরাগে দিগন্ত গেল রে রাঙিয়া॥
রুদ্র রোষে কি শঙ্কর ঊর্ধ্বের পানে
লক্ষ ফণা-ভুজঙ্গ বিদ্যুৎ হানে
দীপ্ত তেজে অনন্ত নাগের ঘুম ভাঙিয়া॥
লংকা-দাহন হোমাগ্নি সাগ্নিক মন্ত্র
যজ্ঞ-ধূম বেদ ওঙ্কার ছাইল অনন্ত।

খড়গ-পাণি শ্রীচণ্ডী অরাজক মহীতে
দৈত্য নিশুম্ভ-শুম্ভে এলো বুঝি দহিতে,
বিশ্ব কাঁদে প্রেম-ভিক্ষু আনন্দ মাগিয়া॥

১২

রুমঝুম ঝুমঝুম নূপুর বোলে।
বনপথে যায় কে বালিকা
গলে শেফালিকা,
মালতী-মালিকা দোলে॥

চম্পা মুকুলগুলি
চাহে নয়ন তুলি,
নাচে নট-বিহগ শিখী তরুতলে॥

১৩

রুমু রুমু ঝুম রুমু ঝুমু বাজে নূপুর।
তালে তালে দোদুল দোলে নাচের নেশায় চুর॥

চঞ্চল বায়ে আঁচল উড়ায়ে
চপল পায়ে ও কে যায়
নটিনী কল-তটিনীর প্রায়—
চিনি বিদেশিনী, চিনি গো তায় ;
শুনি ছন্দ তারি এ হিয়া ভরপুর॥

নাচন শিখালে ময়ূর মরালে,
মরীচি-মায়া মরুতে ছড়ালে।

বন-মৃগের মন হেসে ভুলালে,
ডাগর আঁখির নাচে সাগর দুলালে ;
গিরি-দরী বনে গো দোল লাগে নাচনের শুনে তার সুর॥

১৪

লীলায়িত চঞ্চল অঞ্চল পরশনে—
কে দিলে গো সাড়া চকিতা ফুলবনে॥

ঢলঢল নয়না চকিতা কুহেলি গো,
অবশ তনু-মন পলকের দরশনে॥

১৫

রিনিকি ঝিনিকি রিনিঝিনি
রিনিঝিনি পায়েলা বাজে।
নওল কিশোরী ধায় অভিসারে
ভবন তেয়াগি বন-মাঝে॥
বারণ করে তায়
লতিকা ধরি পায়,
ভাব-বিলাসিনী না মানে
গুরুজন ভয়-লাজে॥

১৬

কে গো গানে গানে হিয়া ভরালে।
নিরাশা ভুলায়ে আশা ধরালে॥
বলো বলো মোরে কেন এমন করে
পলকে পুলকে আঁখি ঝরালে॥

১৭

কেন আসিলে ভালোবাসিলে
দিবে না ধরা জীবনে যদি।
বিশাল চোখে মিশায়ে মরু
চাহিলে কেন গো বে-দরদি॥

ছিনু অচেতন আপনা নিয়ে,
কেন জাগাইলে আঘাত দিয়ে ;
তব আঁখিজল সে কি শুধু ছল,
এ কি মরু হায়, নয় জলধি ॥

ওগো কত জনমের কত সে কাঁদন
করে হাহাকার বুকের তলায়—
ওগো কত নিরাশা, কত অভিমান,
ফেনায়ে ওঠে গভীর ব্যথায় ;
মিলন হবে কোথা সে কবে
কাঁদিছে সাগর স্মরিয়া নদী ॥

১৮

কাহারই তরে কেন ডাকে
'পিয়া পিয়া' পাপিয়া।
বঁধু বুঝি পরদেশে
(হায়) আছে ভুলিয়া ॥

বুঝি বা আসিবে বলে
ওগো প্রিয় তারই গেছে চলে
নিঠুর শ্যামেরই সম
পদে দলিয়া ॥

১৯

কিশোরী, মিলন-বাঁশরি শোন বাজায় রহি রহি
বনের বিরহী ;
লাজ বিসরি চল জলকে ॥

তার বাঁশরি শুনি কথার কুহু
ডেকে ওঠে কুহু কুহু মুহু মুহু ;

রস-যমুনা-নীর হলো অধীর,
রহে না থির—
ও তার দুকূল ছাপায়ে
তরঙ্গ-দল ওঠে ছলকে॥

কেন লো চমকে দাঁড়ালি থমকে,
পেলি দেখতে কি তোর প্রিয়তমকে ;
পেয়ে তারি কি দেখা
নাচিছে কেকা,
হলো উতলা মৃগ কি দেখে চপলকে॥

২০

আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশি বাজায়।
সুরের বেদন বাজে গোপন হিয়ায়॥
সুখ-স্মৃতি সাথে ওই সুর-মায়ায়
কত দুখ মিশে যেন আলোক-ছায়ায়॥

আজি নিশীথ রাতে জাগি তারার সাথে
তারি স্মৃতিটি নিয়া নীরব ব্যথায়॥

২১

কানন-পারে মুরলী-ধ্বনি শুনি।
মনের তারে তারি বাজে রাগিণী॥

সুরের মদিরা পিয়া
বিভোর অবশ হিয়া,
ভাসাই অকূল পানে হৃদি-তরণী॥

২২

কেন ঘুম ভাঙালে প্রিয় যদি ঠেলিবে পায়ে।
বৃথা বিকশিত কুসুম কি যাবে শুকায়ে।
একা বন-কুসুম ছিনু বনে ঘুমায়ে॥

ছিল পাশরি আপন-বেভুল কিশোরী হিয়া,
বধূর বিধুর যৌবন কেন দিলে জাগায়ে।
প্রিয় গো প্রিয়—
আকাশ বাতাস কেন ব্যথার রঙে তুমি
দিলে রাঙায়ে॥

২৩

ঘন দেয়া গরজায় গো।
কেঁদে ফিরে পুবালি বায়॥

একা ঘরে মম ডর লাগে,
কার বিধুর স্মৃতি মনে জাগে ;
বারিধারে কাঁদে চারিধার—
সে কোথায়, আজি সে কোথায়॥

গগনে বরষে বারি,
তৃষ্ণা গেল না তবু আমারি ;
কোন দূর দেশে প্রিয়তম
এ বিধুর বরষায়॥

২৪

গগনে সঘনে চমকিছে দামিনী।
মেঘ-ঘন-রস রিমঝিম বরষে
একেলা ভবনে বসি বাতায়নে
পথ চাহে বিরহিণী কামিনী॥

পুবালি পবন বহে দাদুরী ডাকে,
অভিসারে চলে খুঁজে কাহাকে
বৈরাগিনী সাজে উন্মনা যামিনী॥

২৫

ঢল ঢল নয়নে
স্বপনের ছায়া গো।
কোন অমরার
কোন মায়া গো॥

মনের বনের পারে
চকিতে দেখেছি যারে—
সে এলো কি আজ
ধরি কায়া গো॥

২৬

তুমি কেন এলে পথে।
ঝরা মল্লিকা ছড়াইতেছিনু
একাকিনী নদী-স্রোতে॥

কলসি আমার অলস খেলায়
ধীর তরঙ্গে যদি ভেসে যায়,
তীরে সে কলসি তুলে আনো তুমি
কেন নদীজল হতে॥

আমার নিরালা বনে
আমি গাঁথি হার, তুমি গান গাহি
ধ্যান ভাঙো অকারণে।
আমি মুখ হেরি আরশিতে একা,
তুমি সে মুকুরে কেন দাও দেখা;
বাতায়নে চাহি তুমি কেন হাসো
আসিয়া চাঁদের রথে॥

২৭

জানি জানি তুমি আসিবে ফিরে।
আবার উঠিবে চাঁদ নিরাশা-তিমিরে॥

নিঝুম কাননে থাকি
ডাকিবে গানের পাখি,
দখিন সমীরণ আবার বহিবে ধীরে॥

আবার গাঙের জলে আসিবে জোয়ার,
জ্বলিবে আশার দীপ, রবে না আঁধার।

তোমার পরশ লেগে
ঘুম মোর যাবে ভেঙে,
একদা প্রভাতে প্রিয় আকুল নয়ন-নীরে॥

২৮

ঝর্ঝর নির্ঝর-ধারা বহে পাহাড়ি-পথে
যেন বনদেবীর বীণা বাজে ভোর আলোতে॥

ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি প্রভাতি তারা
শোনে সেই জল-ছলছল সুর তন্দ্রাহারা,
গলে পড়ে আনন্দে তুষার-ধারা
গিরি-শিখর হতে॥

রঙিন প্রজাপতি অলস মনে
হালকা পাখায় ফেরে দোপাটি বনে।
শোনে মঞ্জীর বন-লক্ষ্মীর,
কঙ্কণ চুড়ি বাজে নুড়ির তালে,
পাষাণ-জাগানো ঝর্না-স্রোতে॥

২৯

থৈ থৈ জলে ডুবে গেছে পথ,
এসো এসো পথ-ভোলা।
সবাই দুয়ার বন্ধ করেছে,
(আছে) আমার দুয়ার খোলা॥

সৃষ্টি ডুবায়ে ঝরুক বৃষ্টি,
ঘন মেঘে ঢাকো সবার দৃষ্টি ;
ভুলিয়া ভুবন দুলিব দুজন
বাঁধি প্রেম-হিন্দোলা ॥

সব পথ যবে হারাইয়া যায়
দুর্দিনে মেঘে ঝড়ে,
কোন পথে এসে সহসা সেদিন
দোলো মোরে বুকে ধরে।

নিরাশা-তিমিরে ঢাকা দশ-দিশি,
এলো যদি আজ মিলনের তিথি—
আমার ঝুলনা বাঁধিয়া শ্রীহরি,
দাও দাও মোরে দোলা ॥

৩০

প্রাণে তোমার প্রাণ মিলিয়ে, সই !
প্রাণে প্রাণে প্রাণের টানে
প্রাণের কথা কই ॥

আঁখি-নটির নাচ দেখে তোর
ময়ূর নাচে গো,
দোলন-চাঁপার আতর মেখে
কোকিল ডাকে ঐ ॥

হৃদয় আমার হারিয়ে গেছে
তোমার কাছে গো,
পরে মোহন বাহুর বাঁধন
বন্দি হয়ে রই ॥

৩১

নামিল বাদল।
রুমু রুমু ঝুমু নূপুর চরণে
চল লো বাদল-পরী আকাশ-আঙিনা ভরি
নৃত্য-উছল ॥

চামেলি কদম যূথী মুঠি মুঠি ছড়ায়ে
উতল পবনে দে অঞ্চল উড়ায়ে,
তৃষিত চাতক-তৃষ্ণারে জুড়ায়ে
চল ধরাতল ॥

৩২

নিশি-ভোরে অশান্ত ধারায়
ঝরঝর বারি ঝরে।
আকাশ-পারের বিরহী বীণায়—
যেন সুর ঝুরে ব্যাকুল স্বরে ॥

কাহার মদির নিঃশ্বাস আসে
বকুলের বনে ঝরা ফুলবাসে?
কর হানি দ্বারে যেন বারে বারে
'খোলো দুয়ার' বলি ডাকে ঘুমঘোরে ॥

ডাকে কেয়া-বনে ডাহুক, কেকা,
বিরহের ভার বহি কত আর একা?
ম্লান হয়ে এলো চোখে কাজলের লেখা
অশ্রু-লোরে ॥

৩৩

ফুটলো যেদিন ফাল্গুনে, হায়, প্রথম গোলাপ কুঁড়ি
বিলাপ গেয়ে বুলবুলি মোর গেল কোথায় উড়ি ॥

কিসের আশায় গোলাপ-বনে
গাইত সে গান আপন মনে,
লতার সনে পাতার সনে খেলত লুকোচুরি ॥

সেই লতাতে প্রথম প্রেমের ফুটলো মুকুল যবে
পালিয়ে গেল ভীরু পাখি অমনি নীরবে।

বাসলে ভাল যে-জন কাঁদে
বাঁধব তারে কোন সে ফাঁদে,
ফুল নিয়ে তাই অবসাদে বনের পথে ঘুরি॥

৩৪

তব ফুলহার নহে মোর নহে।
ভুলায়ো না আর মালার মোহে॥

মালার সাথে যদি না মেলে হৃদয়
হানে আরো জ্বালা মালা সে নয়
আরও কাঁদায় বিরহে॥

৩৫

ও কে টলে টলে চলে একেলা গোরী।
নব-যৌবনা নীল-বসনা কাঁখে গাগরি॥

মদির মন্দ বায় অঞ্চল দোলে,
খোঁপা খুলে দোলে আকুল কবরী॥
তারে ছল ছল ডাকে দূরে ডাকে নদী,
তারি নাম জপে পাপিয়া নিরবধি,
ডাকে বনের কিশোর বাজায়ে বাঁশরি॥

৩৬

মধুর নূপুর রুমুঝুমু বাজে।
কে এলে মনোহর নটবর-সাজে॥

নিশীথের ফুল ঝরে রাঙা পায়ে,
মাধবী রাতের চাঁদ এলে কি লুকায়ে!
'পিয়া পিয়া' বলে পাখি ডাকে বন-মাঝে॥

৩৭

কথার কুসুম গাঁথা গানের মালিকা কার
ভেসে এসে হতে চায় গো আমার গলার হার ॥

আমি তারে নাহি জানি,
তার সুরের সূত্রখানি
তবু বিজড়িত হয় কেন গো আমার কঙ্কণে বারবার ?

তার সুরের তুলির পরশে ওঠে আমার ভুবন রাঙি ;
কোন বিস্মৃত জনমের যেন কত স্মৃতি ওঠে জাগি।

আমার রাতের নিঁদে
তার সুর এসে প্রাণে বিঁধে,
যার সুর এত চেনা কবে দেখা পাবো সেই অচেনার ॥

৩৮

বিরহের অশ্রু-সায়রে বেদনার শতদল
উদাসী অশান্ত বায়ে টলে টলমল টলমল ॥

তব রাঙা পদতলে, প্রিয়,
এই শতদলে রাখিয়ো,
বাজাইও মধুকর বীণা
অনুরাগ-চঞ্চল ॥

ঝড় এলো এলো এলায়ে মেঘের কুন্তল,
তুমি কোথায়, হায়, নিরাশায় ঝরে কমল-দল ॥

কেমনে কাটে তব বেলা
কোথা কোন লোকে একেলা
দুই কূলে দুই জন কাঁদি,
মাঝে নদী ছলছল ॥

৩৯

আনো আনো অমৃত-বারি
পিপাসিত চিত্তের তৃষ্ণা নিবারি ॥

আনো নন্দন হতে পারিজাত–কেশর
তীর্থ–সলিল আনো ভরি মঙ্গল–হেম–ঝারি॥

প্রখর সূর্যকর দহিছে দিগন্তর,
মন্দাকিনী–ধারা সঞ্জীবনী আনো নারী॥

৪০

রুমুঝুম রুমুঝুম নূপুর বাজে
আসিল রে, প্রিয় আসিল রে।
কদম্ব কলি শিহরে আবেশে,
বেণীর তৃষ্ণা জাগে এলোকেশে,
হৃদি–ব্রজধাম রস–তরঙ্গে
প্রেম–আনন্দে ভাসিল রে॥

ধরিল রূপ অরূপ শ্রীহরি,
ধরণি হলো নবীনা কিশোরী ;
চন্দ্রার কুঞ্জ ছেড়ে যেন কৃষ্ণ–চন্দ্রমা
গগনে হাসিল রে॥

আবার মল্লিকা মালতী ফোটে,
বিরহ–যমুনা উথলি ওঠে
রোদন ভুলে রাধা গাহিয়া ওঠে—
'সুন্দর মোর ভালোবাসিল রে॥'

৪১

গাগরি ভরণে চলে চপলা ব্রজনারী
যৌবন–লাবণি অঙ্গে বিথারি॥

কাজল কালো নয়ন গরল–মাখানো বাণ,
চকিত চাহনি হানে চতুরা শিকারি॥

চঞ্চল অঞ্চল উড়ায় সাঁঝের বায়,
আধো আলো আধো ছায়া লুকোচুরি খেলে যায়।
রাঙা তপন হেসে লুকায় লতার পাশে
কাঁদে দরশ–ভিখারি॥

৪২

কাছে গেলে সে যে দূরে সরে যায়।
দূরে গেলে কেন ডাকে ইশারায়॥

বল সখি বল
কেন চোখে জল,
সদা কেন প্রাণ কাঁদে বেদনায়॥

অবোধ ললনা
না বুঝে ছলনা,
কেন দিনু প্রাণ বে-দরদী পায়॥

৪৩
নৃত্য সঙ্গীত

আজি নতুন এ চাঁদের তিথিতে
কোন অতিথি এলে ফুল-বীথিতে॥

যদি বেদনা পাও বঁধু পথ চলিতে
তাই ছেয়েছি বনপথ ফুল-কলিতে ;
জানি, ভাল জান হে বঁধু ফুল দলিতে
এসো বঁধু সুমধুর প্রীতিতে॥

এসো মনের মন্দিরে দেবতা আমার,
লহ প্রেমের চন্দন আঁখিজল-হার,
আজি সফল করো সাধ আমার পূজার
চির-জনম রহ মোর স্মৃতিতে॥

এন. ১৯২০

৪৪

খোল খোল গো আঁখি।
পোহাল পোহাল নিশি
খোল খোল গো আঁখি॥

কুঞ্জ-দুয়ারে তব গাহিছে পাখি
ওই গাহিছে পাখি॥

ওই বংশী বাজে দূরে
শোন ঘুম-ভাঙানো সুরে,
খোল দ্বার, লহ বঁধুরে ডাকি॥

৪৫

কে গো তুমি গন্ধ-কুসুম
গান গেয়ে কি ভেঙেছ ঘুম।
তোমার ব্যথার নিশীথ নিঝুম
হেরে কি মোর গানের স্বপন॥

সুরের গোপন বাসর-ঘরে
গানের মালা বদল করে
সকল আঁখির অগোচরে
না দেখাতে মোদের মিলন॥

৪৬

একলা গানের পায়রা উড়াই।
সে কাছে নাই গো, সে কাছে নাই॥

চাঁদ ভালো লাগে না—তার চেনা কার যেন
ইহুদি মাকড়ি,
সে কেন কাছে নাই, অভিমানে ঝরে যায়
গোলাপের পাপড়ি।
ফিরোজা আকাশের জাফরানি জোছনায়
মন ভরে না, কি যেন চাই গো
কি যেন চাই॥

৪৭

বসন্ত এলো এলো এলো রে।
পঞ্চম স্বরে কোকিল কুহরে
মুহু মুহু কুহু কুহু তানে।

মাধবী নিকুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে
ভ্রমর গুঞ্জে গুন গুন গানে

বেণুকার বনে বাঁশি বাজে,
বনমালী এলো বন মাঝে,
নাচে তরু লতিকা যেন গোপ গোপিকা
রাঙা হয়ে রঙের বানে॥

পিউ পিউ ডেকে ওঠে পাপিয়া
মহুল, পলাশ বন ব্যাপিয়া।

সুরভিত সমীরণ চঞ্চল উন্মন
আনে নব-যৌবন প্রাণে॥

৪৮

এ কি এ মধু শ্যাম-বিরহে।
হৃদি-বৃন্দাবনে নিতি রসধারা বহে॥

গভীর বেদনা মাঝে
শ্যাম-নাম-বীণা বাজে
প্রেমে মন মোহে যত ব্যথায় প্রাণ দহে॥

৪৯

গারা

নিরজন ফুলবন, এসো প্রিয়া।
রহি রহি বোলে কোয়েলিয়া॥
পথ পানে চাহি
নাই নিঁদ নাহি-
ঝরা ফুল জড়ায়ে ঝুরে হিয়া॥

৫০

নটমল্লার

নাচে নন্দ-দুলাল।
নদী-তরঙ্গে অধীর রঙ্গে
বাজে মঞ্জীর চঞ্চল তাল॥
চরণের নূপুর খুলে
ফুল হয়ে ঝরে তরুমূলে,
পুবালি পবন বন-ভবনে
দোলে সে ছন্দে পিয়াল তমাল॥

মধুকর কল-গুঞ্জনে
কাজরি গাহে নীপবনে,
ময়ূর পাপিয়া উঠিল মাতিয়া
বাজে বৃষ্টির বীণা করতাল॥

৫১

আনন্দী

দূর বেণু-কুঞ্জে বাজে মুরলি মুহু মুহু
যেন বারে বারে
ডাকে আমারে
বাঁশুরিয়ার মধুর সুরের কুহু॥

৫২

মিয়া কি মল্লার

ঝড়ের বাঁশিতে কে গেলে ডেকে
হে তরুণ অশান্ত।
গুরু গুরু বাজিল মেঘ-মৃদঙ্গ,
দুলিয়া উঠিল বন-বনান্ত॥

সাগর-তরঙ্গ মাঝে
তব মণি-মঞ্জীর বাজে,
অম্বর ব্যাপিয়া দোলে
ধূলি-গৈরিক তব বসন-প্রান্ত॥

শাওন-ঘন তব লাবণি
বিন্দু বিন্দু ঝরি ভরিল ভবনী,
কৃষ্ণচূড়ার রাঙা অঞ্জলি ঝরে
চঞ্চল তব চরণে, হে কান্ত॥

৫৩
যোগিয়া

কেন গো যোগিনী! বিধুর অভিমানে
যৌবনে মগন গভীর ধ্যানে॥
হের গো কুসুম ঝরিয়া পায়ে
চাহিয়া রহে ধরণির পানে॥

৫৪
দেশী-টোড়ী

এসো প্রিয় আরো কাছে
পাইতে হৃদয়ে যে বিরহী মন যাচে।
দেখাও প্রিয়-ঘন
স্বরূপ মোহন
যে রূপে প্রেমাবেশে পরান নাচে॥

•

৫৫
ভৈরবী

স্বপনে এসেছিল মৃদুভাষিণী,
মৃদুভাষিণী মধুহাসিনী।
রূপের তৃষ্ণা মোর রূপ ধরে এসেছিল
কল্পনা মনোবন-বাসিনী॥
যে পরম সুন্দর
আছে মোর অন্তরে
তারি অভিসারে আসে উদাসিনী॥

এন. ২৭০৬৩

৫৬

দেশী

সে ধীরে ধীরে আসি
আধো ঘুমে বাজাল বাঁশি
ফুল-রাখি দিল বাঁধি হাসি।।

জাগিয়া নিশিভোরে
না হেরি বাঁশির কিশোরে,
চাঁদ-তরী বেয়ে গেলো ভাসি।।

এন. ১৭২৬১

৫৭

টলমল টলে হৃদয়-সরসী।
নীর ভরণে এলে কে ষোড়শী।।

এলে কি নাহিতে পরশ চাহিতে,
এলে কি অলস তরণী বাহিতে,
এলে কি ভুলিতে কমল তুলিতে
আমার স্বপন-মানসী।।

৫৮

অনেক কথা বলার মাঝে
লুকিয়ে আছে একটি কথা।
বলতে নারি সেই কথাটি
তাই এ মুখর ব্যাকুলতা।।

সেই কথাটি ঢাকার ছলে
অনেক কথা যাই গো বলে,
ভাসি আমি নয়ন-জলে
বলতে গিয়ে সেই বারতা।।

অবকাশ দেবে কবে,
কবে সাহস পাব প্রাণে,
লজ্জা ভুলে সেই কথাটি
বলব তোমার কানে কানে।

মনের বনে অনুরাগে
কত কথার মুকুল জাগে
সেই মুকুলের বুকে জাগাও
ফুটে উঠার ব্যাকুলতা॥

৫৯

ঝিলের জলে কে ভাসালে
নীল শালুকের ভেলা
মেঘলা সকাল বেলা।
বেণু-বনে কে খেলে রে
পাতা-ঝরার খেলা
মেঘলা সকাল বেলা॥

কাজল-বরণ পল্লীমেয়ে
বৃষ্টিধারায় বেড়ায় নেয়ে,
বসে দিঘির ধারে মেঘের পানে
রয় চেয়ে একেলা।
মেঘলা সকাল বেলা॥

দুলিয়ে কেয়া ফুলের বেণী
শাপলা-মালা পরে
খেলতে এলো মেঘ-পরীরা
ঘুমতী নদীর চরে।
বিজলিতে কে দূর বিমানে,
সোনার চুড়ির ঝিলিক হানে,
বনে বনে কে বসালো
জুঁই-চামেলির মেলা।
মেঘলা সকাল বেলা॥

ভারতবর্ষ, পৌষ, ১৩৪৫

৬০

আজো কাঁদে কাননে কোয়েলিয়া।
চম্পা কুঞ্জে আজো গুঞ্জে ভ্রমরা,
কুহরিছে পাপিয়া॥

প্রেম-কুসুম শুকাইয়া গেল, হায়!
প্রাণ-প্রদীপ মোর, হের গো, নিভে যায়,
বিরহী এসো ফিরিয়া॥
তোমারি পথ চাহি, হে প্রিয়, নিশিদিন
মালার ফুল মোর ধুলায় হ'লো মলিন,
জনম গেল ঝুরিয়া।

৬১

মৃত্যু নাই, নাই দুঃখ—
আছে শুধু প্রাণ—
অনন্ত আনন্দ হাসি অফুরান॥

নিরাশার বিবর হতে—
আয় রে বাহির পথে,—
দেখ নিত্য সেথায়
আলোকের অভিযান॥

ভিতর হতে দ্বার বন্ধ করে—
জীবন থাকিতে কে আছিস মরে।
ঘুমে যারা অচেতন,—
দেখে রাতে কুস্বপন,
প্রভাতে ভয়ের নিশি হয় অবসান॥

৬২

ওরে আজ ভারতের নব যাত্রাপথের
বাঁশি বাজলো, বাজলো বাঁশি।
ফেলে তরুর ছায়া ভুলে ঘরের মায়া
এলো তরুণ-পথিক এলো রাশি রাশি॥

তারা আকাশকে আজ চাহে লুটে নিতে,
তারা মন্থর ধরায় চাহে দুলিয়ে দিতে।
(তারা তরুণ—তরুণ প্রাণ জাগায় মৃতে)
সাহস জাগায় চিতে তাদের অট্টহাসি॥

মোরা প্রাচীরের পরে রে প্রাচীর তুলে
ভাই হয়ে ভাইকে হায় ছিলাম ভুলে।

আজ ভেঙে প্রাচীর হলো ঘরের বাহির
একই অঙ্গনে দাঁড়াল উন্নত শির।
এলো মুক্ত-গগনতলে প্রাণ-পিয়াসী॥
এলো তরুণ পথিক ছুটে রাশি রাশি॥

৬৩

কালের শঙ্খে বাজিছে আজও
তোমারই মহিমা, ভারতবর্ষ।
প্রণতি জানায়ে বিশ্বভুবন
শিখিছে আজিও তব আদর্শ॥

নিখিল মানবের প্রথমা ধাত্রী
শিক্ষা-সভ্যতা দীক্ষাদাত্রী!
আসিল যুগে যুগে দেবতা মুনি ঋষি
লভিতে তোমারি চরণস্পর্শ॥

শিল্প সঙ্গীত বেদ বিজ্ঞান
সাংখ্য-দর্শন পুণ্য প্রেমধ্যান,
যাহা কিছু সুন্দর যাহা কিছু মহীয়ান
বিশ্ব সাক্ষী, মা গো, সকলি তোমার দান।
জগৎ-সভা মাঝে তাহারি সন্তান
আজি মলিন-মুখ লাজে বিমর্ষ॥

৬৪

দে দোল, দে দোল, ওরে দে দোল, দে দোল।
জাগিয়াছে ভারত-সিন্ধু-তরঙ্গে কল-কল্লোল॥
পাষাণ গলেছে রে, অটল টলেছে রে,
জেগেছে পাগল রে, ভেঙেছে আগল।
দে দোল দে দোল॥

বন্ধন ছিল যত, হলো খান খান রে,
পাষাণ-পুরীতে ডাকে জীবনের বান রে,
মৃত্যু-ক্লান্ত আজি কূড়াইয়া প্রাণ রে,
দুর্দম যৌবন আজি উতরোল।
দে দোল দে দোল॥

অভিশাপ-রাত্রির আয়ু হলো ক্ষয় রে,
আর নহি অচেতন, আর নাহি ভয় রে,
আজও যাহা আসেনি আসিবে সে জয় রে,
আনন্দ ডাকে দ্বারে, খোল্ দ্বার খোল্
দে দোল দে দোল॥

৬৫

[দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মহাপ্রয়াণে]

জাগো জাগো জাগো হে দেশপ্রিয় !
ভারত চাহে তোমায়, হে বীর বরণীয়॥
চিতার ঊর্ধ্বে, হে অগ্নিশিখা,
ঊর্ধ্বে কারার বন্ধন-হারা, হে বীর জাগো,
শরণ দাও, হে চির-স্মরণীয়॥

ধূলির স্বর্গে যতীন্দ্র জাগো,
বজ্র-বাণী অম্বরে হানি জাগো,
তব ত্যাগের মন্ত্র শুনাইও॥

ভারত কাঁদে অনন্ত শোকে
নিদ্রাহীনা ধূলি-শয়নলীনা, জাগো,
মথিয়া মৃত্যু আনো প্রাণ-অমিয়॥

৬৬

আমি রবি-ফুলের ভ্রমর।
তার আলোক-মধু পিয়ে আমি
আলোর মধুপ অমর॥

ঐ শ্বেত শতদল ফুটলো যেদিন
গভীর গগন নীল সায়রে,
তার আলোর শিখা আকাশ ছেপে
ছড়িয়ে গেল বিশ্ব পরে—
স্তরে স্তরে,
সেই বহ্নি-দলের পরাগ-রেণু
আমিই যেন প্রথম পেনু—
প্রথম পেনু গো ;
তাই বাহির পানে ধেয়ে এনু
গেয়ে আকুল স্বরে
আজ জাগো জগৎ! ঘুম টুটেছে
বিশ্বে নিবিড় তমোর॥

তার জাগরণীর অরুণ-কিরণ-
গন্ধ যেদিন নিশি-শেষে
এই অন্ধ জগৎ জাগিয়ে গেল
আকাশ-পথের হাওয়ায় ভেসে—
হঠাৎ এসে ;
আমি ঘুম-চোখে মোর পেনু আভাস,
ঘরের বাহির-করা সে বাস
ভাঙলে আবাস মোর।
তাই কূজন-বেণু বাজিয়ে চলি
আলোর দেশের শেষে
যথা সহস্রদল কমল-আনন
জাগছে প্রিয়তমর॥

যেন এ শ্বেত-সরোজ-সরোদ বাঁধা
সপ্ত সুরের রঙিন তারে—
রচছে সুরের ইন্দ্রধনু
গগন-সীমার তোরণ-দ্বারে—
তমোর পারে ;

তার সে সুর বাজি আমার পাখায়
গগন-গহন শাখায় শাখায়
তারায় কাঁপায় গো।
জাগে ঐ কমলে পরশ প্রিয়ার
চরণ নিরুপমর॥

৬৭

এসো হে সজল শ্যাম ঘন দেয়া।
বেণু-কুঞ্জ-ছায়ে এসো তাল তমাল বনে
এসো শ্যামল ফুটাইয়া যূথী কুন্দ নীপ কেয়া॥

বারিধারে এসো চারিধার ভাসায়ে
বিদ্যুৎ-ইঙ্গিতে দশ দিক হাসায়ে
বিরহী মনে জ্বালায়ে আশা-আলেয়া।
ঘন দেয়া মোহনীয়া শ্যাম পিয়া॥

শ্রাবণ-বরিষণ-হরষণ ঘনায়ে,
এসো নবঘন শ্যাম নূপুর শুনায়ে

হিজ্জল তমাল ডালে ঝুলন ঝুলায়ে,
তাপিতা ধরার চোখে অঞ্জন বুলায়ে,
যমুনা-স্রোতে ভাসায়ে প্রেমের খেয়া।
ঘন দেয়া মোহনীয়া শ্যাম পিয়া॥

৬৮

ও বাঁশের বাঁশি রে, বাজে বাজে
নদীর ওপারে॥
(ও সে) কেঁদে কেঁদে ডাকে আমায় রাতের আঁধারে
নদীর ওপারে॥

সই বন্ধুরে মোর আয় লো দিয়ে
আমার গলার মালা নিয়ে,
আমি চেয়েছি তার বাঁশিখানি বলিস লো তারে।
নদীর ওপারে॥

সই এ জনমে মিটলো না সাধ, হলাম না তার দাসী,
বলিস তারে আর-জনমে হই যেন তার বাঁশি।

গহীন রাতে মুখে মুখে
কাঁদব দুজন মনের দুখে,
(এবার) মনের আশা ধুয়ে গেল নয়ন-ধারে
নদীর ওপারে॥

৬৯

ঐ জলকে চলে লো কার ঝিয়ারী।
রূপ চাপে না তার নীল শাড়ি॥

এমন মিঠি বিজলি দিঠি
শেখালে তায় কে গো?
রূপে ডুবু ডুবু রবির রঙ-ভরা ছবির,
ছোঁয়াচ লেগেছে গো।
মন মানে না, আর কি করি!
চলে পিছনে ছুটে তারি॥

নাচে বুলবুলি ফিঙে ঢেউয়ে নাচে ডিঙ্গে
মাঠে নাচে খঞ্জন;
তার দুটি আঁখিতারা নেচে হতো সারা—
দেখেছে বল কোন জন?
আঁখি নিল যে মোর মন কাড়ি—
ঘরে থাকিতে আর নারি॥

গোলাপ বেলী যুঁই চামেলি—
কোন ফুল তারি তুল গো?
তার যৌবন-নদী বয়ে নিরবধি
ভাসায়ে দুকূল গো।
নিল ভাসায়ে প্রাণ আমারি
রূপে দুকূল-ছাপা গাঙ তারি॥

৭০

দূরের বন্ধু আছে আমার গাঙের পারের গাঁয়ে।
ঝরাপাতার পত্র আমার যায় ভেসে তার পায়ে॥

জানি জানি আমার দেশে
আমার নেয়ে আসবে ভেসে,
চির-ঋণী আছে সে যে আমার প্রেমের দায়ে॥

নতুন আশার পাল তুলে সে আসবে ফিরে ঘরে,
তাই ফুটেছে কাশ-কুসুমের হাসি শুকনো চরে।

পিদিম জ্বেলে তারি আশায়
গহীন গাঙের সোঁতে ভাসাই,
ঐ পিদিমের পথ ধরে সে আসবে সোনার নায়ে॥

৭১

বেলাশেষে গিরি-পথের ছায়ে
কলস ভরে কুঁড়েয় ফেরে
সার বেঁধে ঐ বনের কালো মেয়ে॥

তাদের পায়ে বাজে মল,
চলন-দোলায় নয়ন ভোলায়
উছলে পড়ে জল ;
তারা আপন মনে পথের টানে,
চলে রে গান গেয়ে॥

গাইল যে রে উদাস-করা গান
বিভোর করে বনের মন-প্রাণ,
সুরে ভুবন হলো মগন,
আকাশ গেল ছেয়ে॥

তাদের ফুলে বাঁধা কেশ,
কাজল-নয়ন, হৃদয়-হরণ,
বন-দেবীর বেশ ;
তাদের কালো রূপের ধারায় নেয়ে
পাষাণ রহে চেয়ে॥

৭২

আকাশের আর্শিতে ভাই
পইড়াছে মোর মনের ছায়া।
ওরে ও পথের বাউল
ঘরের কোণায় কিসের মায়া॥

উজান গাঙের স্রোতের টানে
মন-পবনের নায়ের গানে
কানাকানি কইরা কী কয়
ঈশান কোণের পাগলা দেয়া॥

পাগলা দেয়া ভাঙলো বেড়া
মাচায় ওঠে জল,
তোর ছেঁড়া কাঁথা নেয় ভাসায়া,—
থাকবি কোথায় বল—
তুই থাকবি কোথায় বল—
আমার সাথে আয় না পথে রে
শেষ কইরা সব দেওয়া-নেওয়া॥

৭৩

নিশির নিশুতি যেন হিয়ার ভিতরে গো।
সে বলেও না টলেও না, থমথম করে গো॥
যেন নতুন পিঞ্জরের পাখি
ঘেরা টোপে ঢাকা থাকি ;
জটিলা কুটিলার ভয়ে
আছি আমি ঘরে গো॥

যেন চোরের বৌ কানতে নারি
ভয়ে ফুকারিয়া গো ;
আমি রান্নাঘরে কান্না লুকাই
লঙ্কা ফোঁড়ন দিয়া গো।

ব্যথার ব্যথী পাই রে কোথা
জানাই যারে মনের ব্যথা,
বুকে ধিকিধিকি তুষের আগুন
জ্বলবে চিরতরে,
বুঝি জ্বলবে জনম ভরে গো॥

৭৪

নাইতে এসে ভাটির স্রোতে কলসি গেল ভেসে।
সেই দেশে যাইও রে কলসি, বন্ধু রয় যে দেশে॥

জলকে এসে কাল সকালে কখন মনের ভুলে
ভাসিয়েছিলাম বন্ধুর লাগি খোঁপার কুসুম খুলে,
কূলে এসে লাগলো সে ফুল আজকে বেলাশেষে॥

কালকে আমার খোঁপার কুসুম পায়নি খুঁজে যারে—
কলসি আমার যাও রে ভেসে, খুঁজে আনো তারে।
আমার নয়ন-জল নিয়ে যাও, ঢেলো বন্ধুর পায় ;
(আমি) পিদিম জ্বেলে রইব জেগে তাহারি আশায় ;
আর কতদিন রইব এমন যোগিনীরই বেশে॥

৭৫

বৈঁচি মালা রইলো গাঁথা পিয়াল পাতা ঢাকা (লো)।
সে এলো না, সয় না লো আর একলা ঘরে থাকা (লো)॥
সে বর্শা ধনুক নিয়ে হাতে
ঘুরে বেড়ায় কাহার সাথে?
(সে) আসবে কবে চাঁচর কেশে বেঁধে পাখির পাখা (লো)॥

(সে) বলেছিল ডাগর হবে টগর-চারা যবে
লুকিয়ে এসে আমার হাতের বৈঁচি-মালা লবে (লো)।

আজ টগর গাছে ফুল ফুটেছে
ফাগুন মাসের চাঁদ উঠেছে,
আঙিনাতে ফুল ছড়িয়ে কাঁদে পলাশ-পাখা লো॥

৭৬

ডাল মেল, পত্র মেল, ওরে তরুলতা।
কইতে পার আমার প্রাণের বন্ধু গেল কোথা ?

ও তরু তোর পাতার কোলে
ফোটা ফুলের হাসি দোলে,
(সে কি) তোর কুসুমের মালা গলে বসেছিল হোথা ?

ঢেউ-এর মালা গলায় পরে নাচিস নদী-জল,
তরী বেয়ে বন্ধু আমার কোথায় গেল বল !
চাঁদের তিলক পরে আকাশ
হেসে হেসে কেন তাকাস ?
তোর চাঁদ কি জানে মোর আকাশের চাঁদেরই বারতা ॥

৭৭

তোমার আসার আশায় দাঁড়িয়ে থাকি একলা বালুচরে।
নদীর পানে চেয়ে চেয়ে মন যে কেমন করে ॥

অনেক দূরে তরী বেয়ে আসে যদি কেউ,
আমার বুকে দুলে ওঠে উজান নদীর ঢেউ ;
নয়ন মুছে চেয়ে দেখি সে গিয়েছে সরে ॥

আঁচল-ঢাকা ফুলগুলিও শুকায় বুকের তলে,
ঘরে ফিরি গাগরি মোর ভরে নয়ন-জলে।

বিদেশে তো যায় অনেকে আবার ফিরে আসে,
কপাল-দোষে তুমি শুধু রইলে পরবাসে ;
অধীর নদীর রোদন বাজে বুকের পিঞ্জরে ॥

৭৮

নাই যদি পাই তবু জানি যেন আমি
তুমি মোর প্রিয়তম, তুমি মোর স্বামী।

প্রতীক্ষা করিব অনন্ত জনম—
আমার সে স্বপন ভাঙিয়ো না॥
বঁধু তুমি ভুলে থাকো মোরে ভুলিতে দিও না ;
মোর সব কেড়ে নাও, তব স্মৃতি কেড়ে নিও না॥

শুধু কাঁদিতে দাও প্রিয় তব বিরহে,
আমি তোমারে পাব না সকলে কহে,
তবু প্রেম-দীপ মোর জ্বলিতে দাও—
তারে নিভায়ো না॥

৭৯

সখি নাম ধরে কে ডাকে দুয়ারে।
চলে যাওয়া বন্ধু বুঝি ফিরে এলো জোয়ারে॥

সখি, নিত্য আমার বুকের মাঝে
যাহার চরণ-ধ্বনি বাজে
সেই পায়েরই ধ্বনি কানে শুনি
আমার আঙিনার ধারে॥

সাজ পরতে সাধ কেন হায়, বাম অঙ্গ নাচে ;
থাকি থাকি 'বৌ কথা কও' পাখি ডাকে গাছে।
গাঙের পারে বাজে বাঁশি
চাঁদের মুখে রাঙা হাসি
মোর মন কেঁদে কয়, 'সে এসেছে
আনলো ডেকে উহারে॥'

৮০

প্রাণ বন্ধু রে ! তোমার জন্য জীবন করলাম ক্ষয়।
জ্বালা পোড়া প্রাণে আর কত সয়॥

তোমাকে ভালোবাসি এ জগতে হইলাম দোষী।
পাড়ার লোকে কত মন্দ কয়, বন্ধু রে !

শাশুড়ি ননদী বৈরী, ঐ ঘরে বসতি করি—
আমায় দিন-রজনী দেখায় কত ভয়॥

তোমায় দেখব বলে ঘরের জল বাইরে ফেলে
জলে যাব যখন মনে আশা হয়, বন্ধু রে!
কলসি যখন লই কাঁখে,
শাশুড়ি ননদী দেখে,
তারা ডেকে বলে, 'কই যাও অসময়?'

না জানিয়ে প্রেম করিলে
নয়ন-জলে ভাসে সব সময়, বন্ধু রে!
জানিয়ে যে প্রেম করে,
ভাসে আনন্দ-সাগরে,
ও তার দূরে গেছে কাল-শমনের ভয়॥
ও বন্ধু রে!

৮১

তুমি পীরিতি কি করো, হে শ্যাম, তৈল মেখে গায়ে (লো)
তৈল মেখে গায়ে।
তাই ধরতে গেলে পিছলে যাও হে পালায়ে॥

ননী চুরি করে করে হাত পাকিয়ে শ্যাম
নারীর মন চুরি করে বেড়াও অবিরাম,
তাই রাই দিয়াছে নূপুরেরই বেড়ি বেঁধে পায় (লো)
বেড়ি বেঁধে পায়ে॥

তুমি দিনের বেলা চরাও ধেনু ভ্রমরা হও রাতে;
আর কুলবধূর রইল না কূল ব্রজে মথুরাতে।
শ্যাম তোমার গুণে ঘরে ঘরে ননদ-জায়ে॥
হলো সতীন ননদ-জায়ে॥

তোমার হাতের বাঁশি রাতের বেলা সিঁদকাঠি যে হয়,
তোমার চুরি কে ধরিবে, হে চোর মহাশয়!
কবে আমার ঘরে বন্দী হয়ে রইবে চুরির দায়ে॥

৮২

সন্ধ্যা হলো ঘরকে চলো, ও ভাই মাঠের চাষী !
ভাটিয়ালি সুরে বাজে রাখাল ছেলের বাঁশি॥

পিদিম নিয়ে একলা জাগে একলা ঘরের বধূ
হৃদয়-পাতে লুকিয়ে রেখে সারা দিনের মধু ;
পথ চেয়ে সে বসে আছে রে,
তার কাজ হয়েছে বাসি॥

যে মন সারাদিন ছিল পড়ে হালের গরুর পানে,
দিনের শেষে ঘরের জরু সেই মনকে টানে ;
সেথা মেটে ঘরের দাওয়ায় লুটায় রে ভাই !
তার কালো চোখের হাসি॥

পুবান হাওয়া ঢেউ দিয়ে যায় আউশ ধানের ক্ষেতে,
এই ফসলের দেখব স্বপন
ও ভাই, শুয়ে শুয়ে রেতে ;
সকাল বেলা আবার যেন
এই মাঠে ফিরে আসি॥

৮৩

ওগো ললিতে, আমি পারি না আর সহিতে,
শ্যাম-শোকে প্রাণ জ্বলে গো সদায়।
বৃন্দাবন পরিহরি শ্যাম গিয়াছে মথুরায়,
বন্ধু বিনে আমার প্রাণ যায়॥

এনে দে গো প্রাণ বন্ধু রে, ধরি তোদের পায়,
আমার বন্ধু রইল পরবাসে
জীবন রাখি কার আশায়॥

যার সনে যার মন মজেছে
সে কি ঘরে রইতে পারে প্রাণবন্ধু বিনে,
অহরহ সদাই পোড়ে, বন্ধু বিনে প্রাণ যায়॥

হস্ত দিয়ে দেখ রে আমার গায়—
কোমল অঙ্গ দগ্ধ হলো প্রাণ-বন্ধুর জ্বালায়—
বিচ্ছেদ-জ্বালায় প্রাণ জ্বলে,
বন্ধু বিনে কে নিভায়॥

৮৪

ও বন্ধু, দেখলে তোমায় বুকের মাঝে
জোয়ার ভাটা খেলে॥
আমি যে একলা ঘাটে কুলবধূ
কেন তুমি এলে (ও বন্ধু)॥

আমার অঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে
বাজাও যখন বাঁশি—
আমি খিড়কি দুয়ার দিয়ে বন্ধু
জল ভরিতে আসি,
ভেসে নয়ন-জলে ঘরে ফিরি
ঘাটে কলস ফেলে॥

আমার পাড়ার বন্ধু, তোমার নাম যদি লয় কেউ
বুকে আমার দুলে উঠে পদ্মানদীর ঢেউ (ও বন্ধু)।

ওগো ও চাঁদ, এনো না আর
দুকূল-ভাঙা এমন জোয়ার,
কত ছল করে জল লুকাই চোখে
কাঁচা কাঠে আগুন জ্বেলে॥

৮৫

কানে আজও বাজে আমার
তোমার গানের রেশ।
নয়নে মোর জাগে তোমার
নয়নের আবেশ॥

তোমার বাণী অনাহত
দুলে কানে ফুলের মতো
ও-গান যদি কুসুম হতো
সাজাতাম মোর কেশ॥
নদীর ধারে যেতে নারি শুনে জলের সুর
মনে আনে তোমারই গান করুণ বিধুর।

শুনি বুনো পাখির গীতি
জাগে তোমার গানের স্মৃতি,
পরান আমার যায় যে ভেসে
তোমার সুরের দেশ॥

৮৬

ননদী! হার মেনেছি তোর সনে।
তব নিলাজ ভাষা শুনে লজ্জা পেয়ে বনে লুকালো,
রাখিতে কি পারি ঘোমটা তার আননে॥
চারিপাশে সই কৌতুক-মাখানো
হের ঐ উঁকিঝুঁকি লুকিয়ে তাকানো,
থাকি তাই সই লুকিয়ে নিরালা কোণে।
কে জানে কোথা হতে এলো সই কেমনে
এত মধু এত লাজ আমারই নয়নে॥

মধুরা মুখরা ওলো! মিষ্টি মুখের তোর
সব মধু খেয়েছে কি ঠাকুর জামাই চোর?
প্রিয় সঙ্গী তুই সই এ নব ভবনে॥

৮৭

ও কালো শশী রে, বাজাও না আর বাঁশি রে।
বাঁশি শুনিতে আসিনি আমি
জল নিতে আসি রে॥

আঁচল দিয়ে মুছি বন্ধু কাজলেরই কালি,
যায় না মোছা তোমার কালি লাগলে বনমালী॥

তোমার বাঁশির সুরে ভেসে গেল কত
রাধার মুখের হাসি রে॥

কাল-নাগিনীর ফণায় নাচো
বুঝবে তুমি কিসে
কত কুল-বধূ মরে যে ঐ বাঁশরির বিষে (বন্ধু)
বাঁশরির বিষে।

ঘরে ফেরার পথ হারায়ে
ফিরি তোমার পায়ে পায়ে,
জলের কলসি জলে ডোবে
আমি আঁখি-জলে ভাসি রে॥

৮৮

রাজার দুলাল ! রাজপুত্র ! বন্ধু গো আমার।
ভাঙো ভাঙো পাষাণপুরীর সাত মহলার দ্বার॥
সাগর-ঘেরা সোনার পুরী
আমি বন্দিনী গো একলা ঝুরি,
তুমি চাঁদের মতো উদয় হয়ে ঘুমাও অন্ধকার॥

রক্ষী-ঘেরা রক্ষপুরী, মরি ভয়ে ভয়ে,
পঙখীরাজে এসো কুমার, যাও আমারে লয়ে।

সোনার কাঠি লয়ে হাতে
এসো বন্ধু নিশুত রাতে,
পথ চেয়ে আর রইতে নারি
বাসি হলো হার॥

৮৯

সাপের মণি বুকে করে কেঁদে নিশি যায়।
কাল-নাগিনী ননদিনি দেখতে পাছে পায়॥

সই প্রাণের গোপন কথা মম
পিঞ্জরের পাখির সম
পাখা ঝাপটিয়া কাঁদে, বাহির হতে চায়॥

পাড়ার বৌঝি জলের ঘাটে অনেক কথা কয়,
আমার কথা কইল বুঝি—মনে জাগে ভয়।

আমি চাইতে নারি চোখে চোখে
পাছে মনের কথা জানে লোকে।
আমার একি হলো দায়!
সই, লুকানো না যায়;
কাঙাল যেমন পেয়ে রতন কুটিরে ঠাঁই না পায়॥

৯০

কত নিদ্রা যাও রে কন্যা, জাগো একটুখানি।
যাবার বেলা শুনিয়া যাই তোমার মুখের বাণী॥

নিশীথিনীর ঘুম ভেঙে যায়
চন্দ্র যখন হেসে তাকায়,
চাতকিনি ঘুমায় কি গো দেখলে মেঘের পানি॥
ফুলের কুঁড়ি চোখ মেলে চায়
তাই না ভ্রমর বোলে, রে কন্যা!
তাই না ভ্রমর বোলে;
বসন্ত আসিলে কন্যা, বনের লতা দোলে।

যারা বাঁধা আছে প্রাণে প্রাণে
জাগে তারা, ঘুম না জানে,
আমি যখন রব না গো, জাগবে তুমি জানি
তখন জাগবে তুমি জানি॥

৯১

ঝুমুর

ওগো ননদিনি, বল
কপট নিপট কালা নিঠুর খল।

তার নাই ভয় নাই লজ্জা শরম
লইয়া যুবতীর ধরম (গো)
খেলে সে নিঠুর খেলা চতুর চপল॥

না শুনে লো তোদের গালি
মাখলাম কুলে কালার কালি (গো),
সে মুখে সরল বনমালী, অন্তরে গরল॥

তার শত জনে মন বাঁধা,
রাতে চন্দ্রা দিনে রাধা।
(তারে) কঠিন কথা শুনাইব, চললো গোঠে চল॥

কৃষ্ণ বলে অবিরত
দে লো গালি পারিস যত।
ননদী কয়, বুঝেছি, বউ,
(কৃষ্ণ) নাম শোনারই ছল।

ও বউ, কৃষ্ণ নাম তোর ভাল লাগে
তাই কৃষ্ণ নাম শোনারই ছল।
ও তোর নাম শোনারই ছল॥

৯২

চিকন কালো বেদের কুমার কোন পাহাড়ে যাও?
কোন বন-হরিণীর পরান নিতে বাঁশরি বাজাও?
তুমি শিষ দিয়ে গান গাও, তুমি কুটিল চোখে চাও॥

তীর-ধনুক নিয়ে সারাবেলা ও শিকারি, এ কী খেলা?
শাল গাছেরই ডাল ভাঙিয়া একটু বাতাস খাও॥

কাঁকর-ভরা কাঁটার পথে, নাই শিকারে গেলে আজ নাই শিকারে গেলে।
অশথ-তলে বাজাও বাঁশি হাতের ধনুক ফেলে
তোমার, হাতের ধনুক ফেলে॥

তোমার কালো চোখের কাজল নিয়ে ঝিল উঠেছে ঝিলমিলিয়ে।
ঐ কমল ঝিলের শাপলা নিয়ে বাঁশিখানি দাও, তোমার বাঁশিখানি দাও॥

৯৩

আয় ইরানি মেয়ে জংলা পথ বেয়ে আয় লো।
নদী যেমন চাঁদে
ঢেউ-এর মালায় বাঁধে
তেমনী চাঁদে বাঁধব চিরুনির মতো এলো খোঁপায় লো॥

দুপুর রাতে ঝি ঝি ঝিল্লি-নূপুর বাজে,
বেদের বাঁশি কাঁদে বৌ-এর বুকের মাঝে,

কাঁটা দিয়ে ওঠে গোলাপ লতার গায়ে
বুলবুলি কোথায় লো॥

বেদে গেছে বনে গো হরিণী শিকারে,
হরিণ-আঁখি তার প্রেয়সী তাঁবুতে কাঁদে মনের বিকারে।

আমাদের জলসায় সাকি শিরাজী নাই,
আসমানের তারা-ফুল নিঙড়ে অই মধু খাই,
বঁধু যখন আসবে
চেয়ে চেয়ে হাসবে,
কবরীর যুঁই ছুঁড়ে ফেলে দিব পায় লো॥

৯৪

পু॥ এলে তুমি কে, কে ওগো—
তরুণা অরুণা করুণা সজল চোখে।
স্ত্রী॥ আমি তব মনের বনের পথে
ঝিরি ঝিরি গিরি-নির্ঝরিণী
আমি যৌবন-উন্মনা হরিণী মানস-লোকে॥
পু॥ ভেসে-যাওয়া মেঘের সজল ছায়া
ক্ষণিক মায়া তুমি প্রিয়া,
স্বপনে আসি বাজায়ে বাঁশি
স্বপনে যাও মিশাইয়া।
স্ত্রী॥ বাহুর বাঁধনে দিই না ধরা,
আমি স্বপন-স্বয়ম্বরা

সঙ্গীতে জাগাই ইঙ্গিতে ফোটাই
তোমার প্রেমের জুঁই-কোরকে॥

উভয়ে॥ আধেক প্রকাশ আধেক গোপন
আধো জাগরণ আধেক স্বপন
খেলিব খেলা মোরা ছায়া-আলোকে॥

৯৫

স্ত্রী॥ কোন বিদেশের নাইয়া তুমি আইলা আমার গাঁও।
কূলবধূর সিনান-ঘাটে বাঁধলে তোমার নাও॥
পু॥ আমি তোরই লাইগ্যা কন্যা, বেড়াই ভেসে স্রোতে,
ওগো তোমার রূপের হাট দেখলাম যাইতে এই পথে।

স্ত্রী॥ বুঝি তাই বাঁশের বাঁশি
তাই দিয়ে কি হে বিদেশী
অমূল্য এই মনের মানিক কিনতে তুমি চাও॥

পু॥ তোমায় প্যাবো বলে আজো শূন্য আমার তরী
রে কন্যা, শূন্য আমার তরী,
স্ত্রী॥ অমন করে চাইও না গো, আমি ভয়ে মরি।

পু॥ ভয়ে মরার চেয়ে কন্যা ডুবে মরা ভালো,
আমার মন ডুবেছে দেখে তোমার নয়ন কাজল কালো
(রে বন্ধু) নয়ন কাজল কালো।

উভয়॥ নূতন প্রেমের যাত্রী দুজন, ছোট মোদের নাও,
ওরে গহীন জলের আকূল জোয়ার অকূলে ভাসাও
মোদের অকূলে ভাসাও॥

৯৬

স্ত্রী॥ ফুলবীথি এলে অতিথি—
চম্পা মঞ্জরি কুঞ্জে পড়ে ঝরি চঞ্চল তব পায়।

পু ॥ কুড়ায়ে সেই ঝরা ফুল, চাঁপার মুকুল
গেঁথেছি মোহন মালিকা
পরাব বলিয়া তোমার গলায় ॥

স্ত্রী ॥ হে রূপকুমার, সুন্দর প্রিয়তম,
এলে যে ফিরিয়া দাসীরে স্মরিয়া
জীবন সফল মম।

পু ॥ পরো কুন্তলে, ধরো অঞ্চলে
অমলিন প্রেম-পারিজাত।
স্ত্রী ॥ কি হবে লয়ে সে ফুলমালা যাহা নিশি-ভোরে শুকায় ॥

পু ॥ মোছ মোছ আঁখি-ধার, লহ বাহুর হার,
ভোলো অতীত ব্যথায়।
উভয়ে ॥ বিরহ-অবসানে মিলন মধুর প্রিয়,
এ মিলন-নিশি যেন আর না পোহায় ॥

৯৭

পু ॥ সোনার বরণ কন্যা গো, এসো আমার সোনার নায়ে
চলো আমার বাড়ি।
স্ত্রী ॥ ওরে অচিন দেশের বন্ধু রে, তুমি ভিন গেরামের নাইয়া,
আমি ভিন গেরামের নারী ॥

পু ॥ গয়না দিব পৈঁচি খাড়ু, শাড়ি ময়নামতীর ;—
স্ত্রী ॥ গয়না দিয়ে মন পাওয়া যায় না কুলবতীর।
পু ॥ শাপলা ফুলের মালা দিব, রাঙা রেশমি চুড়ি।
স্ত্রী ॥ ঐ মন-ভুলানো জিনিস নিয়ে
(বন্ধু) মন কি দিতে পারি।

পু ॥ তুমি কোন সে রতন চাও, রে কন্যা, আমি কি তা জানি,
স্ত্রী ॥ তোমার মনের রাজ্যে আমি হতে চাই রাজরানী।

দ্বৈত ॥ হইও সাক্ষী তরুলতা পদ্মা নদীর পানি (আরে ও)
(আজি) কূল ছাড়িয়া দুটি প্রাণী অকূলে দিল পাড়ি ॥

৯৮

দ্বৈত॥ ঝুমুর নাচে ডুমুর গাছ ঘুঙুর বেঁধে গায় লো, ঘুঙুর বেঁধে গায়।
নাচব দুজন, মাদল বাঁশি নূপুর নিয়ে আয় লো, নূপুর নিয়ে আয়॥

স্ত্রী॥ আর-জনমে চোর-কাঁটা তুই ছিলি (রে), চোর-কাঁটা তুই ছিলি।
এ জনমে আঁচল ছিঁড়ে হৃদয়ে বিঁধিলি।

পু॥ চোর-কাঁটা নয় ছিলাম পানের খিলি লো,
গয়না ছিলাম গায় লো গয়না ছিলাম গায়॥

স্ত্রী॥ ঝিলমিলিয়ে ঝিলের জল নাচায় শালুক ফুল,
পু॥ শালুক যেন মুখখানি তোর লো,
ঝিলের ঢেউ যেন এলো চুল।

স্ত্রী॥ কুহু কুহু ডেকে কোকিল কাহার কথা কহে,
পু॥ সেই কথা কয় কোয়েলা,
আর জনমে কয়েছি যা তোরই বিরহে।
দ্বৈত॥ যে জনমের দুটি হৃদয়, এ জনমে হায়
এক হতে যে চায় লো, এক হতে যে চায়॥

৯৯

স্ত্রী॥ তুমি কি নিশীথ চাঁদ
ভাঙাতে ঘুম চুপি চুপি আসিলে বাতায়নে।

পু॥ তুমি কি গো বনদেবী পুষ্প-শোভিতা
চেয়ে আছ কোন দূর আনমনে॥

স্ত্রী॥ তোমারে হেরিয়া ফোটে মালতী হেনা,
হে চির-চেনা (প্রিয়),
পু॥ (সুদূর) বনান্তে সমীরণ হেরি তোমায় হলো অধীর,
পাপিয়া ডাকে বকুল বনে॥

স্ত্রী॥ তব কলঙ্ক অধিক মধুর লাগে, হে কলঙ্কী চাঁদ!
তোমারে হেরিয়া যত সাধ জাগে প্রাণে
জাগে ততো অবসাদ।

পু ৷৷ তোমার ছায়া পড়ে মোর আননে
কলঙ্কী নাম হলো মোর এই ভুবনে ৷৷

উভয়ে ৷৷ আকাশের চাঁদে কুমুদ ফুলে
মিলন হলো ধরায় ভুলে
অশ্রু–সায়রে সঙ্গোপনে ৷৷

১০০

স্ত্রী ৷৷ তোমায় দেখি নিতুই চেয়ে চেয়ে
ওগো অচেনা বিদেশী নেয়ে ৷৷

পু ৷৷ যেতে যেতে এই পথে তরী বেয়ে
দেখি নদীর ধারে তোমায় বারে বারে
সজল কাজল–বরণী মেয়ে ৷৷

স্ত্রী ৷৷ তোমার তরণীর আসার আশায়
বসে থাকি কূলে, কলস ভেসে যায়।
পু ৷৷ তুমি পরো যে শাড়ি
ভিন গাঁয়ের নারী
আমি নাও বেয়ে-যাই তারি সারি গান গেয়ে ৷৷

স্ত্রী ৷৷ গাগরির গলায় মালা জড়ায়ে
দিই তোমার তরে বঁধু স্রোতে ভাসায়ে।

পু ৷৷ সেই মালা চাহি নিতি এই পথে গো আমি তরী বাহি।
উভয়ে ৷৷ মোরা এক তরীতে এক নদীর স্রোতে
যাব অকূলে ধেয়ে ৷৷

১০১

গোঁফ–দাড়ি সংবাদ

শুক বলে, 'মোর গোঁফের রূপে ভোলে গোপনারী।'
সারী বলে, 'গোঁফের বড়াই আছে বলে দাড়ি।
আমার গোঁফ–ঝিয়ারি ৷৷'

শুক বলে, 'মোর বাঁকা গোঁফ দেখে ভুবন ভোলে।'
সারী বলে, 'ঝুলন-রসের দোলনা যে দোলে
আমার দাড়ির কোলে॥'
শুক বলে, 'গোঁফ ওষ্ঠে থাকেন, গোষ্ঠে যেন কালা।'
সারী বলে, 'আমার দাড়ি কুলের কুলবালা
চলে হেলে দুলে॥'
শুক বলে, 'বীর শিকারিরা এই গোঁফে দেয় চাড়া।'
সারী বলে, 'মুনি ঋষির দেখলে দাড়ি নাড়া
কি বা বাহার খোলে॥'
শুক বলে, 'মোর ত্রিভঙ্গিক ঠোঁট-বিহারী গোঁফ।'
সারী বলে, 'তমাল-কানন আমার দাড়ির ঝোপ
দখিন হাওয়ায় দোলে।'
শুক বলে, 'গোঁফ খুরির দধি চুরি করে খায়।'
সারী বলে, 'দাড়ি মেদির রঙ মেখেছে গায়
যেন হোরির আবীর।
তাই দাড়ি বড়, গোঁফের গরব মিছে।'
শুক বলে, 'দাড়ি যতই বাড়ুক, তবু গোঁফের নীচে,
সারী কি যে বলো।'

হিজ মাস্টার্স ভয়েস, এন ৭৩১৮
ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪

১০২
খোকার মাসি

আমার খোকার মাসি শ্রী অমুক বালা দাসী
মোরে দেখেই সর্বনাশী ফেলে ফিক করে সে হাসি॥
তার চোখ প্রায় পুঁটি মৎস্যই,
তার চেহারাও নয়, জুৎসই,
তার আছে তিনটি বৎসই
কিন্তু স্বাস্থ্যে খোদার খাসি॥
সে খায় বটে পান-জর্দা
তার, চেহারাও মন্দা মন্দা।
তবু, বুঝলে কিনা বড়দা
আমি তারেই ভালোবাসি॥

শালী, অর্থাৎ কি না, বৌ সে পনর আনাই,
তারে দিয়া একটা আনি দাদা ঘরে যদি আনি
সে বৌ হয় ষোল আনাই,
কি বলো দাদা?
আমি তারই লাগি জেলে
মরবো ঘানি ঠেলে,
তারে নিয়ে ভাগবো রেলে
না হয় পরবো গলায় ফাঁসি॥

১০৩

বালা উমরী

হাঁ—বালা উমরী—
কুমরী পোকা গাহে ঠুমরী।
ধাঁই ধাপড় ধাঁই ধাপড়—
সেতার বাজায় তুলো-ধুনরী॥

মন্দিরা বাজায় ছুঁচো নেংটি ইঁদুর,
কোলা ব্যাং সোনা ব্যাং ছাড়ে
তানপুরার সুর;
সুখ-উৎসুক মিঞা আরশুল্লার
বুক ওঠে গুমরি॥

হুলোর মেম মিস মেঁও-র সাথে
সারমেয় ভুলো এসে সেই জলসাতে
গাহে গমক-মীড়ে খাম্বাজ-হাম্বীরে—
কঁকিয়ে ওঠে ভয়ে কুঁকড়ো-কুঁকড়ী॥

১০৪

শ্বশুরের মেয়ে

নাকে নথ দুলাইয়া চলে, কাঁখে কলস পোলা কোলে
যেন হুক্কা বাঁদা খোলে, এরা মোর হউরের মাইয়া॥

সে ছল কইর‍্যা কাশে
আর ফিক ফিক কইরা হাসে
তার ড্যাবরা চোখের পাশে ঝুল-কালি মাখাইয়া॥

তার গাল যেন জাম্বুরা, তার নারকেল-কুরা,
তার দাঁত কদুর বীচি রে ভাই, নয়ান লাট্টু ঘুরা,
আমি কিনছি চিকনাই দেইখ্যা
ঐ না তৈল হলুদ মাইখ্যা
সে আইসে আইক্যা বাইক্যা (হহ হেইত)
আসে ছাঁচি পান চাবাইয়া॥

মোরে কয় সে, 'বিটলে বাইট্যা',
করে কাইজ্যা কোমর সাইট্যা,
সে দেয় মোরে মুখ ভেম্‌কি,
দেয় গায়ে ফেইল্যা পেচকি,
তার চলার পথে রাখনু কি মুই—
গামছা মোর বিছাইয়া॥

১০৫
কৃষ্ণকলির ছাই

তুই পোড়ার মুখে অমন করে
হাসিসনে আর রাই লো।
ছি ছি, রঙ্গ করিস অঙ্গে মেখে কৃষ্ণকলির ছাই লো॥
বাঁশি হাতে গাছে চড়া
কয়লা-বরণ গয়লা ছোঁড়া (সে লো)
সেই নটের গুরু নষ্টের গোড়া তোর প্রেমের গোঁসাই লো॥
ঐ গো রাধা রাখালের সনে
তোর নিন্দা শুনি বৃন্দাবনে (রাই লো)
ছি ছি, কেষ্ট ছাড়া ইষ্ট কি আর ত্রিভুবনে নাই লো॥
ঐ অমাবস্যার কৃষ্ণ-চাঁদে
বাসলি ভালো কোন সুবাদে (তুই লো)
তুই দিন-কানা হয়েছিস রাধে ভাবিয়া কানাই লো॥

১০৬
পূজার ঠ্যালা

ওরে বাবা ! এর নাম নাকি পূজা ! (রে ভাই)
(এই) পূজার ঠ্যালা সইতে সোজা মানুষ হয় যে কুঁজা।

ষষ্ঠীর কৃপায় দশটি মেয়ে রাবণের গুষ্টি সঙ্গে
আঁচিলের মতন এঁটুলির মতন নেপটে আছেন অঙ্গে
এরা ছাড়ে না,—তবু আঁচিল ছাড়ে
খেলে হোমিওপ্যাথিক থুজা।।

বেনারসি, ঢাকাই, রেশমি তসর, এণ্ডি মটকা,
বইতে বইতে গা দিয়ে দাদা ঘাম ছুটে যায় বোঁটকা
(এই) চাওয়ার ভয়ে শিব ন্যাংটা, কথা কন না দশভুজা।।

গিন্নি কন্যে হন্যে হয়ে সদাই সওদা করে,
(ওরা ভাবে) ব্যাঙ্কের টাকা যেন ট্যাঙ্কের জলের মতন
ঝরঝর করে ঝরে,
তাদের এক গোঁ থিয়েটার, সিনেমা, এসেন্স পাউডার খোঁজা।।

এ সব যদি জুটল, তবে যেতে হবে চেঞ্জে,
শালা শালী সবাই এক-জোটে বলে এবার 'সস্তায় ট্রেন যে,' ও বোনাই
(না গেলে) দেখব সদাই গিন্নীর কুতুরে চক্ষু কেৎরে-বুঁজা।
সবাই যেন শ্রী দুর্গার গুষ্টি, আমি যেন বাহন সিঙ্গি,
আসছে বছর পূজায় মাগো হবো আমি ফিরিঙ্গি।
জয় বাবা যীশুখ্রীস্টের জয়
(এই পূজার সময়) পিতা হওয়ার চেয়ে হাড়ি কাঠের পাঁঠা হওয়া সোজা।

•

১০৭
নাত-জামাই

ঠানদি।। ভাই নাত-জামাই !
ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি
তুমি বৌ-এর তীর্থে ন্যাড়া হও
মোর নাতনীর ভ্যাড়া হও,

বাইরে গোঁফে চাড়া দেবে
ঘরে বৌ-এর ঘোড়া হও।

ফোঁস ফোঁসাবে বাইরে শুধু,
বৌ-এর কাছে ঢোঁড়া হও।
বাইরে পুরুষ অটল পাষাণ
ঘরে বৌ-এর ঘোড়া হও।

দিনের বেলায় ফরফরাবে
রাত্রিবেলা খোঁড়া হও।
সূয্যি চাঁদের আয়ু পেয়ে
চিরটা কাল ছোঁড়া রও।
নাতনীর আমার ভ্যাড়া হও,
ম্যাড়া হও।
কার আজ্ঞে, না, কামরূপ
কামাখ্যা দেবীর আজ্ঞে॥

১০৮

ভ্যাবাকান্ত

হে ভ্যাবাকান্ত ! দাও হে গানে ক্ষান্ত,
তব তান শুনে তানসেন লুঙি ফেলে ভেগে যায়,
পড়শীরা বেঁকে যায় রাগে বড়শীর প্রায়।
ধরিয়া সুরের কাছা করিছ গামছা কাচা
বেচারি গানের যেন করিছ বাপান্ত॥

তোমার পাড়ায় কেন লইলাম বাড়ি-ভাড়া
সা-রে-গা-মা সাধা শুনে প্রাণ হলো খাঁচাছাড়া।
হয় মনে সন্দেহ ধরিয়া টানিছে কেহ
যেন জীব বিশেষের লাঙ্গুল-প্রান্ত॥

সুরের অসুর তুমি গানের আফগান
সরস্বতীরে ধরে পরাইছ চাপকান,
দেখে বীণা ফেলে দেয় নারদ পিঠটান
বাহনের গান শুনে শিব উদভ্রান্ত॥

১০৯
কলির রাধা

কলির রাই-কিশোরী কলিকাত্যাইয়া গোরী
'বেবী অস্টিনে' চড়ি চলিছে সাঁঝে !

ঢাকুরিয়া লেকে পিয়াকে সাথ চলকে,
হাঁটে সে এঁকেবেঁকে আধুনিক ধাঁজে॥
প্যাকাটির মতো ক্ষীণা ওড়ে বসন ফিনফিনা
গোকুলচন্দ্র বিনা গুন গুন গুন ভাঁজে॥

মুখে তার মাখা খড়ি চোখে চশমা খড়খড়ি
হাতে তার কবজি-ঘড়ি টিক টিক টিক বাজে॥

পালায় এদের দেখে পুরুষ ছাতা ঢেকে
বলে ও-বাবা এ কে ! মডার্ন বামা যে !
ভীমা বামা যে॥

১১০
স্প্রাং রিদম্

লাম্ পম্ লাম্ পম্ লাম্ পম্
লাম্ পম্ পম্ পম্ পম্ পম্ পম্॥

দুর্বল ডান্সের লম্ফং ফং ঝম্পং ভুড়ি কম্পং
মারে ডম্ফাই দিল্লী বোম্বাই হনুলুলু হংকং॥

বাঁশের কঞ্চি এগার ইঞ্চি নাচে মেমের বোনঝি
হাঁদা খ্যাঁদার পরান ছ্যাঁদা, ভিজল ঘামে গেঞ্জি
কেৎরে চক্ষু দেখে মটকু চামারু ছক্কু
চোমরায় দাড়ি গুম্ফং॥
ল্যাংড়া লেংড়ি হেলায় টেংরি
উস খুস করে চ্যাংরা চেংড়ি
যেন ট্যাংরার হাটে গলদা চিংড়ি
ঝুড়িতে খেলে পিং-পং॥

১১১
কুব্জার রূপ

মরি হায় হায় হায় !
কুব্জার কি রূপের বাহার দেখো !

তারে চিৎ করলে হয় যে ডোঙা
উপুড় করলে হয় সাঁকো !
হরি ঘোষের চার নম্বর খুঁটে
হরি হায় হায় হায় !

১১২
ডোয়ারকিন

কি চান? ভাল হারমোনি?
কাজ কি গিয়ে—জার্মানি?
আসুন দেখুন এইখানে
যেই সুরে আর যেই গানে
গান না কেন, দিব্যি তাই
মিলবে আসুন এই হেথাই?
কিনবি কিন
'ডোয়ার-কিন !'

['ডোয়ারকিন এন্ড সন্স' কোম্পানির বিজ্ঞাপন]

১১৩
বাহাদুর

মিষ্টি 'বাহা বাহা' সুর
চান তো কিনুন 'বাহাদুর' !
দু'দিন পরে বলবে না কেউ 'দূর দূর !'
যতই বাজান ততই মধুর মধুর সুর !
করতে চান কি, মনের প্রাণের আহা দূর?
একটি বার ভাই দেখুন তবে 'বাহাদুর' !

যেমন মোহন দেখতে, তেমনি শিরিন ভরাট
বাহা সুর।
চিনুন কিনুন 'বাহাদুর'।

['বাহাদুর' কোম্পানির বিজ্ঞাপন]

১১৪

বিবাহ-মঙ্গল

ও—হো—
আজকে হইব মোর বিয়া
কালকে আইব বৌ নিয়া (রে)
রইবা তোমরা ত্যাহাইয়া
(নি) বুঝল্যা গোপাল্যা মুকুন্দ্যা।।

তাইরে নাইরে নাইরে না
রইমু ঘরে বাইরে না
বিহান সইনধ্যা মাদান্যা
চইল্যা যাইব কোহান দ্যা।।

ও—হো—
উঠমু কি গাছৎ গিয়া
উৎকা মাইর‍্যা ফাল দিয়া,
ভাই রে, হালায় পরানডা
নাইচা উঠছে এ্যাহন থ্যা।।

হউর হাউরী পাইমু কাল
সুমুন্দী আর শালীর পাল
কইব মোরে 'জামাই গো
আর দুডা দিন থাকুন গ্যা'।।

খাইমু কি কি, অরে শুনই—
মাংস লুচি পাতক্ষীর দই;
হাসবে তোমরা অভাগ্যা
চাটবো চুকা কাসুন্দ্যা।।

ফুচকি দিয়া তোমরা চোর
দেখবার চাইবা বউরে মোর,
রাখমু তারে ছাপাইয়া
বস্তা হোগলা চাপন দ্যা।।

তাইরে নাইরে নাইরে নাই
বউরে ছাইর‍্যা বাইরে ভাই
থাকতে পরান আসুম না
(ঘরে) পইচা হইব ফালুন্দ্যা ॥

১১৫
বিবাহ-চাষ

বাপ রে বাপ কি পোলার পাল
পিলপিল কইর‍্যা আসে
সব কিলবিল কইর‍্যা আসে।
কি ফলই পৈল্যাছে বাবা এই বিবাহ-রূপ চাষে ॥

পোলার পাল না ছাতাইর‍্যা পাখি
খ্যাট খ্যাটাইয়া উঠছে ডাকি
'অমুক দাও আর তমুক দাও'
'চয়ে খাইমু আর উয়ো লাও'
মাংস যেন ছিইর‍্যা খাইব গিলতে চায় গোগ্রাসে ॥

কেউ বা আইস্যা ধরে কোঁচা, কেউ বা টানে কাছা,
কাউয়ার দল যেমন কইর‍্যা খ্যাদায় দেখলে প্যাঁচা,
নেউরি গেঁড়রি যেন তৈলের ভাঁড়,
লবণের ভাঁড় জ্বালায় হাড়।
ব্যাঙের ছাও ব্যাঙাচি যেন বাইরায় আষাঢ় মাসে
আমি জাইন্যা শুইনা চইড়্যাছি বাপ
আপন শূলের বাঁশে ॥

ইসলামী সংগীত

১১৬

তোমাতে যে করে প্রাণ নিবেদন
ভয় নাহি আর তার।
শত সে বিপদে আপদে তাহারে
হাত ধরে করো পার ॥

দুঃখ ও শোকে ভাবনায় ভয়ে
তব নাম রাজে সান্ত্বনা হয়ে
সে পার হয়ে যায় তব নাম লয়ে
দুস্তর পারাবার॥

ঝড়–ঝঞ্ঝায় তার প্রাণ–শিখা
শান্ত অচঞ্চল
ঝলমল করে রূপে রসে তার
জীবনের শতদল।

যেমন পরম নির্ভরতায়
শিশু তার মার বক্ষে ঘুমায়
তোমারে যে পায় সেজন তেমনি
ডরে না ত্রিসংসার॥

১১৭

মোরে নই লগন।
লাগে রে তুম সে মোহাম্মদ নবী প্যারে
সুখরন করত রাহত
নিশিদিন ঘড়ি পল পল ছিনা।
নই লগন লাগেরে॥

হুঁ তেহ্‌রি বাট তকত হুঁ
আঁধার দেত নইয়্যা
সদারঙ্গীলে তর সায়ে
নই লগন লাগে রে॥

১১৮

য়্যা এলাহি য়্যা এলাহি
তোমার রাহের করো মোরে রাহি॥

ফরজ ওয়াজেব আমি জানি না হে স্বামী
তোমার নামে মশগুল দিবা যামী

চাহি না শাফায়ৎ বেহেশত দৌলত
হে প্রভু শুধু তোমারে চাহি॥

পতঙ্গ যেমন ধায় দীপ পানে
তোমার জ্যোতি মোরে তেমনি টানে
তোমার বিরহে নিশিদিন কাঁদি
পরানে আমার শান্তি যে নাহি॥

আমারে রাখ তব প্রেমে ছেয়ে
বিশ্ব ভুলি যেন তোমারে পেয়ে,
নদী যেমন যায় সাগরে ধেয়ে
তেমনি ছুটি যেন তব নাম গাহি॥

এফ.টি. ৪৩৬৯, টুইন আব্দুল লতিফ

১১৯

ভালোবাসা পায় না যে জন
রসুল তারে ভালোবাসে
উম্মতেরে ছেড়ে কভু
বেহেশতে যায় না সে॥

যে জন বেড়ায় পিয়াস লয়ে
দ্বারে দ্বারে নিরাশ হয়ে
সবুরেরি মেওয়া নিয়ে
নবীজি তার সামনে আসে॥

যে খেটে খায় হালাল রুজি
তারি দুনিয়াদারি
মোর নবীজি কমলিওয়ালা
সহায় যে হন তারি।

সংসারে যে নয় উদাসীন
খোদার কাজে যে রহে লীন,
রসুল তারে বক্ষে বাঁধে
রহমতেরি বাহুর পাশে॥

১২০

যাহাদের তরে এই সংসারে
খাটিনু জনম ভোর।
তাহাদের কেহ হবে না হে নাথ
মরণের সাথি মোর॥

শত পাপ শত অধর্ম করে
বিভব রতন আনিলাম ঘরে,
সে সকল ভাগ বাটোয়ারা করে
খাবে পাঁচ ভূত চোর॥

জীবনে তোমার লই নাই নাম
তোমাতে হয় নাই মতি
মরণ–বেলায় তাই কাঁদি প্রভু
কি হবে মোর গতি।

চেয়ে দেখি আজ যাবার বেলায়
কর্ম কেবল মোর সাথে যায়
তরিবার আর না দেখি উপায়
বিনা পদতরী তোর॥

এফ.টি. ৪৩৬৯, টুইন আব্দুল লতিফ

১২১

হে মোহাম্মদ এসো এসো আমার প্রাণে আমার মনে।
এসো সুখে এসো দুখে আমার বুকে মোর নয়নে॥

আমার দিনের সকল কাজে
যেন আমার স্মৃতি রাজে
এসো আমার ঘুমের মাঝে
এসো আমার জাগরণে॥

কোরান দিলে, দিলে ঈমান, বেহেশতের দিশা দিলে
পাপে তাপে মগ্ন আমায় খোদার রাহে ডেকে নিলে।

তোমায় আমি ভুলব কিসে
আছ আমার রুহে মিশে
আমি তোমার প্রেমের পাগল
রেখো আমায় ঐ চরণে ॥

এফ.টি. ৪৩৬৯, টুইন আব্দুল লতিফ

১২২

অন্তর্যামী! ভক্তের তব শোনো শোনো নিবেদন
যেন থাকে নিশিদিন তোমার সেবায়
মোর তনু প্রাণ মন ॥

নয়নে কেবল দেখি যেন আমি
তোমারি স্বরূপ ত্রিভুবন স্বামী
বহি যেন শিরে তোমার পূজার
সম্ভার অনুখন ॥

এ রসনা শুধু জপে তব নাম
এই বর দাও নাথ
তোমারি চরণ সেবায় লাগুক
মোর এ দুটি হাত ॥

জপি তব নাম প্রতি নিঃশ্বাসে
শ্রবণে কেবল তব নাম ভাসে
তব মন্দির-পথে যেন সদা
ধায় প্রভু এ চরণ ॥

১২৩

কুকুভ-একতালা

অরুণ কিরণ সুধা-স্রোতে
ভাসাও প্রভু মোরে।
গ্লানি পাপ তাপ মলিনতা
যাক ধুয়ে চিরতরে ॥

প্রশান্ত স্নিগ্ধ তব হাসি
ঝরুক অশান্তি প্রাণে বুকে[১]
প্রভাত আলোর ধারা
যেমন ঝরে সব ঘরে॥
যেমন বিহগেরা জাগি ভোরে
আলোর নেশার ঘোরে
আকাশ পানে.......
বন্দে প্রেম-মনোহরে॥[২]

১২৪

ভজন

আজ নাই কিছু মোর
মান অপমান বলে।
সকলি দিয়াছি মোর ঠাকুরের
রাঙা চরণের তলে॥

মোর দেহ প্রাণ, জাতি কুল মান
লজ্জা, অহংকার, অভিমান,
দিছি চিরতরে জলাঞ্জলি গো
কালো যমুনার জলে॥

মোরে যদি কেউ ভালোবাসে আজ, জল আসে আঁখি ভরে
মোর ছল করে ভালোবাসে সে যে মোর শ্যামসুন্দরে।

মোরে না বুঝিয়া কেহ করিলে আঘাত
কেঁদে বলি, ওরে ক্ষমা করো নাথ
বৃন্দাবনে যে প্রেম গাঢ় হয়
আঘাত নিন্দা-ছলে॥

১২৫

আমার যারা আশ্রিত নাথ তারা তোমার দান
হে নাথ যেন সেই অতিথির হয় না অসম্মান॥

---

১. পাণ্ডুলিপিতে পরিবর্ত লাইন হিসেবে 'সবারে আজ যেন ভালোবাসি' লেখা আছে।

২. পাণ্ডুলিপিতে গানটির সঙ্গে কবি-কৃত স্বরলিপি আছে।

ওরা দেহে মনে সুন্দর হোক
পেয়ে তোমার পুণ্য আলোক,
কর্মে ওদের মহান করো ধর্মে বলবান॥

তোমার দেওয়া ভার বহিবার শক্তি মোরে দাও
আমার স্বাস্থ্য আয়ু নিয়ে আশ্রিতে বাঁচাও।

(যাদের) পাঠিয়ে দিলে আমার ঘরে
আমায় পরখ করার তরে
যেন দিতে পারি অকাতরে তাদের তরে প্রাণ॥

আমায় যারা ঘিরে আছে আমার মুখে চেয়ে
তারা আমার নহে হে নাথ, তোমার ছেলে মেয়ে
তারা তোমার ছেলে মেয়ে॥

ওদের তুমি রেখো সুখে
ধরে তোমার আপন বুকে
বাঁচুক ওরা তোমার আশীর্বাদের প্রসাদ পেয়ে॥

আমায় দিও দুর্ভাবনার বোঝা যত আছে
(নাথ) থাকুক পরম নির্ভরতায় ওরা আমার কাছে।

শুধু তোমার ভরসাতে নাথ
আমি ওদের ধরেছি হাত
তোমার স্নেহ মায়ের মতো থাকুক ওদের ছেয়ে॥

১২৬

আমার হাতে কালি মুখে কালি।
আমার কালি-মাখা মুখ দেখে মা
পাড়ার লোকে হাসে খালি॥

মোর লেখাপড়া হলো না মা
আমি 'ম' দেখতেই দেখি শ্যামা
'ক' দেখলেই কালি বলে
নাচি, দিয়ে করতালি॥

কালো আঁক দেখে মা ধারাপাতে
ধারা নামে আঁখি-পাতে,
আমার বর্ণ পরিচয় হলো না
তোর বর্ণ বিনা কালি॥

যা লিখিস মা বনের পাতায়,
সাগর-জলে, আকাশ-খাতায়
সে লেখা তো পড়তে পারি
লোকে মূর্খ বলে দিক না গালি॥

১২৭

আমার সারা জনম কেঁদে গেল,
(কবে) শেষ হবে মোর কাঁদা।
পথে পথে ঘুরে মরি, পদে পদে বাধা॥

বাঁচতে চাইরে যে ডাল ধরে
সে ডাল অমনি ভেঙে পড়ে,
সুখের আশায় ছুটে ছুটে
দুঃখ হলো সাধা।
(কবে) শেষ হবে মোর কাঁদা॥

দুঃখী জনের বন্ধু কোথায় দীনের সহায় কোথা
(নাই) অসহায়ের তরে বুঝি বিধাতারও ব্যথা !
আকুল হয়ে কাঁদি যত
বেড়ে ওঠে বোঝা তত,
আদায় করে ফিরি যেন
আমি দুখের চাঁদা॥

১২৮

আমি কালি নামের ফুলের ডালি
এনেছি গো মাথায় করে।
দুখের সাগর পার হয়ে যায়
এ ফুল যে বুকে ধরে॥

(এই) প্রসাদি ফুল দিবস যামী
ফিরি করে ফিরি আমি
(এই) ফুল নিলে তার ভুলের আড়াল
চিরতরে যায় গো সরে॥

১২৯

আমি কালি যদি পেতাম কালি
রইত না এ মনের কালি।
মোর সাদা মনের পদ্মপাতায়
লিখতাম তোর শ্রীনাম খালি॥

(মা) কালি পেলে সকল কালো
এক নিমিষে হতো আলো,
(মা) কালো পাতার কোলে যেমন
ফুটে থাকে ফুলের ডালি॥

(তোর) কালো রূপের নীল যমুনা
বইত যদি মনের মাঝে।
(শ্যামা !) দেখতে পেত এই ত্রিভুবন,
কোথায় শ্যামের বেণু বাজে !

তোর কালো রূপের কৃষ্ণ আকাশ পেলে,
(আমি) ময়ূর হয়ে নাচতাম মা তারার পেখম মেলে।
দুঃখে কালো কপালে মোর
হাসত শিশু-চাঁদের ফালি॥

১৩০

আমি বেলপাতা জবা দেব না
মাগো দেবো শুধু আঁখিজল।
মাগো হাত দিয়ে যাহা দেওয়া যায়
পাই হাতে শুধু তার ফল॥

হাত দিয়ে ফল দিতে যাই
হাতে হাতে তার ফল পাই (মাগো)
পাই অর্থ বিভব যশ
পাই না অমৃত আনন্দ মাগো
পাই না হৃদয়ে রস।
তাই আঁখিতে রাখিব বলে মা
আনিয়াছি আঁখি ছলছল॥

এবার রাখিব চোখে চোখে তোরে
ছাড়িয়া দেব না আর
মাগো তুই চলে গেলে হয়ে যায় মোর
ত্রিলোক অন্ধকার।

এবার দেখিবে নিত্যহৃদয়
তোর রাঙা চরণের অরুণউদয়
তাই জবা ফেলে দিয়ে মেলিয়াছি তাই
হৃদয়ের শতদল॥

১৩১

আমি মৃতের দেশে এনেছি রে
মাতৃ নামের গঙ্গা ধারা।
আয় রে নেয়ে শুদ্ধ হবি
অনুতাপে মলিন যারা॥

আয় আশাহীন ভাগ্যহত
শক্তি–বিহীন পদানত
(আয় রে সবাই আয়)
এই অমৃতে আয়, উঠবি বেঁচে
জীবন্মৃত সর্বহারা॥

ওরে এই শক্তির গঙ্গা–স্রোতে
অনেক আগে এই সে দেশে
মৃত সাগর–বংশ বেঁচে উঠেছিল এক নিমেষে।

এই গঙ্গোত্রীর পরশ লেগে
নবীন ভারত উঠল জেগে,
এই পুণ্য স্রোত ভেঙেছিল
ভেদবিভেদের লক্ষ কারা॥

১৩২

এসো মা পরমা শক্তিমতী।
দাও শ্রী দাও কান্তি আনন্দ শান্তি
অন্তরে বাহিরে দিব্য জ্যোতি॥

দাও অপরাজেয় পৌরুষ শক্তি
দাও দুর্জয় শৌর্য পরা-ভক্তি
দাও সূর্য সম তেজ প্রদীপ্ত প্রাণ
ঝঞ্ঝার সম বাধাহীন গতি॥

এসো মা পরম অমৃতময়ী
নির্জিত জাতি হোক মৃত্যুজয়ী।
পরম জ্ঞান দাও পরম অভয়
রূপ-সুন্দর তনু, প্রাণ প্রেমময়
আকাশের মতো দাও মুক্ত জীবন
সকল কর্মে হও তুমি সারথি॥

হরফ H.M.V. P. ১১৭৫৫ কে. মল্লিক

১৩৩

ওগো প্রিয়তম তুমি চলে গেছ আজ আমার পাওয়ার বহু দূরে।
তবু মনের মাঝে বেণু বাজে সেই পুরানো সুরে সুরে॥
মনের মাঝে বেণু বাজে
প্রিয় বাজাতে যে বেণু বনের মাঝে
আজো তার রেশ মনে বাজে॥

তব কদম-মালার কেশর-গুলি
আজি ছেয়ে আছে ওগো পথের ধূলি,
ওগো আজিকে করুণ রোদন তুলি বয় যমুনা ভাটির সুরে॥
(আর উজান বয় না,)

ওগো আজিকে আঁধার তমাল বনে, বসে আছি উদাস মনে
তোমার দেশে চাঁদ উঠেছে আমার দেশে বাদল ঝুরে॥
সেথা চাঁদ উঠেছে।
ওগো সেথা শুক্লাতিথি চতুর্দশীর চাঁদ উঠেছে।
সখি তাদের দেশের আকাশে আজ—আমার দেশের চাঁদ উঠেছে।

ওগো মোর গগনে কৃষ্ণ তিথি আমার দেশে বাদল ঝুরে॥[১]

১৩৪

ভজন

আর কত দুখ দেবে, বলো মাধব বলো।
দুখ দিয়ে যদি সুখ পাও, তবে কেন আঁখি ছল ছল॥

আমি চাই তব শ্রীচরণ ঠাঁই,
তুমি কেন ঠেল বাহিরে সদাই;
আমি কি এতই ভার এ জগতে যে, পাষাণ-তুমিও টল॥

ক্ষুদ্র মানুষ ভোলে অপরাধ, তুমি নাকি ভগবান,
তোমার চেয়ে কি পাপ বেশি হলো (মোরে) দিলে না চরণে স্থান!

(হে) নারায়ণ! আমি নারায়ণী সেনা
(মোরে) কুরুকুলে দিতে প্রাণে কি বাজে না,
(যদি) চার হাতে মেরে সাধ নাহি মেটে
দুচরণ দিয়ে দল॥

১. বহুল পরিবর্তিত হয়ে গানটি পরে মুদ্রিত হয়েছে। ফজিলাতুন্নেসার বিবাহের সংবাদ পেয়ে কবি যে গানটি রচনা করেছিলেন তার সঙ্গে গানটির সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

১৩৫

কলঙ্কে মোর সকল দেহ হলো কৃষ্ণময়।
এতদিনে গেল আমার জাতি কুলের ভয়॥
হে কলঙ্কী বন্ধু, মোরে
এবার লহ সঙ্গী করে
আমি গাইব হে শ্যাম ভুবন ভরে
কলঙ্কেরই জয়।
(কৃষ্ণ) কলঙ্কেরই জয়॥

১৩৬

কলঙ্কে মোর সকল দেহ হলো কৃষ্ণময়
শ্যামের নামে হউক এবার আমার পরিচয়॥
কলঙ্কিণীর তিলক এঁকে কলঙ্ক চন্দন মেখে
(আমি) শোনাব গো ডেকে ডেকে (কৃষ্ণ) কলঙ্কেরই জয়॥

ভুবনে মোর ঠাঁই পেয়েছি ভবন হতে নেমে
(হয়ে) বৈরাগিনী আমার কৃষ্ণ প্রিয়তমের প্রেমে।
(যারে) কৃষ্ণ টানে বিপুল টানে সে কি কুলের বাধা মানে
(এই) বিশ্ব ব্রজে ভাগ্যবতী সেই শ্রীমতী হয়॥

১৩৭

কলহংসিকা বাহনা পদ্মিনী-পাণি
মণি মঞ্জীরা শোভনা, ছন্দিতা বাণী
বন্দে দামিনী-বর্ণা রাধা বৃন্দা-বন-চন্দে
মত্ত ময়ূর ছন্দে নাচে কৃষ্ণ প্রেমানন্দে॥

পল্লব-ঘন চক্ষে ঝরে অশ্রু-রস-ধারা
পুব হাওয়াতে বংশী ডাকে আয়রে পথ-হারা
রুমঝুম ঝুম মঞ্জীর বাজে কঙ্কণ মণি বন্ধে॥

রিম ঝিম রিম ঝিম ঝিম কেকা-বন ঘন বর্ষে
তৃষ্ণ-তৃপ্ত আত্মা নাচে নন্দালোক হর্ষে
ঝঞ্ঝার ঝাঁঝার তাল বাজে শূন্যে মেঘ মন্দ্রে॥

১৩৮
কীর্তন

কহিস লো সখি মাধবে মথুরায়
কেমনে রাধার কাঁদিয়া বরষ যায়॥

খর বৈশাখে কী দাহন থাকে বিরহিণী শুধু-জানে
ফটিক জলের গলা ধরে কাঁদি চাহিয়া গগন-পানে
সিত-চন্দন পদ্মপাতায়
দারুণ দাহন-জ্বালা না জুড়ায়
হরি-চন্দন বিনা সিত-চন্দনে জ্বালা না জুড়ায় গো
শ্রীমুখ পদ্ম বিনা পদ্মপাতায় জ্বালা না জুড়ায় গো॥

বরষায় অবিরল
ঝর ঝর ঝরে জল
জুড়াইল জগতের নারী
রাধার গলার মালা
হইল বিজলি-জ্বালা
তৃষ্ণা মিটিল না তারই।
প্রবাসে না যায় পতি
সব নারী ভাগ্যবতী
বন্ধুরে বাহু-ডোরে বাঁধে
ললাটে কাঁকন হানি
একা রাধা বিরহিণী
প্রদীপ নিভিয়ে ঘরে কাঁদে॥

জ্বালা জুড়ায় না জলে গো
(তার) আগুন শাঙনের জলে দ্বিগুণ জ্বলে গো।
তার বুকে অশনি হানি (কৃষ্ণ) মেঘ গেছে চলে গো॥
টলমল শতদলে ঝলমল শারদীয়ার হাসি
শুধু রাধা কমলিনী অনাদরে ঝরে হলো বাসি।
কাত্যায়ণী ব্রত করে এই পেল বর
পূজার মাসে তারই প্রিয় রইল হয়ে পর।
হরি ভালোবাসে পর গো
সে ঘরকে কাঁদায় পরকে হাসায় চিরকালই পর গো
সেই কালোর পরা প্রীতি ভালো জানে এ দ্বাপর গো॥[১]

---

১. কীর্তনটি বহুল পরিবর্তিত আকারে গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে।

১৩৯

(তুই) কালি সেজে ফিরলি ঘরে
কোটি ছেলের কাজল মেখে।
(তাদের) ভ্রান্ত চোখের মায়া মুছে
এলি মা তোর ছায়া এঁকে॥

(তুই) আলোর দীপালি জ্বালি
কেন তাদের ঘুম ভাঙালি
(দেখ) মাতৃহারা কেঁদে মরে
স্বপনে তার মাকে দেখে॥

(মা) জানতে তারা অনাথ ছেলে,
মা যে তাদের গেছে মরে
(কেন) চোখ মুছিয়ে বললি কেঁদে,
'এইত আছি বুকে ধরে।'

(আজ) আকাশ-ভরা চাঁদের আলো
লাগে না আর তাদের ভালো
এই আলোর পারে যে মা থাকে
কাঁদে তারে ডেকে ডেকে॥

১৪০

(আমার) কালি বাঞ্ছা-কল্পতরুর ছায়াতলে আয় রে।
(এই) তরুতলে যে যাহা চায় তখনি তা পায় রে॥

তুই চতুর্বর্গ ফল কুড়াবি
যোগেও পাবি, ভোগেও পাবি।
(এমন) কল্পতরু থাকতে কেন মরিস নিরাশায় রে॥

দস্যু ছেলের আবদারে সে
সাজে ডাকাত-কালির বেশে,
(কত) রামপ্রসাদের কন্যা হয়ে বেড়া বেঁধে যায় রে॥

ওরে পুত্র কন্যা বিভব রতন
চেয়ে নে যার ইচ্ছা যেমন,
আমার এ মন থাকে যেন বাঞ্ছাময়ীর পায় রে॥

সে আর কিছু না চায়
চেয়ে চেয়ে বাসনা তার শেষ হলো না হায়।
এবার খালি হাতে তালি দিয়ে আমি চাইব কালিকায় রে॥

১৪১

ভক্তিগীতি 'ভ্রামরী' রূপ

কে মা তুই কার নন্দিনী
ভ্রমর নিয়ে করিস খেলা।
তনুতে মা তোর সপ্তবর্ণ
ইন্দ্রধনুর রঙের মেলা॥

এ কি অপরূপ চিত্র-কান্তি
স্নিগ্ধ নয়নে একি প্রশান্তি
চিত্র-ভ্রমর মুঠো মুঠো নিয়ে
আকাশে ছড়াস সারাটি বেলা॥

ভূষিতা চিত্র-আভরণে তুই
তেজোমণ্ডল-বিমণ্ডিতা
কে তুই ত্রিলোক-হিতার্থিনী
ভ্রমরীরূপা আনন্দিতা।

কোন সে অসুর বধিবার আশে
ভ্রমর ছড়াস আকাশে বাতাসে,
সব উৎপাত বিনাশিনী-শিবে
দে মা আমারে চরণ-ভেলা॥

১৪২

কোন অজানা জনে দিব প্রাণ মোর।
নেবে আমার মালা সে কোন কিশোর॥

কাহার লাগি একেলা জাগি
কোথা সে আমার প্রেয়-অনুরাগী
কোন কাননে রয় সে বনমালী চোর॥

পরি বধূর সাজ ভুলিয়া কুল লাজ
বৃথা আছি বসে কোথা হৃদয়-রাজ
মম যৌবন-নিশি জেগে হলো ভোর ॥

১৪৩

দেশ-তেতালা

ঘন গগন ঘিরিল ঘন ঘোর।
শাওন-ধারা ঘন-শ্যাম-বরণ চরণ লাগি
ঝর ঝরে অঝোর ॥

কুহু কেকা গাছে চম্পা শাখে (গো)
বিরহী বেণু ডাকে প্রিয়তমাকে[১] (গো)
মেঘ মাঝে খুঁজে ফিরে সৌদামিনী
কোথা লুকালো প্রিয়-ঘন চিতচোর ॥

রহে না মন ঘরে অন্ধকারে
অভিসারে যেতে চায় বন-পারে
ঝুরে মৌন ব্যথায় কাননে কেতকী
কাঁদে চিত-চাতকী কোথা শ্যাম কিশোর ॥

---

১. কাহাকে।

১৪৪

চুম্বক পাথর হায় লোহারে দেয় গালি,
আমার গায়ে ঢলে পড়ে কুল দিলে কালি ॥

লোহা বলে, হায় পাষাণী
তুমিই লহ বুকে টানি
(কেন) সোনা রুপা ফেলে দিয়ে আমায় টানো খালি ॥

চুম্বক আর লোহায় চলে দ্বন্দ্ব সারা বেলা,
কেঁদে মরে, বুঝতে নারে (এ) কোন নিঠুরের খেলা।
হঠাৎ তাদের দৃষ্টি গেল খুলে
ঊর্ধ্ব পানে চান নয়ন তুলে,
(দেখে,) খেলেন তাদের নিয়ে রস-শেখর বনমালী ॥

১৪৫
শ্রী তুলসী-বন্দনা

জয় কৃষ্ণ-ভিখারিনি তুলসী
হরি-শির-বিহারিণী তুলসী।
জয় কল্পতরু সমা বিষ্ণুর মনোরমা
কলির কলুষ-বারিণী তুলসী॥

অভিষ্ট-দায়িনী তুমি বসুধায়
শ্রেষ্ঠ পুষ্প তুমি দেব-পূজায়
তপে ও জপে তুমি মন্ত্র-শক্তি রূপা
ভক্তি-প্রেম সঞ্চারিণী তুলসী॥

তীর্থসমূহ মাগো তোমার কাছে
আত্মশুদ্ধি তরে শরণ যাচে
সকল কর্ম হয় নিষ্ফল ত্রিলোকে
তোমার প্রসাদ বিনা তারিণী তুলসী॥

শুদ্ধ সত্তা রূপা তপস্যা মগ্না
বিরাজ দীনা বেশে মন্দির-লগ্না
হে হরি-বল্লভে, তব দীন পল্লবে
অনন্ত নারায়ণ-ধারিণী তুলসী॥

১৪৬
'মনসা'-বন্দনা

জয় শঙ্কর-শিষ্যা, কশ্যপ-দুহিতা মনসা।
জয় নাগেশ্বরী জয় অনন্ত নাগ-গণ পূজিতা মনসা॥

প্রখর তপস্বিনী নাগেন্দ্র-বন্দ্যে
সর্প-নৃত্যময়ী বিচিত্র ছন্দে
জ্যোতি সঞ্চারিণী পাতাল-রন্ধ্রে
ফণি-মণি-বিভূষণে ভূষিতা মনসা॥

সর্বলোকে রিপু-নাগ-ভয়-হারিণী
ব্রহ্ম তেজোময়ী প্রদীপ্তা যোগিনী

অনন্ত-অনুজা আস্তিক-জননী
জরুৎকারু-ঋষি-দয়িতা মনসা॥

হরি-হর-সেবিকা বিষহরি মাগো
এ দেহের পাপ-বিষ হর হর জাগো !
(সব) মন্ত্র-অধীশ্বরী ধুতুরা-বর্ণা
প্রসীদ যোগী মুনি-সেবিকা মনসা॥

১৪৭

জয় হর-পার্বতী জয় শিব শক্তি
পরম পুরুষ জয় পরা প্রকৃতি।
বিনাশ যুগে যুগে অজ্ঞান-তিমির
মায়ার বন্ধন
অন্তর বাহিরের দানব-ভীতি॥
ওম নমঃ শ্রীশিবায়
ওম নমঃ শ্রীশিবায় !

১৪৮
ভজন

তুমি আমার চোখের বালি, ওগো বনমালী।
আমার চোখে পড়ল কখন, তোমার রূপের কালি
ওগো বনমালী॥

চোখ চাইলে ও রূপ সইতে নারি
নয়ন মুদেও রইতে নারি
তোমার লীলা, প্রিয়জনে কাঁদাও খালি।
ওগো বনমালী॥

কাঁদিয়ে আমায় করলে কানা, কানাই, এ কি লীলা
এবার মরে আর জনমে যেন হই কুটিলা !

তোমার নয়ন-মণি রাইকে নিয়ে
রাখব ঘরে দুয়ার দিয়ে
চোখে চোখে সেদিন যেন হয় মিতালি।
ওগো বনমালী॥

সুর : সুবল দাশগুপ্ত। শিল্পী : কুঞ্জলাল সিনহা।

১৪৯

তুমি যুগে যুগে নাথ আসিলে
দুখ নাশিলে ভালোবাসিলে
হে কৃষ্ণ গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ হরি।
তুমি ধরাধামে আস শতনামে
রাম পরশুরাম শ্যাম কংস-অরি॥

ধরি পীড়িত মানবের বেদনার পথ
আসে বিপদ-তারণ তব দুর্জয় রথ[১]

১. অসমাপ্ত।

১৫০

তুমি সংহারে টানো যবে আমি হই শিব,
তুমি সৃষ্টিতে আনো যবে হই জড় জীব।
যবে স্থিতিতে রহ সাথে, হই নারায়ণ
দাস হয়ে সৃষ্টি তব করি গো পালন॥

আমি নিত্য চরাই তব সৃষ্টি-ধেনু
যবে ধেনু ভালো লাগে না গো বাজাই বেণু।
বলি, রাধা প্রেম ভিক্ষা দাও
ধেনু চরায়ে শ্রান্ত আমি — রাধাপ্রেম ভিক্ষা দাও
ছড়াও শ্রান্ত তনু — রাধা প্রেমানন্দ দাও!

এই বেনুকার সুর, প্রেম-ভিক্ষা অভিসারে আহ্বান,
যবে সংসার তারে ছাড়ে না, আনি দুর্যোগ অভিযান।

১৫১

তুমি সুন্দর যবে নর রূপ ধরো হও সুন্দরতর।
অধর-চাঁদ ধরা দাও যবে ধরাধামে লীলা করো॥
আমাদের সাথে যবে কাঁদো হাসো
প্রিয় হয়ে সখা হয়ে ভালোবাসো
বিভূতি তোমার লুকাইয়া আসো
রাখালিয়া সাজ পরো॥

শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম ফেলি যবে ধরো বাঁশি
তখনি তোমার প্রেমে উন্মাদ গোপী রূপে ছুটে আসি।

বিরাট বিপুল তুমি চিন্ময়
ভাবিতে ও রূপ মনে লাগে ভয়
মোর কাছে তুমি চির মধুময়
মদন মনোহর॥

১৫২
ভজন

তোমার নামের মহিমা শ্রীহরি
নাহি হয় যেন ম্লান।
তব নাম গেয়ে বেড়াই জগতে,
সে নামের সম্মান
হরি নাহি হয় যেন ম্লান॥

তব নাম লয়ে করিব যে কাজ
হরি, তাহে যেন নাহি পাই লাজ,
তোমার নামের দুধ বেচে যেন
মদ নাহি করি পান॥

আমারে নরকে পাঠায়ো শ্রীহরি
যদি অপরাধ করি,
তব নাম শুনে ও নামের গুণে
পাপী যায় যেন তরি।

(যেন) মোর কর্মের দোষে, মাধব !
(কারও) অবিশ্বাস না আসে নামে তব
হরি মোরে মুচি করো শুচি হোক সবে
শুনে তব নাম গান॥

১৫৩

তোমারি আশায় তেয়াগিনু সব সুখ
আর মোরে রাখিও না দূরে।
তুমি যেন ছেড়ো না মোরে ঘনশ্যাম
মোরে বাঁধো তব চরণ–নূপুরে॥

বিরহের বেদনা অন্তরে ঘনায়
শান্তি দাও ব্যথা–বিধুরে।
তব চিত্তে মিলাও প্রভু চিত্ত এ মম
তব অঙ্গে মিলাও মোর অঙ্গ প্রিয়তম
জনম জনম মীরা তোমারি দাসী
হৃদি–বৃন্দাবনে নিতি ঝুরে।
শত গীতে শত সুরে॥

এইচ. এম. ভি.। শিল্পী : হরেন চ্যাটার্জী।

১৫৪

তোর জননীরে কাঁদাতে কি
মেয়ে হয়ে এসেছিলি।
তুই ত্রিলোক আনন্দ দিয়ে
মাকে শুধু দুঃখ দিলি॥

মা নিতুই যে এ বুকের মাঝে
তোর আগমনীর বাঁশি বাজে..........

(ওরে) পার্বতী না দেখে তোরে
জীয়ন্তে মা আছি মরে
(আমার) শূন্য বুকের শ্মশানে আয়
মেয়ে জামাই দুজন মিলি॥[১]

---

১. এই গানটির পাঠান্তর ও পূর্ণরূপ পাওয়া যাবে পরের গানটিতে

১৫৫

তোর জননীরে কাঁদাতে কি
মেয়ে হয়ে এসেছিলি
তুই কোন শিব-লোক করলি আলো
উমা মাকে শুধু দুঃখ দিলি॥

মা তোর সেই খেলনা আছে পড়ে
তুই শুধু নেই খেলাঘরে
তোর সেই খেলনা বুকে ধরে
কাঁদব কত নিরিবিলি॥

শুনেছি মা, পূজায় যাহার
মেয়ে নাহি ফেরে ঘরে
তুই নাকি তার শূন্য বুকে
আসিস মেয়ের মূর্তি ধরে।

মা কোথায় আছিস সে কোন রূপে
সেই রূপে আয় চুপে চুপে
কোন মা-কে তোর শান্তি দিয়ে
আপন মাকে কাঁদাইলি॥

১৫৬

(মা) তোর স্নেহ-প্রেম-বন্যা ঝরে
ঘরে ঘরে কন্যা হয়ে।
তোর সৃষ্টি রাখেন সজীব, এঁরাই
গঙ্গাধারার মতো বয়ে॥

ঝর্না ঝরায় এঁদের স্নেহে
পুরুষ প্রাণে প্রতি গেহে
(এঁরাই) সতী শিব সীমন্তিনী
প্রেম-মগ্ন পতি লয়ে॥

১৫৭

কোরাস

থির সৌদামিনী থির কৃষ্ণ মেঘে অপরূপ শোভা।
হের প্রেম-পিয়াসী গোপ গোপিনী সব রূপ মনোলোভা॥

যুগল-মিলন দেখ দেখ রূপ মনোলোভা।
রাধা কৃষ্ণ মিলন হলো অপরূপ শোভা॥
বল, রাধা কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ
পরম-আমির পরম-তুমির সাথে মিলন হলো
পরম প্রেমের পরম প্রেমময়ের মিলন হলো
বল, রাধা কৃষ্ণ
জয় রাধা কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ॥

১৫৮

ভজন

দেবতা কোথায় স্বর্গের পানে চাহি অসহায়
কাঁদি বৃথাই।
নাই অমরায়, বিগ্রহে নাই, মন্দিরে নাই
তীর্থে নাই॥

কংস-কারার পাষাণ-পুরীতে
বন্দীর সাথে দেখেছি ঝুরিতে
(ওরে) চল সবে সেই তীর্থ-ভূমিতে
সেথা গিয়ে মোরা কেঁদে লুটাই॥

ক্ষুধিত, পীড়িত, উপসবাসীদের মাঝে
তাঁহার বেদনা-রক্ত চরণ-রাজে
কাঁদে দুর্বল যথায় দৈন্য লাজে
সেথা তাঁর গীতা শুনিতে পাই॥

ঘুমায় যে সিন্ধুতে নারায়ণ
(সেথা) সুরাসুর মিলে তোল আলোড়ন
দেবতা জাগাতে আরো মন্থন
আরো অসহন পীড়ন চাই॥

শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ।

১৫৯

ভজন

নওল কিশোর শ্যামল এলো মধু-জ্যোৎস্নায় নাহিয়া।
নবনী-গল্যানো লাবণি ঝরে রস-বিগ্রহ বাহিয়া॥

বনে উপবনে কুসুম ছড়ায়ে
নীরদ-কণ্ঠে বিজলি জড়ায়ে
বেণু বাজায়ে ধেনু চরায়ে
'রাধা রাধা' গান গাহিয়া॥

আমার হৃদয়-ব্রজধামে একি রাস-উৎসব, সজনি,
নিশিদিন আমি শুধু চাঁদ হেরি, পোহায় না মোর রজনি।

তারে কালো বলে কে করে উপহাস
আনে যে এমন আনন্দ-রাস,
যত দেখি তত বাড়ে যে তিয়াস
(ঐ) ঘনশ্যাম পানে চাহিয়া॥

১৬০

নটনাথ নৃত্য

নাচে নটরাজ মহাকাল।
অম্বর ছাপিয়া পড়ে লুটাইয়া
আলোছায়ার বাঘ-ছাল॥

কাল-সিন্ধু-জলে তাথৈ তাথৈ রব
শুনি সেই নৃত্যের নাচে মহাভৈরব,
বিষাণ-মন্দ্রে বাজে মাভৈঃ মাভৈঃ রব,
প্রাণ পেয়ে জেগে ওঠে মৃত কঙ্কাল॥

গঙ্গা-তরঙ্গে অপরূপ রঙ্গে —
ছন্দ জাগে সেই নৃত্য-বিভঙ্গে।
জ্যোৎস্না-আশীষ ধারা ঝরে চরাচরে
ছাপিয়া ললাট-শশী-থাল॥

টুইন। শিল্পী : দেবেন বিশ্বাস।

১৬১

নাচে নাচে শ্যাম সুন্দর গোপাল নটবর
সুঠাম মনোহর মধুর ভঙ্গে।
ঘিরি সে চরণ ঘুরিছে অগণন
গ্রহ তারা গোপী সম রঙ্গে॥
হেরিয়া তাহারি নৃত্য হিল্লোল
পবন উন্মন সাগরে জাগে দোল,
সে নাচে বিবশ নিশীথ দিবস
জাগে হিন্দোল আলো আঁধার–তরঙ্গে॥

সে নাচে বৃষ্টি হয় কোটি সৃষ্টি
নির্ঝর সম ঝরে ছন্দ,
সে নাচ হেরিয়া বন্ধন টুটেরে
জাগে অনন্ত আনন্দ।
ষড় ঋতু ঘুরে ঘুরে হেরে সেই নৃত্য
প্রেমাবেশে মাতোয়ারা নিখিলের চিত্ত,
তাই এই ত্রিভুবন হলো নারে পুরাতন
পেল চির–যৌবন নাচি তারি সঙ্গে॥

১৬২
দাদরা

নাথ সহজ করো লঘু করো এই জীবনের ভার।
সুন্দর ও সরল করো জটিল এ সংসার॥

লোভ দিওনা তৃপ্তি দিও
অল্পে যেন মন ভুলিও
শক্তি দিও ধৈর্য দিও দুঃখ সহিবার॥
বিপুল হয়েও সাগর যেমন হিল্লোলিয়া ওঠে
তেমনি যেন বোঝা বয়েও গানের ভাষা ফোটে।
সারা দিনের শ্রমের পরে
ডাকব তোমায় পরান ভরে
তোমার নামের ভেলায় চড়ে হেসে হবো ভব পার॥

১৬৩

নাথ সারা জীবন দুঃখ দিলে
(তোমার) দুখ দেওয়া কি ফুরাবে না।
যে ভালোবাসায় দুঃখ ভাসায়
সে কি আশা পুরাবে না॥

আমার জনম গেল ঝুরে ঝুরে
নিত্য-দুখের চিতায় পুড়ে
তোমার স্নিগ্ধ পরশ দিয়া কি নাথ
দগ্ধ হিয়া জুড়াবে না॥

আমার ব্যথার কারাগারে
দুখের কৃষ্ণা অষ্টমীতে
পথ চেয়ে যে বসে আছি
আসবে কবে মুক্তি-দিতে?

তুমি অশ্রুতে গো বুক ভাসালে
সেই চক্ষে এসো দিন ফুরালে
তুমি আঘাত দিয়ে ফুল ঝরালে
হাত দিয়ে কি কুড়াবে না॥

১৬৪

শ্যামা-সংগীত

নীল হরি এসো নীলে হিরণে সেজে মন হরিতে
হে নীল হৃষীকেশ বিজড়িত হয়ে এসো
হিরণ বরণ রাই কিশোরীতে॥

চাঁচর কেশে নীল ময়ূর পাখা
অধরে সোনার হাসি জোছনা মাখা
সুনীল উদার বক্ষ ঢাকা কাঞ্চন কদম মঞ্জরিতে॥

স্বর্ণ পাখা নীল প্রজাপতি সম
পীত বসন পরে এসো নীল কিশোর মম।

নীলমনি এসো হলুদ চাঁপার বনে
কনক নূপুর পরি নীল চরণে
সোনার ভ্রমর ঘেরা নীল পদ্ম যেন
নব ঘন শ্যাম এসো, বিজড়িত হেম-তড়িতে॥

ঢাকা-বেতার কেন্দ্রের জন্য।

১৬৫

পায়ের বেড়ি কাটল না তোর
আরো আঘাত হানতে হবে।
ওরে আরো নিষ্ঠুর হ
হয়তো শিকল টুটবে তবে॥

পালিয়ে যেতে চাইবি যত
প্রহরীরা ঘিরবে তত
যত ফাঁকি চাইবি দিতে
(ওরা) ততই সজাগ হয়ে রবে॥

মায়ার ডোরে বন্দী ওরে সহজে কি মুক্তি মেলে
আয় বেরিয়ে মিথ্যা সুখের জতু গৃহে আগুন জ্বেলে।

বাঁধতে তোরে আসবে ধেয়ে
কাঁদতে কাঁদতে ছেলে মেয়ে
দেখবি না পিছনে চেয়ে
(এসব) মায়ার খেলা বুঝবি যবে॥

টুইন। ইন্দু সেন।

১৬৬

পাষাণ যদি হতে তুমি
অনেক আগে গলে যেতে।
দেবতা যদি হতে তুমি
আমার কাঁদন শুনতে পেতে॥

প্রেমিক নহ তুমি কপট
তুমি নিঠুর সুন্দর শঠ
এড়িয়ে তুমি চল সে পথ
যে পথে দিই পরান পেতে॥

তৃষ্ণার জল নহ তুমি ছলনাময় মরীচিকা
প্রদীপ হয়ে কাছে ডেকে পুড়িয়ে মার অগ্নি-শিখা।

দেখে মোর যাতনা দিবস যামী
হয়তো তুমি গলবে স্বামী
তোমার পাষাণ বিগ্রহ তাই
রেখেছি হৃদ মন্দিরেতে॥

১৬৭

প্রেম অনুরাগ শ্রী কান্তি মধুর
হে চির সুন্দর
রুচির শুভ্র শুচি
অপরূপ মনোহর॥

তব রূপে নিরুপম
গগন পবন মম
হইল মধুরতম
রাঙিল এ অন্তর॥
হেরি সাধ মিটিবে না কোটি জনম যদি
কোটি নয়ন দিয়ে হেরি ও রূপ নিরবধি।

তোমার রূপের মধু
পিয়াও আমারে বঁধু
যে রূপের নেশায় পাগল
ত্রিভুবন চরাচর॥

১৬৮

(এই) পৃথিবীতে এত শক্তির খেলা
আমরা পাই না খেলিতে।
(তোর) বিপুল ভুবনে আমাদেরই ঠাঁই
নাই মা হাত পা মেলিতে॥

দশভুজা দশ দিকে একি আনন্দে
নৃত্য করিস প্রাণের[১] ছন্দে
মোরা দুর্বল তারি তালে তালে
পারি না চরণ ফেলিতে॥

কোন অপরাধে কার অভিশাপে
পাই এ শাস্তি বল মা
দনুজ দলনী এই শৃঙ্খল
প্রবল চরণে দল মা।

নিষ্ঠুর হাতে দূরে ফেল টানি
জীবনের এই দাসত্ব গ্লানি
ঢেকে ফেল এই দারুণ লজ্জা
মা তো রক্ত-চেলিতে॥

---

১. প্রবল।

১৬৯

কীর্তন

বন-কুসুম ! বলরে তোরা 'কোথায় বনমালী' ?
যাঁহার আশায় ফুটে থাকিস্ গহন বনের ধারে॥
(ফুটে থাকিস রে, ও ফুল, ফুটফুটে জ্যোৎস্নাতে ফুটে থাকিস রে)
তোরাও কি মোর মতো চাহিয়া তার পথ ফুটে আছিস রে॥

ও যমুনা ছুটে চলিস কোন সাগরের টানে
আমার শ্যাম-সাগর কোথায় তোর সাগর কি জানে ?
ওরে সাগর ! দুলে উঠিস যে চাঁদকে দেখে,
সে চাঁদ যে চাঁদ হলো মোর চাঁদের সুধা মেখে
(সে কোন গগনে থাকে রে ?
আপনাকে সে চাঁদ সুরুযের আড়াল দিয়ে রাখে রে।)

ওরে বাতাস, বাউল হয়ে দেশে দেশে খুঁজিস কারে
ওরে আকাশ, ধেয়ান-মগন চির জনম চাহিস যারে,
সেই তো আমার প্রিয়তম
জনম জনম বল্লভ সেই মোর, সাধনা মম।

আয়রে সবাই ডাকিব মোরা কেঁদে কেঁদে তারে গভীর প্রেমে,
করুণা-সিন্ধু নাম শুনি তার অবিরাম
(সে) হয়তো অনুরাগে আসিবে নেমে॥

১৭০

বাঁশি কি হরি শুনিতে পাব না
পাশরিয়া আছি বলে !
তব রাস-উৎসবে ভিখারির মতো
বসে আছি পথ তলে॥

যে ডাকে, যদি তারি হও একা,
ডাকে না যে, সে কি পাইবে না দেখা,
কাঁদে না যে ছেলে জননী কি তারে
ডাকিয়া লয় না কোলে॥

(হরি !) পথ ভুলিয়া যে ঘোরে অরণ্যে,
দেখাবে না তারে পথ
(তুমি) সেদিনো ফিরায়ে দাওনি কংস
দুর্যোধনের রথ।

হরি ! তুমি যদি নাহি ডাক আগে
তাহার কি হরি-প্রেম কভু জাগে ?
(হরি !) শুনে তব বাঁশি ব্রজ বাসিনীরা
যেত যমুনার জলে॥

শিল্পী : কমল গাঙ্গুলি। মেগাফোন

১৭১

বিয়ে হয়েও সাজল না বৌ শিবানী মোর তেমনি আছে।
মাথায় ঘোমটা দেয় না মেয়ে হাসে বসে শিবের কাছে॥
যেমন মেয়ে তেমনি জামাই
সাজ সজ্জার নাইক বালাই
ডাকাত মেয়ের ভয় ডর নাই, দাঁড়িয়ে শিবের বুকে নাচে॥

সে লাজশরমের ধার ধারে না, বেড়ায় শিবের কোলে চড়ে,
যেন বুনো পায়রা দুটি, যেন দুটি মানিক জোড়ে।
শিবকে আধেক অঙ্গ দিয়ে
শিবের আধেক অঙ্গ নিয়ে
(আমার) ভুবনমোহিনী উমা হর–গৌরী সাজিয়াছে॥

১৭২

বুঝি চাঁদের আর্শিতে মুখ দেখেছে
কালো মেয়ে কালিকা।
তারার নূপুর তাই ছড়িয়ে ফেলেছে
নীল আকাশে বালিকা॥

অভিমানে তাই বাঁধে না কেশ
ধরেছে সে সংহারিণী বেশ,
চণ্ডী হয়ে মুণ্ডুমালা পরেছে
ফেলে ফুলের মালিকা॥

যত বলি তুই কালো নস গোরী গো
মুখ মেখেছিস কাজলে
উমা ততই শ্যামা হয়ে ঢাকে মুখ
কৃষ্ণা তিথির আঁচলে।

মোরা বুঝি তেমনি দেখি মায়া
আলোর দেহে মিথ্যা কালোর ছায়া
তোর এ কালোর খেলা এবার ভোলা মা
বিশ্বভুবন–পালিকা॥

১৭৩

ব্রজ–বনের ময়ূর! বল কোন বনে
শ্যামের নূপুর বাজে।
ওরে গোঠের ধেনু! কোথায় বাজে বেণু
(মোরে) নিয়ে চল সেই বনের মাঝে॥

ওরে নীপ-বন বল কোথা লুকালো শ্যামল ?
বল যমুনার জল কই মোর চঞ্চল ?
বল লুকালি কোথায় ওরে রাখাল
আমার রাখাল-রাজে ॥

ওরে কৃষ্ণ-ভ্রমর বল করুণা করি
কোন কুঞ্জে রহে মোর কিশোর হরি ?
ওগো মাধবী লতা মম মাধব কোথা
কোথা মদন-মোহন বল ব্রজ-নাগরী !

যদি দেবে না দেখা সেই কলঙ্কী চাঁদ
কেন ঘর ভুলালো পেতে মোহন ফাঁদ
কেন আনিল ব্রজে ভিখারিনি সাজে ॥

১৭৪

ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা ভব ভয় হরা
অসি করা অকলঙ্ক শশী-শেখরা ॥

জগত-জন-জননী
দনুজ-রিপু দলনী
(কভু) জীবের জীবন হর
(হর) শোক মৃত্যু জরা ॥

মহিষাসুর মর্দিনী
ত্রিভুবন পালিনী
অশিব নাশিনী
অয়ি শিব স্বয়ম্বরা ॥

তব ধ্রুব পদ
শিবের সাধনা...
সৃজন-প্রলয় পায়ে
যুগল নূপুর পরা ॥

১৭৫

(মা গো) ভুল করেছি, চোরের রাজায়
ছেড়ে দিতে বলে।
সে এবার এলে শক্ত করে
বাঁধিস উদূখলে।
(সেই খল কপটে বাঁধিস উদূখলে)॥

মা জানত কে যে এমনিভাবে
সে ছাড়া পেলেই পালিয়ে যাবে
মা ভুলব না আর সেই মায়াবীর
কাজল–চোখের জলে॥

প্রেম–প্রীতি–ডোর বাহুর বাঁধন
করুণ চোখের জল
আনব মাগো বাঁধতে তারে
(আছে) যার যাহা সম্বল।

তারে নীল যমুনা বন উপবন
সবাই মিলে ঘিরবে যখন
দেখব কেমন করে তখন
পালায় সে কোন ছলে॥

১৭৬

মণ্ডলী রচিয়া ব্রজের গোপীগণ
করে রাস–কেলি সঙ্গে রাধাপ্যারী মদনমোহন॥

(যেন) মেঘের কোলে সৌদাসিনী খেলে
(যেন) তমাল ডালে স্বর্ণলতা দোলে,
নীল গগন–থালায় যেন জোছনারই চন্দন॥

তারাগণ মধ্যে যেন চাঁদের উদয়
নীল কমলে যেন সোনার পরাগ রয়
নীল গিরিতে যেন ঝর্নার হরষণ॥

পূর্ণিমা কৃষ্ণা রাতি একই তিথিতে
জড়াজড়ি করে নাচে মাধবী-বীথিতে
আনন্দ-গোলক হলো আজি মধুবন॥

শিল্পী : কুঞ্জলাল সিনহা

•

১৭৭

মা তোর ভুবনে জ্বলে এত আলো
আমি কেন অন্ধ মাগো দেখি শুধু কালো॥

সর্বলোকে শক্তি ফিরিস নাচি
মা আমি কেন পঙ্গু হয়ে আছি?
মা ছেলে কেন মন্দ হলো, জননী যার ভালো॥

তুই নিত্য প্রসাদ বিলাস কৃপার দুয়ার খুলি
চির শূন্য রইল কেন আমার ভিক্ষা ঝুলি?

বিন্দু বারি পেলাম না মা সিন্ধু জলে রয়ে
(তোর) চোখের কাছে পড়ে আছি চোখের বালি হয়ে
মোর জীবন্মৃত দেহে এবার চিতার আগুন জ্বালো॥

১৭৮

'ষষ্ঠী'-বন্দনা

মাতৃরূপা দয়ারূপা ষষ্ঠী মাগো নমঃ নমঃ।
ত্রিজগতের ধাত্রী তুমি, শিশুগণের মাতৃ সম।
ষষ্ঠী মাগো নমো নমঃ॥
সৃষ্টির সূতিকা-গেহে।
জাগো তুমি বিপুল স্নেহে,
নব-জাত শিশু যত
তোমার প্রাণের প্রিয়তম।
ষষ্ঠী মাগো নমঃ নমঃ॥

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ভয় হতে মা রক্ষা করে
রাখ সকল শিশুদেরে তোমার অভয় বক্ষে ধরে।

তোমারই দান মোর সন্তান
(এরে) দাও মা আয়ু, দাও কল্যাণ,
স্তবে মোর তুষ্টা হয়ে
(এর) সব অপরাধ ক্ষম ক্ষম।
ষষ্ঠী মাগো নমো নমঃ॥

১৭৯

মুক্তি দিলে আমায় হে নাথ
মোর যে প্রিয় তারে নিয়ে।
আমি কিছু রাখতে নারি
দেখলে যারে বারে দিয়ে॥

যত্ন আদর পায় না হেথা
কথায় কথায় দিই যে ব্যথা
(নাথ) তোমার দানের মান থাকে না
(তাই) বারে বারে যায় হারিয়ে॥

তোমার প্রিয় এসেছিল
অতিথি হয়ে আমার ঘরে
ফিরে গেল অভিমানে
বুঝি আমার অনাদরে।

যে ছিল নাথ মোর প্রাণাধিক
সে যে তোমার বুকের মানিক
এবার সে আর হারাবে না,
বাঁচল তোমার কাছে গিয়ে॥

শিল্পী : যূথিকা রায়

১৮০

মোর গিরিধারী লাল কৃষ্ণ গোপাল
যুগে যুগে হয়ো প্রিয়।
জনমে জনমে বঁধু তব প্রেমে আমারে ঝুরিতে দিও॥

(তুমি) চিরচঞ্চল চির পলাতকা
প্রেমে বাঁধা পড়ে হয়ো মোর সখা
মোর জাতি কুল মান তনু মন প্রাণ
হে কিশোর, হরে নিও॥

রাধিকার সম কুবুজার সম রুক্মিণী সম মোরে
গোকুল মথুরা দ্বারকায় নাথ রেখো তব দাসী করে।

(তুমি) গোপনে চেয়েছ শত গোপিকায়
চন্দ্রাবলী ও সত্যভামায়
তেমনি না হয় চাহিও আমায়
লুকায়ে ভালোবাসিও॥

১৮১

মোর দুখ-নিশি কবে হবে ভোর।
ভুবনে ছড়ালো প্রভাতের আলো
আমারি ভবনে কেন আঁধার ঘোর॥

সূর্য কিরণে সাগর শুকায়
সে রবি কিরণে শুকাল না হায়
আমারই বিরহী আঁখির লোর॥

অশোক-বনে সীতার সঙ্গিনী প্রমীলার সম
নিশীথের আঁধার মুখ লুকায়ে কাঁদে অন্তরে মম।

মালা চন্দন লয়ে মন্দির মাঝে
এলো নব বধূসম পূজারিণী সাজে
শূন্য মন্দিরে আমি একা কাঁদি
জড়ায়ে ছিন্ন মালার ডোর॥

১৮২

মোরা ভেসে যাব কৃষ্ণ নামের স্রোতে গো।
ঐ নাম ধরে গো উঠব মোরা ব্রজধামের পথে॥

ঐ নামেরই মন্ত্রগুণে
পথের মানুষ গোঠের বেণু শুনে গো
ভুলের কূলে কূলে খেলে যে
সে ওঠে ফুলের রথে॥

ঐ নাম পেলে যে সুমুখে তার শ্যাম গো
দেখা দেবার তরে নিতুই ঘোরে অবিরাম গো।

ঐ কৃষ্ণ নামের টানে
ধীরে ধীরে প্রেম-যমুনা আনে
ঐ নামের গুণে গঙ্গাধারা নামে হিমগিরি হতে॥

১৮৩

কীর্তন

যমুনার জল দ্বিগুণ হয়েছে চাঁদ কি উঠেছে গগনে?
(শাম-চাঁদ কি উঠেছে গগনে?)
চন্দন-রজ-সুগন্ধ পাই ব্রজের মন্দ পবনে!

মৃদু মৃদু বহে মন্দ পবন
ব্রজ হলো যেন নন্দন-বন,
আনন্দ আজ উথলি উথলি উঠিছে ভবনে ভবনে॥

কৃষ্ণচূড়ার ডালে নাচে ময়ূর
তালে তালে বাজে চুড়ি কাঁকন কেয়ূর।
বন হতে ছুটে এলো হরিণী হরিণ
ওরা বুঝি শুনিয়াছে শ্যামের নূপুর।
শ্বসিয়া শ্বসিয়া ওঠে বেণুকার বন
ও বুঝি শুনেছে গো বাঁশরি কানুর।

সখি আন ঘরে যেতে হাত হতে তাই পড়ে গেল বুঝি থালিকা,
কাঁপে ঘন ঘন বাম নয়ন, শিহরে কণ্ঠে মালিকা।
বন-মালী কি এলো গো
অঞ্চল লয়ে খেলে তাই কি চঞ্চল বায়ু এলোমেলো গো?
সখি কেবলই নয়ন জলে ভরে আসে বল্‌লো কেমন করে
কিশোর চাঁদের চাঁদ মুখখানি দেখিব নয়ন ভরে?

১৮৪
কীর্তন

যা যা লো বৃন্দে মথুরাতে দেখে আয় কেমন আছে শ্যাম,
তুই কুবুজা সখার কাছে নিসনে লো নিসনে রাধা নাম ৷৷

তারে রাধার কথা
স্মরণ করায়ে দিয়ে দিসনে লো দিসনে ব্যথা।
বড় ব্যথা বাজবে প্রাণে
মোর হরি যদি ব্যথা পায় প্রাণে সই দ্বিগুণ ব্যথা বাজবে প্রাণে।
দেখে তোরে বিন্দে লো বৃন্দাবনের কথা গোবিন্দ শুধায় যদি
বলিস হে মাধব, মাধবীকুঞ্জ তব পড়ে গেছে শুকায়েছে যমুনার নদী।

ব্রজে আর সুখ নাই, শুক নাই সারী নাই
শুকায়েছে সবি হায়, শুক নাই সারী নাই
সারি সারি গোপ-নারী পাগলিনি প্রায়
শূন্য যমুনাতে জল নিতে যায়
দেখে তীরের কদম-তরু আছাড়ি পড়ি
শূন্য যমুনা-বুকে মুখ রাখিয়া দুখে গিয়াছে মরি ৷৷

ব্রজবাসী সবে উদাসী হইয়া চলিয়া গিয়াছে
শুধু রাই অভাগিনী শ্মশানে আগুলি বসিয়া আছে ৷৷

১৮৫

যূথিকা মাধবী মল্লিকা লহ শ্যাম হে
নব বিকশিত চম্পা, লহ আরতি ফুল-গন্ধে।
যমুনা আকলি উঠিছে উথলি,
গুঞ্জরে অলি বিহগ-কাকলি শুকসারী আনন্দে,
ভ্রমর গুণ গুণ স্বরে বন্দে ৷৷

তরুলতা সব নাচে বায়ু-ভরে
তোমার পূজার ফুল ডালা ধরে
হংস সারসী কমল-কাননে নাচে জলধারা ছন্দে ৷৷

ময়ূর-ময়ূরী শঙ্খ বাজায়
বনলতা পাতা দেউল সাজায়
পূজিতে তাদের বন-দেবতায়
কিশোর গোকুল-চন্দে ॥

শিল্পী : কুঞ্জলাল সিনহা

১৮৬

যেন ভোরে জাগি তব নাম গেয়ে
ঘুম যেন ভাঙে তব মুখে চেয়ে ॥

যদি নিদ্রা-মোহে
হৃদি-দ্বার রুদ্ধ রহে,
আসিও হে নাথ প্রভাত আলো বেয়ে ॥
সারা দিনমান সব কাজের মাঝে,
যেন তব স্মৃতি বীণা সম বাজে।

তব স্নিগ্ধ কান্তি
শুভ্র প্রশান্তি,
থাকে যেন নাথ প্রাণ মন ছেয়ে ॥
তপনের রূপে
এসো চুপে চুপে
যেন আঁখি খোলে তব আলো পেয়ে ॥

১৮৭

রাঙা জবার বায়না ধরে
আমার কালো মেয়ে কাঁদে !
তারার মালা ছড়িয়ে ফেলে
এলোকেশ নাহি বাঁধে ॥

পলাশ অশোক কৃষ্ণচূড়ায়,
রাগ করে সে পায়ে গুঁড়ায়
সে কাঁদে দুহাত দিয়ে ঢাকে
যুগল আঁখি সূর্য্যচাঁদে ॥

অনুরাগের রাঙা জবা ফোটে না মোর মনের বনে
আমার কালো মেয়ের রাগ ভাঙাতে
ফিরি জবার অন্বেষণে।

মার রাঙা চরণ দেখতে পেয়ে
বলি এই যে জবা হাবা মেয়ে !
জবা ভেবে রাঙা আপন পায়ে
উঠল নেচে মধুর ছাঁদে ॥

১৮৮
কীর্তন

রাই জাগো রাই জাগো বলে কেঁদে কেঁদে ডাকে শুক সারী।
দেখিয়া এসেছি মথুরা আছে মোদের মুরলী-ধারী ॥
(রাই জাগো রাই জাগো
শ্যাম-নিবেদিত সোনার অঙ্গ ধুলায় লুটায়ো না গো।)
দেখিয়া এসেছি মথুরায় আছে মোদের মুরলী-ধারী ॥
(সেথা মুরলীধারী আছে মুরলী তার হাতে নাই
সেথা মুরালী রূপ তার দেখে লাগে ভয় তার মুরলী হাতে নাই।
সাথে হ্লাদিনী রাধা নাই তাই মুরলী সাধা নাই)।
সে ধড়াচূড়া ফেলিয়া পরেছে রাজবেশ
তার মুখ দেখে মনে হয় কানু আর সে কানু নয়
কে যেন দিয়েছে তারে দণ্ড অশেষ।
সে রাধারে কাঁদায়েছে তাই বুঝি কে বাঁশি কেড়ে নিয়ে হাতে দণ্ড দিয়েছে।

সখি যেমনি আমরা চম্পার ডালে গাহিনু শ্রীরাধা নাম
রাজ-সভা মাঝে কাঁদিয়া লুটায়ে পড়িল শ্যাম।
রাজবেশ ছিঁড়ে ফেলে রাধা বলে মুরছিত ভেল
সে গোকূলে ভুলে নাই ভোলেনি লো তোরে রাই
চল আনিতে যাই শ্যাম চাঁদকে লো ॥

১৮৯
ফণিনী

লুকায়ে রাখিব সাপিনি যেমন
মানিক লুকায়ে রাখে
ঘিরিয়া থাকিব ভামিনী যেমন
শ্যাম মেঘ ঘিরে থাকে ॥

মেঘের মতন হে চাঁদ তোমায়
আবরি রাখিব আঁখির পাতায়
নিশীথে জাগিয়া কাঁদিব দুজন
চাঁদ চকোরিণী সম॥

নওল কিশোর এসো ! লুকায়ে রাখিব আঁখিতে মম।
আমার আঁখির ঝিনুকে বন্দী রহিবে মুক্ত সম॥
তুমি ছাড়া আর এই পৃথিবীতে
এ আঁখি কারেও পাবে না দেখিতে
তুমিও আমারে ছাড়া কাহারেও হেরিবে না প্রিয়তম॥

১৯০

শঙ্কর সাজিল প্রলয়ঙ্কর সাজে রে
বজ্রের শিঙ্গা মেঘের ডম্বুরু গুরু গুরু
বাজে অম্বর মাঝে রে॥

রুদ্র নৃত্য বেগে জটাজুট গঙ্গা
বৃষ্টি হয়ে ঝরে সৃষ্টির বক্ষে
অধীর তরঙ্গা॥

শন শন ঝঞ্ঝায় বিদ্যুৎ নাগিনীর ঘন শ্বাস
অপগত হলো ভয়
বন্ধন হলো ক্ষয়
হেরি অশিব-সংহর নাটরাজের॥

১৯১
কীর্তন

শোনালো শ্রবণে শ্যাম শ্যাম নাম।
যে নাম শুনি পবনে, যে নাম হৃদি-ভবনে,
(সখি) যে নাম ত্রিভুবনে বাজে অবিরাম॥

নাম শোনালো, শোনালো,
যে নাম শুনি কুলনারী হয় আনমনা লো।
সখি, ধেয়ায় যে নাম প্রতি ঘরে প্রতি জনা লো।
সখি, ভোলায় যে গৃহকাজ, ভোলায় যে কুললাজ
যে নাম শুনিতে লো কান পেতে রই
সাধ যায় যে নাম-নামাবলী গায়ে দিয়ে যোগিনী হই।
নহে শুধু রাধিকার, সাধকের সাধিকার, যে নাম জপমালা সই,
তোরা শোনা সেই নাম লো,
তোরা বাহিরে শোনা, তোরা গাহিয়া শোনা
যে নাম অন্তরে জপি অবিরাম লো॥

কথা ও সুর : নজরুল। টুইন। শিল্পী : নারায়ণদাস বসু ১৯৩৪

১৯২
কীর্তন

সখি নবীন নীরদে ছাইল গগন, নব ঘন শ্যাম কই।
দেবদারু শাখে বাঁধিয়া ঝুলনা পথ পানে চেয়ে রই॥
(চাতকীর মতো পথ পানে চেয়ে রই
দামিনী দমকে চমকিয়া উঠি পথপানে চেয়ে রই)
সখি কাজ আছে তার এত কি?
ঝুরে অভিমানে বনপথ-তলে বকুল কামিনী কেতকী।
পুবালি বাতাস করে হাহাকার ঝর ঝর জল ঝরে অনিবার
যেন বেদনায় শ্রীমতী রাধার আঁধার আকাশ আজি
যমুনার জলে ভাসায়ে দে মালা চন্দন ফুল-সাজি।
(ফুল-সাজি কেন আনিলাম ফুল-সাজে কেন সাজিলাম।
বনমালী নাই, কার তরে তবে এই বনমালা গাঁথিলাম)॥

সখি সবার তৃষ্ণা মিটাইল আজ ঘনশ্যাম তৃষ্ণাহারী
রাধারই হৃদয় রহিল নীরস পেল না বিন্দু বারি।
(করুণা সিন্ধুর শরণ লইয়া পেল না বিন্দু বারি
তৃষ্ণাহারীর চরণ ধরিয়া পেল না বিন্দু বারি)॥

১৯৩
ফণিনী

সখি দেখলো বাহিরে গিয়া
কে অমন করে সকরুণ সুরে ডাকিল পিয়া পিয়া।
পিয়া ডাক শিখে বনের পাপিয়া এলো কি মথুরা হতে?
ভ্রমর গুঞ্জন নূপুর বাজায়ে শ্যাম চলে যায় বন-পথে।

(তোরা ডাকিলি না বলে বনে চলে যায় গো
ঝরা পাতার নূপুর বাজায়ে বনমালী বনে চলে যায় গো।)
সখি হলুদ-রাঙা কার পীত-ধড়া
ঐ সোনাল ফুলের ডালে দোলে, দেখলো তোরা।
তোরা দেখে আয় ঐ মোর মদনমোহন
ও সোনাল তরু নয়, মলয় হাওয়ায় দোলে পীত-বসন॥

(সখি) ও নহে দোয়েল, ও নহে কোয়েলা পাখি।
রাধারে খুঁজিয়া বেড়ায় উড়িয়া শ্যামের কাজল-আঁখি
দেখিতে বুঝি আসিয়াছে মোর হৃদ-পিঞ্জরের পাখি॥

কৃষ্ণ বিরহে রাধার প্রাণ আজও আছে কিনা আছে।
তারে ডেকে এনে বলো
রাধার পাষাণ প্রাণ যাবে না যাবে না, না হেরি হরির চরণ-কমল॥

১৯৪

সখি শ্যামের স্মিরিতি শ্যামের পিরিতি
মম জীবন মরণের সাথি।
জনম জনম কব, মাধব মাধব
ওই ধ্যানে রব দিন রাতি॥

আমি ওই ধ্যানে রহিব—
ভুলে গৃহকাজ ভুলে লোক-লাজ
আমি ওই ধ্যানে রহিব—
কৃষ্ণকলি মেখে কলঙ্ক পশরা হাসিমুখে বহিব।

শ্যাম মাথার মণি, শ্যাম মালার মণি
(সখি) শ্যাম মোর নয়নতারা

কৃষ্ণ মোর কৃষ্ণ নয়নতারা
তৃষিত জীবনে শ্যান নাম মোর শীতল সুরধুনি ধারা।
প্রাণ জুড়াইব,
ওই সুরধুনি-ধারায় প্রাণ জুড়াইব।
দারুণ বিরহ-দহন জুড়াইতে শ্যাম
নাম সুরধুনি ধারা॥

১৯৫

শ্যামকল্যাণ — একতালা

স্নিগ্ধ শ্যাম কল্যাণ রূপে রয়েছ মোদেরে ঘেরি
তব অনন্ত করুণা ও স্নেহ নিশিদিন নাথ হেরি॥
তব চন্দন-শীতল কান্তি
সৌম্য-মধুর তব প্রশান্তি
জড়ায়ে রয়েছে ছড়ায়ে রয়েছে
অঙ্গে ত্রিভুবনেরই॥

বাহিরে তুমি বন্ধু স্বজন আত্মীয় রূপী মম
অন্তরে তুমি পরমানন্দ প্রিয় অন্তরতম।

নিবেদন করে তোমাতে যে প্রাণ
সেই জানে তুমি কত সে মহান
যেমনি সে ডাকে সাড়া দাও তাকে
তিলেক করনা দেরি॥

১৯৬

(ওরে) হতভাগী রক্ত-খাগী, কোথায় ছিলি বল!
(তোর) দেখে ছিরি ভয়ে মরি চোখে আসে জল॥

বেণি খুলে এলোকেশে
বেড়াস এ কোন পাগল-বেশে
চাঁদকে ফেলে নীল আকাশে আনলি কোন অনল।
(কপালে জ্বাললি কোন অনল॥)

(ঐ) সদ্য ফোঁটা পদ্মফুলে কে মাখাল কালি?
মা, আমারি কপাল মন্দ কারে দিব গালি।
রাজ–দুলালি আদর পেয়ে
সাজলি ছি ছি নাগার মেয়ে
(তোরে) চিনতে পারি, গৌরী দেখে রাঙা পদতল॥

১৯৭

হরি মোরে হোরির রং দিওনা, আপনি রঙিলা আমি।
বঁধু তোমার প্রীতি প্রতি অঙ্গে রং দিয়ে যায় দিবস যামী॥

তব গভীর প্রেমের আবির ফাগে হরি
অরুণ–রাঙা হলো নীলাম্বরি
আজ রং বদলে গেছে রাধার প্রেম–যমুনার জলে নামি॥

রং যদি দাও ওগো শ্যামল, সেই রং দাও মোরে
যে রঙে রঙে দেখলে আমায় এমন মধুর করে।

রং দেবে আর কোথায় বঁধু বলো,
তোমার রঙে আমার ভুবন নিত্য ঝলমল।
জনমে জনমে গায়ে রং দিতে গো রেখো পায়ে
হয়ো রাধার পরম স্বামী॥

১৯৮

(আমি) হাত তুলেছি তোর পানে মা
(তুই) মোর হাত ধরবি বলে,
(তুই) ভিক্ষা কেন দিস মা হাতে
হাত বেঁধে রাখ চরণ–তলে।
আমি ভিক্ষা পেয়ে চলে যাব
আসি নিত সে আশাতে॥

তুই যবে হাত দিস মা ছেড়ে
চোরে প্রসাদ নেয় মা কেড়ে
তাইতো মাগো ভিক্ষা পেয়েও
দাঁড়িয়ে থাকি আঙিনাতে॥

পথ যে আমার ফুরিয়ে গেছে
জননী তোর কোলে এসে
(আমায়) এখন শুধু ধরো মা বুকে
পুত্র বলে ভালোবেসে।

মা যেমনি তোর কোলে যাব
নিত্য প্রেম আনন্দ পাব
দেখব পূর্ণ চাঁদ উঠেছে মা
তোর রূপের আঁধার রাতে॥

১৯৯

হে নাথ, তোমায় দোষ দেব না
আমারি সুখ সইল না।
তুমি, চাওয়ার অধিক দিয়েছিলে
আমার দোষেই রইল না
তা আমার দোষেই রইল না॥

তুমি আপন হাতে তিলে তিলে
আমার সুখের বাগান সাজিয়ে দিলে
মোর কপাল-দোষে ফুটল না ফুল
মলয় হাওয়া বইল না।
সেথা মলয় হাওয়া বইল না॥

সুখের দোসর সুখের সাথি
তোমার আপন হাতের দান
সারা জীবন আমি তাদের
করেছি নাথ অসম্মান।

নাথ, বৈরাগীর এ সইবে কেন
বিভব রতন বিলাস হেন
তারে ভিক্ষা ঝুলি দাও হে তুলি
সোনার স্বর্গ লইল না
যে সোনার স্বর্গ লইল না॥

২০০

হে নিঠুর তোমাতে নাই আশার আলো
তাই কি তোমার রূপ কৃষ্ণ কালো॥

তুমি ত্রিভঙ্গ তাই তব সকলই বাঁকা
চোখে তব ছলনা কাজল মাখা,
নিষাদের হাতে বাঁশি সেজেছে ভালো॥

২০১

হে পরমাশক্তি পরা প্রেমময়ী তোমারি মধুর প্রেমে
(আমি) চির-রূপহীন রূপ ধরে আসি সৃষ্টির বুকে নেমে (গো)।

প্রিয়া সেইতো বৃন্দাবন
(নিতি) সৃষ্টি স্থিতি সংহার-লীলা করি যথা অনুখন।
ঘোর কালো রূপ আলোময় হয়ে ওঠে যেই গো
সে যে তোমারি রূপ প্রিয়া, মোর রূপ নেই গো।
হে মহাশক্তি, তোমারে ফিরায়ে মায়ার শ্মশান হতে
তোমার নিত্য রাধা রূপে আমি প্রেমের ব্রজের পথে গো।

(তুমি) না ফিরিলে শ্রীমতী পরম শূন্যে
অভিমানে লয় হয়ে যাই
(তুমি) ফিরে এসে কাঁদ যবে বিরহ যমুনায়
অসীম শূন্যে খোঁজ গো আমায়
সৃষ্টিতে হয় প্রেমবৃষ্টি তখনই গো
যবে তব শ্রীচরণ বক্ষে জড়াই॥

২০২

হোরির মাতন লাগল আজি লাগল রে।
বন উপবন নিখিল ভুবন আবীর রঙে রাঙলরে॥
বনের-আনন্দ ফোটে রাঙা হয়ে
রাঙা কুসুমে রাঙা কিশলয়ে
মনের খুশি রাঙা রূপ লয়ে
কুমকুম ফাগে জাগল রে॥

জাগিয়া ওঠে তৃষ্ণা ঘুমন্ত
অনন্ত আশা সাধ অনন্ত
আসিয়া পাগল বনের বসন্ত
মনের আগল ভাঙল রে॥

মনে পড়ে দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ লীলা
প্রেমের রঙে হলো গোকুল রঙিলা
সেই প্রেম ফাগে আজো হৃদি রাঙে
মন ব্রজ তাহারি শ্রীপদরজ মাগল রে॥

২০৩

(মোর) হৃদয়-দোলায় দোলে ঘন শ্যাম।
(কভু) রূপ দোলে কভু দোলে শুধু নাম॥

একি প্রীতি জাগে নব অনুরাগে
অনুখন তনুভরি ছোঁয়া লাগে
(তাঁর) ছোঁয়া লাগে
মনে হয়ে এই দেহ তাঁর ব্রজধাম॥

ফুল চন্দন আনি থালাতে
মুখ ভার করি চায় পালাতে
বিরহ যমুনার তীরে তীরে
মোর নাম লয়ে যেন কেঁদে ফিরে।
প্রেম দাও প্রেম দাও বলে অবিরাম॥

২০৪
নট-বেহাগ

হৃদি বৃন্দাবন-বিহারিণী
তিনি রাধা (শ্রীরাধা)।
(আমি) তাঁহারি গোলকে প্রেম-ভিখারি
তাঁরই শ্রীচরণে বাঁধা॥

দেখিয়াছি আমি তাঁহারি রূপের মাঝে
চির-সুন্দর অপরূপ মোর শ্যাম-রূপ বিরাজে
(মোর) শত জনমের সাধ ছিল
তাঁর রাধা নাম সাধা॥

তাই কৃপা করে পিয়া রূপ ধরে আসেন এ পৃথিবীতে
বিরহ-যমুনা করেন সৃজন কাঁদিতে ও কাঁদাইতে।

বুঝি তাঁরও সাধ ছিল কেমন মধুর শোনা যায়
তাঁর প্রিয় নাম কবিতা-নূপুরে আমার সুরের বেণুকায়
(তাঁর) মিলনের চেয়ে ভালো লাগে বুঝি
বিধুর বিরহে কাঁদা॥

২০৫

সখা, অসীম আকাশ দিক হারায়েছে, রাধা হারায়নি দিক।
ঘন দুর্যোগে প্রেম-দীপ জ্বালি পথ চলে অনিমিখ।
(কৃষ্ণ প্রেম-যোগিনী রাই দুর্যোগে ভয় করে না,
বলে, কৃষ্ণ যোগের এই শুভখন, দুর্যোগে ভয় করে না)।
সখা, বৃষ্টির চিক ফেলিয়া, ভাবিছ রাখিবে নিজেরে ঢাকি
চিকের আড়ালে ঝিকমিক করে তোমার সজল আঁখি!
(হে নিঠুর, তব এ কি লীলা?
তুমি পথে ডেকে পথ ভুলাইতে চাহ, একি লীলা?
সোজা পথ তুমি বাঁকা করো, বাঁকা এ কি লীলা?)
ভেবেছ পথের কাদা মেখে রাধার রূপ পড়িবে ঢাকা,
কলঙ্কী চাঁদ হে, তোমার বিলাস বুঝি গৌর রূপ দেখিলেই
(তোমায় ঐ ভয়ে কেউ চাহে না কালো কলঙ্ক মাখা!
কলঙ্ক লাগিবার ভয়ে কৃষ্ণ নাম গাহে না!)
তুমি সকল রসের আধার তাই এত সাধ জাগে রাধার
রস-সুধা পান করিবার তরে জড়াইয়া তব দেহ
(যেমন) পাত্র জড়ায়ে রস পান করি, পাত্র খাই না কেহ!
যে দেহে প্রেম-অমৃত-রস-স্রোত বয়ে যায়,
হে কিশোর, কাঁদে প্রাণ তাহারি তৃষ্ণায়!
বঁধু, মোরা গোপী কূলবতী
তুমি ভাব বুঝি তোমারি মতন মোরা চঞ্চল মতি?
(কিশোর মতি চঞ্চল হয় — শ্রীমতী চঞ্চলা নয়
তোমার মতি শ্রীযুক্ত হলে তুমি হও শ্রীমতীময়!

তুমি মতির মালা পর হে
তখন বনমালা ফেলে শ্রীমতীর মালা পর হে!
ভরিলে কলঙ্কে পথের পঙ্কে অভিসারে এনে রাধার প্রিয় হে
বাহিরে দিলে লাজ অসহ বিরহ, অন্তরে আনন্দ প্রেম রস দিও হে॥

২০৬

শ্রীরাধার গান

বঁধু আমার ভুবন ঘিরিল যখন ঘন বাদল ঝড়ে
কাঁদিয়া উঠিল মন প্রাণ অভিসারে আসিবার তরে।
(মোর মনে হলো কেহ নাই,
এই কৃষ্ণ আঁধার নিশীথে রাধার কৃষ্ণ ছাড়া কেহ নাই!)
বঁধু, দিনের আলোক পাই নাই খুঁজে, কাঁদিয়া ফিরেছি একা,
সব পথ যবে হারালো আঁধারে, তখন পাইনু দেখা!
হে পরম প্রিয়তম! বলো মোরে বলো
তব অভিসারে এসে সংসার-পথ চিরতরে শেষ হলো।
(যেমন আর ফিরে নাহি যাই,
তুমি ছাড়া তব রাধা নিরাধার হয়ে যায় — যেন আর ফিরে নাহি যাই!)
হে কিশোর বলেছিলে,
তুমি নিজেরে নিঙাড়ি আমারে মধুর রসময়ী রূপ দিলে!
বঁধু তাই জড়াইয়া ধরি
তুমি না ধরিলে সব রস মধু ধুলায় যায় যে ঝরি!
(বঁধু আনন্দ আর রয় না তখন
নিরানন্দ হয় ত্রিভুবন)
সব সাধ অবসাদে বিস্বাদ হয়,
(মূল) রস নাহি দিলে দেহ-তরু প্রেম-ফুল কি বাঁচিয়া রয়?
প্রিয়তম হে!
আর ভ্রমপথে ভ্রমিতে দিও না এই অভিসার শেষে
মোরে বক্ষে লুকায়ে রেখো হে
যদি খোঁজে ননদিনি এসে,
বলো, অভাগিনি রাধা যমুনার জলে ডুবিয়া গিয়াছে ভেসে।
(বলো, রাই আর নাই দেশে
নিরুদ্দেশের বিরহিণী গেছে হারায়ে নিরুদ্দেশে)।

২০৭
শ্রীরাধার গান

শোন মেঘ–ঘনশ্যাম ডাকে আমারে দিসনে লো পথে বাধা।
সখি বাধায় প্রেম–বিন্দু পড়িলে বাধা হয় অনুরাধা।
(পথের সব বাধা রাধার অনুসারিণী হয়, বাধা হয় অনুরাধা)।
তটিনী শুনেছে সাগরের আহ্বান, আর কে রাখিবে তারে,
মেঘ দেখে সুখে কদম্ব কেয়া ফুল না ফুটিয়া কি পারে?
কোটি কুসুম–শর অঙ্গ যার বরষে কি করিবে বারিধারা তার?
(নিতি) অসহ বিরহ–দাহনে জ্বলে যে, বজ্র তাহার মণি–হার!

(তার বিদ্যুতে কিবা ভয়
বিদ্যুৎ তার কৃষ্ণ দূতী বিদ্যুতে কিবা ভয়?
যে ঘরে পরে নিতি লোক–গঞ্জনা সয়
তার বিদ্যুতে কিবা ভয়?)
যার প্রেমের পথে বাধা বিধির অভিশাপ, সাপেরে সে ভয় করে না।
পথের শঙ্কটে কন্টকে সখি কৃষ্ণ প্রেমময়ী মরে না!
(যদি দেহ মরে যায়, বিদেহ প্রেম তার মরে না মরে না!)
সখি এইতো অভিসারের লগন!
গৃহতারা মেঘে মগন
রাধারে যেতে দেখিবে না কেহ
শ্যাম মেঘ হয়ে আবরিবে দেহ।
কৃষ্ণ প্রেম বৃষ্টি ধারায় নাইবি যদি চল
(দেখ) আকাশ–ভরা মোর বিরহীর আঁখি ছলছল।
(সে অভিমানে গলেছে
কেঁদে কেঁদে কার বিরহে অভিমানে গলেছে!
ঝড় হয়ে সে দুলেছে, বিজলি হয়ে জ্বলেছে—
অভিমানে গলেছে!)
চল মান ভাঙাব
আমার অভিমানীর মান ভাঙাব
এই বৃষ্টি হবে শেষ তার দেখব মধুর বেশ
ইন্দ্রধনুর রঙে সখি সজল আকাশ রাঙাব!

২০৮

ললিতার গান

রূপের পেখম খুলে ময়ূরীর প্রায়
(তোর) দেহ নব নীরদ পানে যেতে চায় !
কোনো বাধা মানে না,
(বিজলিরে দীপ ভাবে, বাধা মানে না !
বাদল গরজিলে মাদল ভাবে সে, বাধা মানে না !
পুব-হাওয়ারে কানুর বেণুকা ভাবে সে, বাধা মানে না !
রাধা চরণ-ধূলি দে !
যে প্রেমে সব বাধা হয় রাধার কিঙ্করী, সেই প্রেম দে লো !
আমি উপনদীর মতো লো
মিশিব তোর প্রেম-যমুনায় উপনদীর মতো লো,
তোর সাথে কৃষ্ণ সাগর-তীর্থে যাব
উপনদীর মতো লো)॥

২০৯

অভিমানিনী

গভীর ঘুম ঘোরে স্বপনে শ্যাম কিশোরে হেরে প্রেমময়ী রাধা।
রাধারে ত্যজিয়া আঁধার নিশীথে চন্দ্রার সাথে বাঁধা (শ্যামচাঁদ)।

যেন চাঁদের বুকে কলঙ্ক গো নির্মল শ্যাম চাঁদের বুকে চন্দ্রা যেন কলঙ্ক গো
অরুণ নয়ানে মলিন বয়ানে জাগিল অভিমানিনী
(ভাবে) রাধার হৃদয় আধার যাহার সে কেন ভজে কামিনী।
শ্রীরাধার মান, ভয়হীন তাই শ্রীরাধা অভিমানিনী
পরমশুদ্ধ প্রেম শ্রীরাধার, নির্ভয় অভিমানিনী।
কৃষ্ণকেও সে ভয় করে না, নির্ভয় অভিমানিনী রাধা বুঝতে নারে গো।
চির সরল অমৃতময় গরল কেন হয় বুঝতে নারে গো।
কাঁপে থরথর সারা কলেবর, ভাবে রাধা একি বিপরীত।
'প্রেম-ভিক্ষু' কহে, বুঝি বুঝিবার নহে চঞ্চল শ্যামের রীত॥

বোঝা যে যায় না চঞ্চল শ্যামের রীত
অবুঝ মনের বোঝা যায় না তাতে তবু কখন সে রাধার, কখন সে চন্দ্রার॥

২১০

অন্তর বাহির মোর যেখানে কৃষ্ণ চেয়ে সতৃষ্ণ চোখে
কালার সেই কালো ঢাকিয়া দে সখি পরম শুভ্র আলোকে।
কালো, দেখব না আর দেখব না
কালা দেখলে অঙ্গ জ্বালা করে
কালা দেখব না দেখব না।
সে থাকুক পরম সুখে, রাধা বাধা দেবে না
বুকে তার থাকুক চন্দ্রা।
ধ্যানমনা হব গভীর বনে যাব — হবো সেথা রজনীগন্ধা॥

২১১

সখির গান

হাসিয়া মরি রাই কৃষ্ণ শ্যাম নাই যাবি হেন কোন দেশে
সে যে সকল পান্থ দিগ দিগন্ত আগলি আছে শ্যাম বেশে॥
শুভ্র জ্যোতিরে ঘিরিয়া আছে দেখ
আকাশ হয়ে শ্যাম-লাবণি ;
অভিমানে ফিরে আসিলে হেরিবি নিম্নে শ্যামময় অবনি।
সবই শ্যামময় শ্যামময়
সবই কৃষ্ণময় কৃষ্ণময়
আলোর তৃষ্ণা শেষে হেরিবি সব দেশে—কৃষ্ণময় কৃষ্ণময়
ঊর্ধ্বে কৃষ্ণ নিম্নে কৃষ্ণ—কৃষ্ণময় কৃষ্ণময়।
(ওলো) গৌরী চাঁপার কলি, আর একটি কথা বলি
কৃষ্ণ ছেড়ে যাবি তুই কোথা
ভাস্বর জ্যোতি যিনি ভাসুর যে হন তিনি
বলরাম আলোর দেবতা
তুই ফিরে যে আসবি
শুভ্র জ্যোতি রূপে ভাসুরকে দেখে তুই ঘোমটা দিয়ে হাসবি
ফিরে যে আসবি।
সেই ঘোমটার আবরণে
আসিবে স্মরণে
ঘন শ্যাম বরণে সজনি
আসিবে ফিরে তোর মাধবী কুঞ্জে
সচন্দ্রা রজঃ নয়, সচন্দ্রা রজনি

রজঃগুণের ত্যজিয়া
নির্মল সুনীল চাঁদ আবার আসিবে ফিরে রাধা নাম ভজিয়া
রাধা প্রেমে মজিয়া।
বলবে, রাধা রাধা
তোমার প্রেমে আমি চির-বাঁধা—
রাধা ! রাধা
জয় রাধা ! রাধা ! !

২১২

কালো মেঘে কেন খেলে বিজলি
সোনার-প্রতিমার প্রতিবিম্ব কালো জলে
কালো মেঘে যেন খেলে বিজলি
হিরন্ময়ী জ্যোতির্ময়ী সতিনীর রূপ আমি যত দেখি গো
তত মজি (সখি গো)
অতি জ্যোতি গর্বিতা যেন পতি-সোহাগিণী
সতী সম কে ঐ সতিনী, ললিতে,
মোর শ্যাম অঙ্গে অপরূপ ভঙ্গে
আমার সমুখে করে খেলা, মোরে ছলিতে।
ওকি কায়া না ছায়া !
ওকি কৃষ্ণ রূপের চঞ্চল জল-তরঙ্গ মায়া ?
(ওকি কায়া না ছায়া) !
সখি মান ভাঙাতে মোর এসেছিল গোপনে
শ্যাম আজি প্রভাতে (সখি)
শ্যাম-তনুমুকুরে হেরিলাম বিরাজে
গৌর-বর্ণা নারী অপরূপ শোভাতে।
এলো অভিমানে মনে, তাই
মনে হলো যমুনায় ডুবিয়া ললিতা শান্তি যদি পাই।
এখানেও দেখি সেই গৌরী কিশোরী
আছে শ্যামে জড়ায়ে।
ওকি কায়া না মায়া
ওকি কৃষ্ণেরই রঙ্গ না আমারই ছায়া
কায়া না মায়া।
কোন দেশে যাব সখি কোন দেশে পাব শ্যামে একাকী
আন-নারীরে ছেড়ে কেবল আমার হয়ে দেবে দেখা কি॥

২১৩

ললিতার গান

দুর্জয় অভিমান ত্যজ ত্যজ রাধে
মুরলীধারী পায়ে ধরে সাধে॥
মানের গুণে তুই গুণময়ী হয়ে লো
ভুল দেখিস বুঝি সবই।
স্বচ্ছ শ্যাম তনু দর্পণে দেখিছিলি
রাধা আপনারই ছবি।
(সে যে ছায়া–রাধা
তারই আপনার মায়া
মহামায়াময়ী মায়া–রাধা।
সে যে ছায়া–রাধা॥)

এই বৃন্দাবন রূপ তোরই যে স্বরূপ
তোরই রূপ ললিতা বিশাখা
তুই সে পীতাম্বর কিশোরের বেণুকা
তুই বনমালা, তুই শিখি পাখা।
শ্যামের চরণে তুই নূপুর রুনুঝুনু
ভ্রমরী তুই তাঁর চরণ–কমলে
অরুণ–বর্ণা হয়ে তুই যে চন্দ্রা হস
ভুলাইলি মোরে কোন ছলে।
(আজ সব কথা বলব
তোর লীলার আজ সব কথা বলব।
হাটের মাঝে ভাঙব হাঁড়ি, সব কথা বলব।
তুই আপনি নাচিস কৃষ্ণে নাচাস
নাচাস গোপিনীদেরে — সব কথা বলব।
নিত্য প্রেমময়ী তুই নিত্য প্রেমময়ের সাথে খেলিস যে খেলা
(সবই জানি ব্রজ–রাণী–সবই জানি গো
তোর প্রেমের এক কণা পেয়ে, সবই জানি গো)
দিনে তুই কুণ্ঠিতা গুণ্ঠিতা কুলবধূ
নিশীথে নিলাজ সাথে নিলাজ খেলা
যেমন নিলাজ শ্যাম তেমনি নিলাজ তোর অপরূপ লীলা।
যে বুঝেছে তোর খেলা প্রেমে সে গলে গছে
যে বোঝেনি হয়ে আছে পাষাণ শিলা॥

২১৪
ভূমিকম্প

রসিক জ্যোতিষী করেছে গণনা
পৃথিবী টলিবে তেসরা মার্চ,
আল্লাহ, হরি, যিশুকে ডাকিছে
মসজিদ, মন্দির ও চার্চ।
ভয়ে আর কেহ রয় না বাড়িতে
লরিতে মোটরে ছ্যাকড়া গাড়িতে
বোঁচকা পোঁটলা হাঁড়িতে কুঁড়িতে
ছেলেতে মেয়েতে বুড়োতে বুড়িতে
কাঁপিতে কাঁপিতে রাত্রি যাপিতে
চলিছে সকলে গড়ের মাঠ।
কাছা কোঁচা খুলে বাঙালি ছুটিছে
গায়ের উড়ুনি ধুলায় লুটিছে
তারো আগে ছুটে লইয়া খাটিয়া
মাড়োয়ারি আর উড়িয়া ভাটিয়া
বাঙালির পায়ে হারাইয়া দিয়া
বন্ধ করিয়া দোকান পাট।
পগগড় খুলে বদন মেলিয়া
দোক্তা-খৈনি বটুয়া ফেলিয়া
ছুটিছে পথের ষাঁড়েরে ঠেলিয়া
তাঁরো আগে চলে ভুঁড়ি বিশাল।

১. অসম্পূর্ণ।

২১৫
আগমনী (কমিক)

সবাইকে তুই বর দিলি মা পাষাণ-রাজার ঝি !
(আমি) ভিড় ঠেলে যে যেতে নারি, বর পাব না কি ?
এই শিয়ালগুলোয় ভাঙা বেড়া কে দেখাল বল
কাছা খুলে ছুটছে যত আকাল হুড়োর দল !
দূরে থেকেই বলছি মাগো, (আঃ কি গণ্ডগোল !)

তুই কি শুনতে পাবি মাগো বাজছে যা ঢাক ঢোল
বেশি কিছু চাইনে আমি, চাইব নাকো যা তা,
মা ঘোল ঢালতে পারি যেন মুড়িয়ে দুখের মাথা।
(তোর) সিঙ্গিটাকে দে মা ছেড়ে এক মিনিটের তরে
আমার যত পাওনাদার মা — সব কটারে ধরে
ঠেসে গোটা কতক করে মেরে আসুক থাবা,
মনের সুখে বলব, 'বাপু, আর কি টাকা চাবা?'
ঐ খাঁড়াটা নিয়ে মা তোর করতে পারিস তাড়া
বাড়িওয়ালা যেই আসবে চাইতে বাড়ি ভাড়া?
(আমার) টাকার খাঁকতি নাই মা তেমন, বছরে দশ হাজার
মা ছড়িয়ে যদি দিস, ভাবব, ধন পেয়েছি রাজার।
ছেলে হবে জজ ম্যাজিস্টর, মেয়ে হবে রানী,
আমার যত শত্রু গিয়ে জেলে টানবে ঘানি!
রাত্রে যেমন কামড়ায় না ছারপোকা আর মশা,
আর দিনের বেলা সইতে পারি গায়ে মাছি বসা।
মা খাবার কথা বলি যদি ভাববি পেটুক ছেলে,
আমি ভাত না খেয়েও থাকতে পারি পোলাও লুচি পেলে!
মাছের মুড়ো, মাংসের ঝোল, পাঁচটা ভাজা ভুজ্যি,
হ্যাদে দ্যাখো দই সন্দেশ বলিনিক বুঝি?
দেখলি তো মা, খাওয়ার আমার ইচ্ছেই নেই মোটে,
পেটুক—বলে কলঙ্ক মোর তবু গেল রটে।
কাঁহাতক আর বেড়াই মাগো হেঁটে হটর হটর
পেট্রল যাতে খায় না, দিবি এমনি একটা মোটর।
জানিসত সন্ন্যাসী হবো আমি দুদিন পরে,
একটা কথা বলে রাখি রাখিস মনে করে —
তোর বৌমার বাকস ভরে গা ভরে দিস গয়না
পাঁচটা লোকে তোর নামে মা মন্দ যেন কয় না।
আমিও যুদ্ধ করতে পারি, তোরই তো মা ছেলে,
পারি অসুর দানব খেদিয়ে দিতে, ভুঁড়ি দিয়ে ঠেলে!
বলিস যদি, ল্যাং মেরে মা ফেলেও দিতে পারি,
তা কাঁদিয়ে মাকে আমি কি আর যুদ্ধে যেতে পারি?

নাতিপুতি রেখে মা গো একশ বছর পরে
মায়ার সংসার ছেড়ে না হয় যাব তোরই ক্রোড়ে !
আরো অনেক চাওয়ার ছিল দিলুম সে সব ছেঁড়ে
হেসে ফেলে বলবি হয়তো 'খোকা বড্ড একষেঁড়ে' !

২১৬
কমিক—বাউল

ওরে ভবের তাঁতি !
হরিনামের এঁড়ে গরু কিনিস নে।
তুই মূলে শেষে হাবাত হবি
ঠাকুরকে তুই চিনিস নে॥
রসিক ঠাকুরকে তুই চিনিস নে॥

তুই খাচ্ছিস বেশ ভবের তাঁত বুনে
চালিয়ে মাকু, ঘুরিয়ে টাকু, তাঁতের গান শুনে
সুখে খাবি আয়েশ পাবি
ঐ গরু কেনার টাকাতে তুই জরু আনার জিনিস নে॥

পরমার্থের কিনলে এঁড়ে, অর্থ যাবে ছেড়ে
তোর ঘাড়েরই লাঙল শেষে আসবে তোকে তেড়ে !
কুল যাবে তোর, যাবে জাতি মান
(এই গো-কুলের এঁড়ে এনে) যাবে জাতি মান,
দুঃখ অভাব শোক এসে তোর ধরবে রে দুই কান
শেষে কি কান খোয়াবি কানা হবি ভজে কানাই শ্রীকৃষ্ণ॥

শিল্পী : হরিদাস ব্যানার্জী।

২১৭

খাওজাইয়া খাওজাইয়া মরলাম
মা গো মা খোস পাঁচড়ায়।
যেন কাবলিওয়ালা হালুম বাঘা
কুত্তা মেকুর আঁচড়ায়॥

ইচ্ছা করে হালায় আমার এই যে দেহ খইস্যা
ধইর‍্যা একুরে শেষ কইর‍্যা দিই কইস্যা কইস্যা ঘইস্যা,
ময়লা কাপড় লইয়া ধোবি ঘাটে যেমন আছড়ায়॥

ফোট হইছে, গোট হইছে, অঙ্গে ধরছে পোক
ইন্দ্রের লাহান গায়ে যেন হইছে হাজার চোখ,
হ্যাঁচড় দিমু কি মাদার গাছে, বেত–বনে, গাছ–গাছড়ায়॥

আমার সারা গায়ে যেন বড়ি দিছে কোন আভাগ্যা বুড়ি,
পক্ষীর দল ঠোকরাইয়া খায়, আমি হাত–পা ছুড়ি,
প্যাচাঁ ভাইব্যা এক লাখ কাওয়া আমারে যেন খ্যাঁচরায়॥

২১৮
বাগেশ্রী-তেতালা

(ঠাকুর !) তেমনি আমি বাঘা তেঁতুল
(তুমি) যেমন বুনো ওল।
তোমার কূলের কথা (গোকুলের কথা) রটিয়ে দেবো
বাজিয়ে ঢাক ঢোল॥
বাজায়ে শ্রীখোল॥

কেঁদে হেঁই হেঁইয়ে যে করে, তার তরে তোমার প্রেম নেই
তুমি আয়ান ঘোষকে দেখা দিলে দেখলে লাঠি যেই
সেদিনও নদীয়াতে কলসি কানার এক ঘায়েতে
পাপ নিয়ে জগাই মাধাইএর দিলে তুমি কোল॥
বাজায়ে শ্রীখোল॥

(ঐ অগ্রদ্বীপে) ভোগ দিল না গোবিন্দ ঘোষ
তারে বাবা বলে করলে আপোস
বাগবাজারে ধমক খেয়ে
সাজলে তামাক মদনা হয়ে
বদলে ফেলে ভোল॥
ঠাকুর বাজিয়ে শ্রীখোল॥

ভাল চাওত শুনিয়ো নূপুর (রোজ) রাত্রি দুপুর কালে
মন্দিরে মোর নাই অধিকার এসো ঘরের চালে।
আমার ভাঙা কুঁড়ের চালে।

জান আমি ভীষণ গোঁয়ার
ধার ধারি না ভক্তি ধোঁয়ার
ধরব যেদিন বুঝবে ইয়ে,
চাঁচর কেশ মুড়িয়ে ঢালব মাথায় ঘোল॥

শিল্পী : হরিদাস ব্যানার্জী।

বি.দ্র. : 'নজরুল-রচনাবলী'র বর্তমান খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত 'অগ্রন্থিত গান'গুলোর বাণী সংকলিত হয়েছে ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'র তৃতীয় খণ্ড থেকে। তবে বাণীর পার্থক্য ও পাঠান্তর ক্ষেত্রে অনুসরণ ও সংশোধন করা হয়েছে প্রধানত নজরুল-সঙ্গীত গবেষক ও বিশেষজ্ঞ ডক্টর ব্রহ্মমোহন ঠাকুর সম্পাদিত ও কলকাতার 'হরফ' প্রকাশিত 'নজরুল-গীতি' অখণ্ড (২০০৪) এবং নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত ও রশিদ-উন-নবী সম্পাদিত 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' (২০০৬) গ্রন্থের অন্তর্গত বাণীর সঙ্গে মিলিয়ে।

২১৯

নহে ঝিঙে উচ্ছে নহে, নহে সে পটোল ব্রজের আলু॥
পিয়া হতে জনম তার (সে) পিয়াজ সুডৌল —
ব্রজের আলু॥

রসঘন রসুনের গন্ধভুত দাদা
রস কিছু কম হলে হতো আম-আদা,
আরো খানিক ডাগর হলে ওই হতো ওল
ব্রজের আলু॥

পরম বৈষ্ণব ও যে ফল-দল মাঝে
শিরে তাই চৈতন চুটকি বিরাজে
মাথাটি বাবাজি সম চাঁছা ছোলা গোল।
ব্রজের আলু॥

২২০

নাচিছে মোটকা পিলে-পটকা নাচে
নাচে বকনা নাচে বলদা হাঁ পেত্নী ভূতের নাতনি
ধেই ধেই ধেই ধেই ধেই ধেই ধেই ধেই শ্যাওড়া গাছে॥

নাচে পায়জামা মেমের মামা
নাচে মিস্টার সিস্টার মিসেস
ইতর বিশেষ যক্ষী পিচেশ যত আছে॥

(বৌ) রান্নাঘরে রান্না ফেলে শেখে নাচের ঢং
(দেয়) হলুদ বলে তরকারিতে মুখে মাখার রং।
বাঙালি সাত কোটি হলো সব নট নটী
বেচে সব ঘটি বাটি
নেড়ে ঠ্যাংটা আধা-ল্যাংটা নাচ শেখে শঙ্করের কাছে॥

টুইন। সুর : রঞ্জিত রায়। গোপাল।

২২১

শ্যালিকা-তালিকা

পাঁচমিশালি শালির পাল।
মাঝারি ও ছোট বড় মিশাল
আমড়া চালতা আম কাঁঠাল।

কেউ বিশালী মোটকিনী
কেউ নিকপিকে শুঁটকিনী
কেউ উড়িয়ানী কটকিনী
(কেউ) বাঁটকুলী কেউ লম্বা শাল॥

কেহ আসে বিনা চেষ্টাতে (ঐ বড় শালি)
কেহ জল যেন তেষ্টাতে (এই মেজো শালি)
কেহ বা মিষ্টি শেষ্টাতে (আরে সেজো শালি)
কারে দেখে হয় পস্তাতে (মোর ছোট শালি)
(ছুঁলে) খিমচিয়ে তোলে গায়ের ছাল॥

কেউ তেল পানা কেউ খসখসে
কেউ চিমসানো কেউ টসটসে
কেউ আঁট সাঁট কেউ থসথসে
কেউ টক কেউ কোশো কেউ বা ঝাল ॥

কাউকে দেখিয়া প্রাণ শুকায়
কাউকে দেখিয়া কান লুকায়
কাউকে দেখিয়া হায়রে হায়
তনু মন প্রাণ বেসামাল ॥[১]

---

১. এই হাসির গানটি অনেক পরিবর্তিত রূপে প্রকাশিত হয়েছে।

২২২

কমিক

বাপ ! তুর্কি-নাচন নাচিয়ে দিলে।
কোন অভাগা অঙ্ক-লক্ষ্মী নাম দিল
এই শঙ্খ চিলে ॥

এ দিন রাত্তির অঙ্ক কষে
পান হতে চুন কখন খসে,
স্ত্রী বলে আননু ঘরে
শাড়ি পরা কোন উকিলে ॥

প্রাণ-পাখি মোর খাঁচা-ছাড়া
(এই) ঝুলতি বেণির গুলতি ঢিলে
মাতঙ্গিনী মহিষিণী গুঁতিয়ে ফাটায়
পেটের পিলে ॥
যেমন বাঘ দেখে ছাগ ছুটে রে ভাই
তেমনি কাছা খুলে পালিয়ে বেড়াই
ওগো মাগো এসে রক্ষা করো
হালুম-বাঘায় ফেলল গিলে ॥

টুইন। সুর : আর আর। (সম্ভবত রঞ্জিত রায়)

২২৩

রাম-ছাগলে ও খোদার খাসিতে যুদ্ধ লেগেছে দাদা।
দেখত, ওদুটো ছাগল? না দুটো দামড়া এবং গাধা॥

দুটোই ন্যাজে ও গোবরে হয়েছে, দুইটারই শিং নাই,
(তবু) হুঁস নাই কারু মনে করে জোড়া সিংহ করি লড়াই,
(শিং নাই বলে, বলে সিংহ, সিংহ)
(এরা) না জানি করিত কি লড়ুই যদি গোঁজে না থাকিত বাঁধা॥

লেংচে কেন চলছি আমি জামায় কেন কাদা
দুঃখের সে কাহিনী মোর নাই শুনিলে দাদা॥

পাণ্ডুলিপিতে অসম্পূর্ণ। শিল্পী : হরিদাস ব্যানার্জী।

২২৪
মীরা!

জ্যোৎস্না সিক্ত ফাল্গুন-বন-পুষ্প ছানি
ভরেছ শিশির শশমহলে সে খোসবু আনি।
নাগ কেশরের ফণা-ঘেরা মউ করিয়া খালি
সাজায়েছ তব গন্ধ উতল 'প্রীতি'র ডালি।
গন্ধ নহে ও, ও যেন বিধুর মধুর স্মৃতি
প্রিয়া আর আমি-একা নদীতট-কানন বীথি।
নব যূথিকার প্রেম-ঘন বাস কাঁদায় মেঘে
'মানসী' এনেছে জুঁই কুঁড়ির সে সুরভি মেগে।
গন্ধে তাহার প্রিয়ার খোঁপার জুঁই মালিকা
মনে পড়ে, ঝরে বাদলের মেঘ, একা বালিকা।
'প্রেমগীতি' তব ঠুংরি গানের মতোই মিঠে
বাসর-নিশির প্রিয়ার মুখ-মদিরা ছিটে।
কেমনে আনিলের বন্দী করিয়া এ 'বনগীতি'
লাজুক বধূর যেন এ প্রথম প্রণয়-ভীতি।
লুকাইতে নারে বুকের গোপন গন্ধ-মধু
বনের বালিকা-'ষোড়শী'র মতো যাচে না বঁধু।

'রেশমি' অলক চূর্ণে মাখিয়া সুন্দরীরা
করিবে আলগ প্রেমের বাঁধন খোপার গিরা।
করিবে স্মরণ তোমারে নিখিল বন্দি হিয়া —
বেণির বাঁধন শিথিল করেছ 'রেশমি' দিয়া।
ওগো ফুলমালী মুগ্ধ প্রাণের অর্ঘ্য লহ ;
ঘরে ঘরে তব সুবাস বিলাক গন্ধ-বহ॥

[তথ্যের উৎস : 'মীরা' পুষ্পনির্যাস ও প্রসাধন দ্রব্যের বিজ্ঞাপন। 'দুন্দুভি', ২য় বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা, ৮ই আশ্বিন, ১৩৩৯। 'মীরা' : পুষ্প নির্যাস ও প্রসাধন দ্রব্য প্রস্তুতকারক ; হেড অফিস : ১১ নং ক্লাইভ রো কলকাতা। কারখানা : ১১/এ এ প্রিন্স আনোয়ার শা রোড, কলকাতা।]

২২৫

ভারতী আরতি

বন্দনা-বাণী ধ্বনিছে নিখিল বিশ্ব-কোবিদ কণ্ঠময়
জয় বীণাপাণি মরাল-বাহিনী জয় মা জননী জয় মা জয়।
বীণা বিধাত্রী সিদ্ধিধাত্রী মানস-তামস-নাশিনী মা !
আলস নাশিনী মুরজ-ভাষিণী মূঢ়-জড়-রিপু তোষিণী মা !
মা তোর পরশে গগন বীণায় তারার রাগিণী কাঁপিয়া বয়
জয় বীণাপাণি বীণা-বিহারিণী জয় মা জননী জয় মা জয় !
চরণ নিম্নে বিকশে কমল, সুর সুরধুনী বহিয়া যায়
বিশ্বের যত লক্ষ্মীছাড়া মা নিঃস্ব কবির বন্দনায়।
ক্লিষ্ট কণ্ঠে বেদনানন্দ বাজিছে আকাশ বাতাসময় —
জয় জয় শুভ শতদল-দল বাসিনী জননী জয় মা জয় !
উর মা শারদা আকাশ কাঁপানো ঝঙ্কারে তব ভরিয়া দিক
আগুনের রাগে রাঙিল ফাগুন, উদাসী দোয়েল পাপিয়া পিক
বিহগ-কণ্ঠে বেহাগে লুণ্ঠে তব আগমনি অশ্রুময়
জয় বীণাপাণি মরাল-বাহিনী জয় মা জননী জয় মা জয় !
হুতাশে না আজ হতাশ বাতাস পুরবীর বায়ে ঝরে না লোর
উষীর সিক্ত দখিনা সমীর ঢুলায় চামর মাতা গো তোর।
নিবিড় নীলে মা সাজায়ে পথটি গাহিছে প্রণত দিগ্বলয়
জয় বীণাপাণি মরাল বাহিনী জয় মা জননী জয় মা জয়।
সুদূর আকাশ অচপল-আঁখি আনত তোমার চাহিয়া পথ
উদয় না সে মা, অস্ত-তোরণে উদিবে তোমার পুষ্পরথ ?

বন বালাদল কচি কিশলয়ে সাজিয়া দুলিয়া দুলিয়া কয়
জয় বীণাপাণি মরাল বাহিনী জয় মা জননী জয় মা জয়।
লক্ষ্মী মায়ের লক্ষ্মী ছেলেরা নয় গো মা তোর পূজারি আজ
তাপস ছেলে মা আমরা এসেছি গৈরিক রাঙা পরিয়া সাজ॥
ব্যথা পাণ্ডুর শীর্ণ গণ্ড বাহিয়া সুখের অশ্রু বয়
জয় বীণাপানি মরাল বাহিনী জয় মা জননী জয় মা জয়।
অঞ্জলি ভরা আমের নবীন মঞ্জরি দিয়ে ভরেছি থাল,
মঙ্গলঘটে দুখলোর ধারা, দীর্ণ হিয়ার ছিন্ন ডাল।
রোদনে যদিও বোধন মা তোর মার কাছে নাই লজ্জা ভয়
জয় বীণাপাণি বীণা-বিহারিণী তাপস জননী জয় মা জয়॥

[তথ্যের উৎস : 'অলকা' ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা চৈত্র, ১৩২৮।]

কাব্যগীতি

২২৬

আজি আকাশ মধুর বাতাস মধুর
মধুর গানের সুর
আজি ভুবন লাগে মধুর।
পরানের কাছে যেন আসিয়াছে
হারানো প্রিয়া সুদূর।
এ কি মাধুরী জড়িত লতায় পাতায়
যাহা হেরি তাই পরান মাতায়
অবনি ভরিয়া ঝরিছে লাবণি মাধুরীতে ভরপুর।
আগেও ফুটেছে এ গাঁয়ের মাঠে পথপাশে ভাঁটফুল
এই পথ বেয়ে জলে যেত বধূ পিঠভরা এলোচুল।
আজ মনে হয় নতুন সকলি
মধুময় লাগে বিহগ কাকলি
আজি অকারণ নেচে ফেরে মন যেন বনের ময়ূর॥

[হিজ, ডিসেম্বর, ১৯৩৬ ; গিরীন চক্রবর্তী ; এন. ৯৮২১। রেকর্ড লেবেলে মুদ্রিত 'কথা : কাজী নজরুল']

২২৭

আমি গত জনমে হে প্রিয়
যত কথা বলেছিনু তব কাছে
ফুল হয়ে সেই কথা আজ পৃথিবীতে ফুটিয়াছে॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া যত আঁখি মম
নিভিয়া গিয়াছে ওগো প্রিয়তম
তারা হয়ে সেই আঁখিগুলি মোর
তব পথ চেয়ে আছে॥
যত দীপ জ্বেলে নিশি জেগেছিনু
একা বাতায়ন তলে
কমল কুমুদ হয়ে সেই দীপ
ফুটেছে সায়র জলে ;
চকোরিণী হয়ে অপূর্ণ সাধ
আজো কেঁদে যায় ওগো মোর চাঁদ
চাতকিনি হয়ে আজো মোর প্রাণ
তৃষ্ণার জল যাচে॥

['কমল দাশগুপ্তের কথা' : আসাদুল হক, নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, বাংলাদেশ, ভাদ্র, ১৩৯৪]

২২৮

আমি হবো মাটির বুকে ফুল
প্রভাত বেলা হয়তো পাব তোমার চরণ মূল।
ঠাঁই পাব গো তোমার থালায়
রইব তোমার গলার মালায়
সুগন্ধ মোর মিলবে হাওয়ায়
আনন্দ আকুল॥
আমারি রঙে রঙিন হবে বন
পাখির কণ্ঠে আনব আমি
গানের হরষণ ;
নাই যদি নাও তোমার গলে
তোমার পূজা বেদীতলে
শুকাব গো সেই হবে মোর
মরণ অতুল॥

[টুইন, সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮। শিল্পী : কুমারী কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়। এফ. টি. ১২৫৩০]

২২৯

আয় ছুটে আয় চোখের বালি চিঠি এসেছে।
খামের উপর অদেখা কার মুখ ভেসেছে।
চিঠির গায়ে আতর মাখা
দায় হলো সই সামলে থাকা
প্রাণের কথা কয়ে নিঠুর পরান ফেঁসেছে।
জলছবিতে পাখনা মেলা পায়রা আঁকা তায়।
সত্যি তাতে লেখা লো সই 'ভুলো না আমায়।'
পরানপ্রিয় পাঠায় লিপি
কয় 'খোলো সই প্রাণের ছিপি'
প্রাণ দিয়ে সই সেই তো মোরে ভালোবেসেছে।

[টুইন, জানুয়ারি, ১৯৩৬, মিস আমোদিনী, এফ. টি. ৪১৭৯]

২৩০

আশা নিরাশায় দিন কেটে যায়
হে প্রিয় কবে আসিবে?
প্রতি নিশ্বাসে নয়ন প্রদীপ
মোর আসিছে নিভে।।
ফুল ঝরে যায় হায়, পুন ফুল ফোটে
কৃষ্ণাতিথির শেষে চাঁদ হেসে ওঠে
আমারি নিশীথের অসীম আঁধার
ওগো চাঁদ কবে নাশিবে?
শীত যায় মনোবনে ফাল্গুন আসে গো
আসিল না আমারই ফাল্গুন
চাঁদের কিরণে পৃথিবী শীতল হয়
মোর বুকে জ্বালে সে আগুন।।
নিশীথে বকুল শাখে
পিয়া পিয়া পাপিয়া ডাকে
আমারই প্রিয়তম 'জাগো পিয়া'
বলে কবে ডাকিবে?

[টুইন, মে, ১৯৪৬, শিল্পী গীতশ্রী গৌরী চট্টোপাধ্যায়, এফ. টি. ১৩৯৯২ ; সুর চিত্ত রায়]

২৩১

উঠেছে কি চাঁদ সাঁঝ গগনে
আজিকে আমার বিদায় লগনে
জানালা পাশে চাঁপার শাখে
'বউ কথা কও' পাখি কি ডাকে ?
ফুটেছে কি ফুল মালতী বকুল
আমার সাধের কুসুম বনে
সাঁঝ গগনে।
তুলসী তলায় জ্বলছে কি দীপ
পরেছে আকাশ তারকার টিপ ?
হারিয়ে যাওয়া বঁধু অবেলায়
এলো কি ফিরে দেখিতে আমায়
ঝুরিছে বাঁশি পিলু বারোয়াঁয়
কেন গো আমার যাবার ক্ষণে।

[রেকর্ড নং : এফ. টি. ৩০৮০ ; শিল্পী : মিস লীলা ; এপ্রিল, ১৯৩৪]

২৩২

ওকে কলসি ভাসায়ে জলে আনমনে।
তীরে বসে কি ভাবে আর ঢেউ গনে॥
নিয়ে শিথিল আঁচল খেলে উতল সমীর
তার আলতা পায়ের মুছে নেয় নদী নীর
খুলে কবরী জড়ায় হাতের কাঁকনে॥
সে জলকে আসার ছলে নদী তীরে
শুধু ওপার পানে চাহে ফিরে ফিরে
খুলে পায়ের নূপুর ফেলে দেয় সে নীরে
আসে ঘরে ফিরে নিয়ে জল নয়নে॥

[নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা]

২৩৩

একেলা ঢুলিয়া ঢুলিয়া কে যায়
চলিতে চরণ চরণে জড়ায়॥
এখনো ভাঙেনি মল্লিকার ঘুম
এখনো অমলিন কবরী কুসুম

নয়নে নিশির ঝরেনি শিশির
বিহগ পাখায় বিহগী ঘুমায়॥
অভিসার নিশি বৃথাই জাগি কোথা
অভিমানিনী চলে মূর্তিমতী ব্যথা।
ভীরু চকিত চোখে করুণ কাতরতা
রবি না ওঠে যেন মিনতি জানায়॥

[গীতিগ্রন্থ — গানের মালা]

২৩৪

কেঁদে কেঁদে নিশি হলো ভোর
মিটিল না সাধ উঠিল না চাঁদ
ফিরিল কেঁদে চকোর॥
শিয়রে দীপ নিভিয়া আসে
ভোরের বাতাস কাঁদে হতাশে
মালার ফুল ঝরে নিরাশে
যেন মোর আঁখি লোর॥
আমার নয়নে নয়ন রাখি
চাহে শুকতারা ছলছল আঁখি
পাপিয়ার সনে পিয়া পিয়া ডাকি
এসো এসো চিতচোর।

[নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা]

২৩৫

ঐ চলে তরুণী গোরী গরবী।
ডাকে দূর পারাবার ডাকে তারে বন পার
লালসে ঝরে তার পায় রাঙা করবী॥
চলে বালা দুলে দুলে
এলো খোঁপা পড়ে খুলে
চাহে ভ্রমর কুসুম ভুলে
তনুর আর সুরভি॥

নাচের ছন্দে দোলে
টলে তার চরণ চটুল
হরিণী চায় পথ বেভুল
মায়া লোক বিহারিণী
রচি চলে ছায়াছবি ॥

[নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। তথ্যের অন্য উৎস : আব্বাহারউদ্দীন তালিকা।]

২৩৬

এলো শারদশ্রী কাশ-কুসুম-বসনা
রসলোক বাসিনী
লয়ে ভাদরের নদী সম রূপের ঢেউ
মৃদু মধু হাসিনী ॥
যেন কৃশাঙ্গী তপতী তপস্যা শেষে
সুন্দর বর পেয়ে হাসে প্রেমাবেশে
আমন ধানের শীষে মন ভোলানো
কোন কথা কয় সে মঞ্জুল-ভাষিণী।
শিশির স্নিগ্ধ চাঁদের কিরণ
ওকি উত্তরী তার
অরণ্য কুন্তলে খদ্যোত মণিকা
মালতীর হার।
তার আননের আবছায়া শতদলে দোলে
হংসধ্বনিতে মায়া মঞ্জীর বোলে

সে আনন্দ এনে কেঁদে চলে যায় বিজয়ায়
বেদনার বেদবতী সন্ন্যাসিনী ॥

[তথ্যের উৎস : বেতার জগৎ, ১লা নভেম্বর, ১৯৪১ ; 'শারদশ্রী' গীতি আলেখ্যের প্রথম গান ; গীতি আলেখ্যটি বেতারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৩.৯.৪১ তারিখে]

২৩৭

ও বৌদি তোর কি হয়েছে চোখে কেন জল ?
দাদার তরে মন বুঝি তোর হয়েছে উতল ॥

তোর দিব্যি, দেখেছি স্বপনে
যেন দাদা কথা কইছে সে তোর সনে।
দেখিস এবার আমার স্বপন হবে না বিফল।।
তোর কান্নার সাগরে যখন উঠেছে জোয়ার
বৌদি লো ! তোর চাঁদ উঠিবার নাইরে দেরি আর।
ও বৌদি তোর চোখের জলের টানে
আমার দাদার সোনার তরী আসছে সে উজানে।
(দেখ্) বাটনা ফেলে হাসছে দিদি চল ও ঘরে চল।।

[রেকর্ড লেবেলে মুদ্রিত — 'কথা : কাজী নজরুল' ; এছাড়াও তথ্যের উৎস : এইচ. এম. ভি. রয়্যালটি রেজিস্টার ; টুইন, ১৯৪৩ ; শিল্পী : বেলা রাণী ; এফ. টি. ১৩৮৭ ; সুর : চিত্ত রায় ; নৃত্য সম্বলিত]

২৩৮

ওগো ও আমার কালো
গহন বনের বুকের মাঝে জ্বালাও তুমি আলো।
কাজলা মেঘের অন্তরালে তোমার রূপের মানিক জ্বলে
আমার কালো মনের তলে জ্বালাও তুমি আলো।
একলা বসে দিন যে না মোর কাটে
কইতে কথা বুক যে আমার ফাটে,
আঁধার যখন আসবে ঘিরে জ্বালবে তুমি আলো।।

[টুইন, জুলাই, ১৯৩৬ ; শিল্পী : সমর রায় ; এফ. টি. ৪৪৭৫।]

২৩৯

ও তুই কারে দেখে ঘোমটা দিলি (ও) নতুন বৌ বল গো ?
তুই উঠলি রেঙে যেন পাকা কামরাঙার ফল গো।
তোর মন আই ঢাই কি দেখে কে জানে
তুই চুন বলে দিস হলুদ বাটা পানে ;
তুই লাল নটে শাক ভেবে কুটিস শাড়ির আঁচল গো।।

তুই এ ঘর যেতে ও ঘরে যাস্ পায়ে বাধে পা,
ও বউ ! তোর রঙ্গ দেখে হাসছে ননদ জা।
তুই দিন থাকিতে পিদিম জ্বালিস ঘরে,
ওলো রাত আসিবে আরো অনেক পরে।
কেন ভাতের হাঁড়ি মনে করে, উনুনে দিস জল গো॥

[তথ্যের উৎস : রেকর্ড লেবেল ও এইচ. এম. ভি. রয়্যালটি রেজিস্টার ; টুইন, ১৯৪৩ ; শিল্পী : বেলা রাণী ; এফ. টি. ১৩৮৮৭ ; সুর : চিত্ত রায় ; নৃত্য সম্বলিত।]

২৪০

ওগো পিয়া তব অকরুণ ভালোবাসা
অন্তরে দিল বিপুল বিরহ, কবিতায় দিল ভাষা॥
মোর গানে দিল সুর করুণ ব্যথা বিধুর
বাণীতে দিল সুদূর স্বর্গের পিপাসা॥
তুমি ভালো করিয়াছ ভালোবাস নাই মোরে
রাখ নাই ধরে আমারে তোমার করে।
মম বিরহের বেদনাতে তাই ত্রিভুবন কাঁদে সাথে
ভুলেছি সবারে চেয়ে তোমারে পাবার আশা॥

[হিজ. নভেম্বর, ১৯৩৫ ; শিল্পী : গোপাল সেন ; এন. ৭৪৩৩ ; আধুনিক।]

২৪১

কনে তুই চোখ তুলে দেখ বরের পানে।
সে তোরে বিঁধবে বুঝি সোহাগ ভরা নয়ন বাণে॥
কত খেলবি খেলা দুজনে
কইবি কথা নীরব রেতে মধুর কূজনে
হিয়ায় তোমার যে গান আছে
গাইবি সে গান কানে কানে॥

[মীরাবাঈ রেকর্ড নাটিকা ; এন. ৭১৪৩ — ৭১৫৪ ; রাজপুত রমণীদের মঙ্গল গীত।]

২৪২

কদম কেশর পড়ল ঝরি
তখন তুমি এলে।
বাদল মেঘে গগন ঘেরি
ঝড়ের কেতন মেলে।
ঝরিয়ে বন কেয়ার রেণু
বজ্ররবে বাজিয়ে বেণু
বৃষ্টি ভেজা দূর্বাদলে
অরুণ চরণ ফেলে।
নদীর দুকূল ভাঙল যবে
অধীর স্রোতের জলে
তখন দেখি হে অশান্ত
তোমার তরী চলে।
যূথীর নীরব অশ্রু ঝরে
শ্যামল তোমার চরণ পরে,
আকাশ চাহে তোমার পথে
তড়িৎ প্রদীপ জ্বেলে॥

[টুইন, জুলাই, ১৯৩৬ ; শিল্পী : কুমারী গীতা বসু, এফ. টি. ৪৪৭১ ; সুর : নজরুল ; আধুনিক।]

২৪৩

কে তুমি এলে হেলে দুলে।
প্রাণের গাঙে লহর তুলে॥
তোমার চটুল চরণ ছন্দে
মন ময়ূর নাচে আনন্দে
ঝরে ফুলদল বেণীর বন্ধে
মেঘের মাধুরী এলোচুলে।
আমার গানে আমার সুরে
প্রাণে আনে তব নূপুরে
রূপ তরঙ্গ খেলিছে রঙ্গে
ব্যাকুল তনুর কূলে কূলে॥

[নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ; খাম্বাজ দাদরা]

২৪৪

কে নিবি মালিকা এ মধু যামিনী
আয় লো যুবতী কুল কামিনী॥
আমার বেলফুলের মালা গুণ জানে গো
পরবাসী বঁধুরে ঘরে আনে গো
আমার মালার মায়ার ভালোবাসা পায়
কেঁদে কাটায় রাতি যে অভিমানী॥
আমি রূপের দেশের মায়া পরী
আমার মালার গুণে কুরূপা যে সে হয় সুন্দরী।
যে চঞ্চলে অঞ্চলে বাঁধিতে চায়
যার নিঠুর বঁধু সদা পালিয়ে বেড়ায়
আমার মালার মোহে ঘরে রহে সে
ফোটে মলিন মুখে হাসির সৌদামিনী॥

[রেকর্ড লেবেলে মুদ্রিত — 'কথা : কাজী নজরুল' ; হিজ, নভেম্বর, ১৯৩৬, শিল্পী : মিস হরিমতী ; এন. ৭৭৯৯।]

২৪৫

কেন চঞ্চল অঞ্চল দুলিয়া ওঠে রহি রহি
মুহু মুহু কুহু কুহু কুহু যে কহে এলে কে বিরহী
কেন নূপুর বেজে ওঠে ছন্দে
দোলা লাগে অঙ্গে আনন্দে
দখিন হাওয়া কেন অধীর হলো হেন
কুসুমের কানে যায় কি কথা কহি॥

[তথ্যের উৎস : নিতাই ঘটকের খাতা]

২৪৬

কেন বারে বারে আমি এসে
ফিরে যাই তাহারি দুয়ারে।
পাষাণ ভাঙ্গিয়া বহিবে গো কবে
নির্ঝর শত ধারে॥

পাষাণে গঠিত দেবতা বলিয়া
গলে না হিয়া হায়,
বৃথা বেদীতলে কুসুম শুকায়
দেউল আঁধারে॥

[তথ্যের উৎস : নাচঘর, ৯ই পৌষ, ১৩৩৮ ; 'আলেয়া' নাটকের গান]

২৪৭

গলে টগর মালা কাদের ডাগর মেয়ে।
যেন রূপের সাগর চলে উজান বেয়ে॥
তার সুডোল তনু নিটোল বাহুর পরে
চাঁদের আলো যেন পিছলে পড়ে
ও কি বিজলি পরী এলো মেঘ পাসরি
চাঁদ ভুলে যায় লোকে তার নয়নে চেয়ে॥
যেন রূপকথার দেশে সে রাজকুমারী
রামধনুর রং ঝরে অঙ্গে তারি
মদন রতি করে তার আরতি
তার রূপের মায়া দুলে ভুবন ছেয়ে॥

[তথ্যের উৎস : রেকর্ড লেবেল ও রয়্যালটি রেজিস্টার ; হিজ, নভেম্বর, ১৯৩৫ ; শিল্পী : মিস অনিমা (বাদল) ; এম. ৭৪৩০]

২৪৮

গ্রামের শেষের মাঠের পথে গান গেয়ে কে যায়
একা বাউল আনমনা।
তার সুরে সবুজ ধানের ক্ষেতে ঢেউ খেলিয়া যায়
গায় সাথে চপল ঝরনা॥
চলে নূপুর মুখর পায়
সুর বাজিয়ে একতারায়
তাথৈ তাথৈ হাততালি দেয় সাথে তালবনা॥
শান্ত নদীর কূলে
হঠাৎ জোয়ার উঠে দুলে
বালুচরে চমকে চখা চাহে নয়ন তুলে।

ওঠে রেঙে আকাশ কোল
লাগে শাখায় শাখায় দোল লাগে দোল
মনের মাঝে এঁকে সে যায় সুরের আলপনা॥

[নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।]

২৪৯

গোলাপ গুলের পিয়ালাতে
সুরভি শরাব ঝরে চাঁদিনিরাতে॥
চামেলি ফুলের আতর মাখি
বিলাসী বুলবুল কহিছে ডাকি।
প্রেমাবেশে কার আজ ঢুলুঢুলু আঁখি
কণ্টক ফোটে কার ফুল বিছানাতে।

[তথ্যের উৎস : দুর্গাদাস চক্রবর্তীর খাতা]

২৫০

চাঁদের নেশা লেগে ঢুলে নিশীথিনী
মদির হাওয়ার তালে নাচন লাগে ডালে ডালে
ঝিল্লি নূপুর পরি পায় নাচে কানন বিহারিণী॥
নেশার ঘোর লাগে বনে পাপিয়া জাগে
'চোখ গেল চোখ গেল' গেয়ে ওঠে গুল বাগে
একেলা বাতায়নে হায় জাগে বিরহিণী॥
মহুয়া বকুল ফুলে মদির সুবাস ঘনায়
চাঁদের ওই মুখ মদের ছিটে লাগে কনক চাঁপায়।
শান্ত হৃদয় মম দুলিছে সাগর সম
এমন রাতে সে কোথায় আমি যার অনুরাগিণী॥

[তথ্যের উৎস : আজাহারউদ্দীন তালিকা ও রয়্যালটি রেজিস্টার। হিজ, মে, ১৯৩৪। শিল্পী : মিস অনিমা (বাদল)। এন. ৭২২৬।]

২৫১

জানি পাব না তোমায় হে প্রিয় আমার
এ জীবনে আর।
এ আমার ললাট লেখা
আমি রব চির একা
নিমেষের দিয়ে দেখা
কাঁদাবে আবার॥
তবু হে জীবন স্বামী
তোমারি আশায় আমি
আসিব এ ধরণিতে
যুগে যুগে অনিবার॥

[তথ্যের উৎস : রেকর্ড লেবেল। টুইন, ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭। শিল্পী : পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য। এফ. টি. ৪৭৭৭। মনোরঞ্জনী — আদ্ধা কাওয়ালি ঠুংরি।]

২৫২

(কার) ঝর ঝর বর্ষণ বাণী
যায় দিক দিগন্তে বেদনা হানি॥
করুণ সুরে দূর অলকায়
যেন অবিরল বীণা বাজায়
বিরহের বীণাপাণি॥
গীত পিপাসিতা বসুন্ধরা
শোনে সেই সুর প্রাণ উদাস করা
তারি ভাষায় বেদনা আভাস
কাঁদায় ভুবন আকাশ বাতাস
পথ প্রান্তর বনানি॥

[তথ্যের উৎস : আজাহারউদ্দীন তালিকা ও কোম্পানির রেজিস্টার। টুইন, আগস্ট, ১৯৩৫। শিল্পী : কুমারী গীতা বসু। এফ. টি. ৪০৩১।]

২৫৩

তাহারি ছবিটি গোপনে আঁকিয়া
যতনে রাখি এ হিয়ায়।
তাহারি লাগি জ্বালিয়া প্রদীপ
জ্বলিব তাহারি শিখায়।

নিশি পোহায় জাগরণে হায়
চঞ্চল আঁখি তবু তারে চায়।
দোল দিয়ে যায় ভোরের হাওয়ায়
আমারি মরণ দোলায়॥
ছিনু একেলা ছিল না জ্বালা
খেলিলাম নতুন খেলা
মিলিল সাথি অনেক দ্বারে
চিরতরে হেলা ফেলা।
কেন এ খেলার ছল করে হায়
ছলিয়া গেল গো আমায়॥

[টুইন, অক্টোবর, ১৯৩৪। শিল্পী : মাস্টার কমল (কমল দাশগুপ্ত)। এফ. টি. ৩৪৩৮।]

২৫৪

তোমারে চেয়েছি কত যুগ যুগ ধরি প্রিয়া
এসেছি তাই ফিরে পুন পথিকের প্রীতি নিয়া।
তোমার নয়নে তাই চাহি ফিরে ফিরে
হের তব ছবি প্রিয় মোর আঁখি নীরে।
কত জনম শেষে এসেছি ধরণি তীরে
কার অভিশাপে ছিনু হায় চির পাশরিয়া॥
আরো প্রিয় আরো হাতে এ নব বাসর রাতে
যেয়ো না স্বপনসম মিশায়ে নিশীথ প্রাতে।
তারার দীপালি জ্বলে হের গো গগন তলে
হের শুক্লা একাদশী চাঁদের তরণি দোলে
মোদের মিলন হেরি নিখিল ওঠে দুলিয়া॥

[টুইন, ডিসেম্বর, ১৯৩২। শিল্পী : ধীরেন দাস ও মানিকমালা। এফ. টি. ২৩২২।]

২৫৫

তোমার বীণার মূর্ছনাতে বাজাও আমার বাঁশি
তোমার সুরে শোনাও আমার গানের আধেকখানি॥

শুনব শুধু তোমার কথা
এবার আমার নীরবতা
আমার সুরের ছবি আঁকুক
তোমার পদ্মপাণি॥

[টুইন, অক্টোবর, ১৯৩৫। শিল্পী : সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়। এফ. টি. ৪১০৬।]

২৫৬

তোমায় দেখি নিতুই চেয়ে চেয়ে
ওগো অচেনা বিদেশি নেয়ে।
যেতে এই পথে তরী বেয়ে
দেখি নদীর ধারে তোমায় বারে বারে
সজল কাজল বরনী মেয়ে।
তোমার তরণীর আসার আশায়
বসে থাকি কূলে কলস ভেসে যায়
তুমি পর যে শাড়ি ভিন গাঁয়ের নারী
আমি নাও বেয়ে যাই তারি সারি গান গেয়ে।
গাগরির গলায় মালা জড়ায়ে
দিই তোমার তরে বঁধু স্রোতে ভাসায়ে
সেই মালা চাহি নিতি এই পথে গো আমি তরী বাহি।
মোরা এক তরীতে এক নদীর স্রোতে
যাব অকূলে বেয়ে॥

[টুইন, জানুয়ারি, ১৯৩৬, ইন্দু সেন ও মিস রেণুবালা, এফ. টি. ৪২১৫। তথ্যের উৎস : আজাহারউদ্দীন তালিকা।]

২৫৭

নিশিদিন তব ডাক শুনিয়াছি মনে মনে
শ্রবণে শুনিনি আহ্বান তব পবনে শুনেছি বনে বনে।
হে বিরহী তব বিরহ আভাস পাণ্ডুর করেছে আমার আকাশ
বিজনে তোমার করিয়াছি ধ্যান শুধায়ে ফিরিনি জনে জনে।

সকলে যখন ঘুমায়ে পড়েছে আধ রাতে
স্মৃতি মঞ্জুষা খুলিয়া দেখেছি নিরালাতে
যদি তব ছবি ম্লান হয়ে যায়
অশ্রু সলিলে ধুয়ে রাখি তায়
দেবতা তোমারে এ মৌন পূজায়
নীরবে ধেয়াই নিরজনে।

[টুইন, আগস্ট, ১৯৩৫। শিল্পী : কু: সান্ত্বনা সেন। এফ. টি. ৪০৩৩। সুর : নজরুল।]

২৫৮

পিও পিও হে প্রিয় শরাব পিও।
চোখে রঙের নেশা লেগে সব অবসাদ
হোক রমণীয়।
জীবনের নহবতে বাজুক সানাই
আঁধার দুনিয়ায় জ্বলুক রোশনাই
(আজি) আবছা আলোয় যারে লাগবে ভালো
তারি গলায় চাঁদের মালা পরায়ে দিও।
(আজি) লেগে অনুরাগ রঙ শিরাজীর
প্রাণে প্রাণে লহর বহুক রস নদীর
সেই মধুর ক্ষণে বঁধু নিরজনে
ভালোবাসি দুটি কথা মোরে বলিও॥

[তথ্যের উৎস : রেকর্ড লেবেল ও এইচ. এম. ভি. কোম্পানির রয়্যালটি রেজিস্টার। টুইন, এপ্রিল, ১৯৩৮। শিল্পী : মিস রাধারানী। এফ. টি. ১২৩৫১। সুরসঙ্গত : রঞ্জিৎ রায়।]

২৫৯

প্রাণের কথা বলব কারে সই
পিয়া বিনু ম্যায় ভৈন কাহিকা
জনম দুঃখিনী মিলন পিয়াসী
ছোড় চ্যালা আর রতন ইহাকা।
যোগিনী হয়ে আমি বনে বনে ফিরি
ম্যায়া তেরে যৌবনকা ধুম সুন কর।

অনলে পুড়িনু সই তারে ভালোবেসে
নাম না লেভে ক্যভি বাফাকা
পায়ে ধরি তোর বলে দে উপায়
জিসসে আপনে পিয়াকো দেখুঁ
যার লাগি আমি হইনু যোগিনী
উয়ো মেরা প্যেয়ারা নেই আদাকা।
মালা করে যদি কণ্ঠে নাহি লয়
নাহি তো জিনেসে ম্যরহি যাঁউ
এসো এসো মোর আব্‌রার পেয়ার
খুলা সাজনা চামন সবাকা॥

[টুইন, জানুয়ারি, ১৯৩৬। শিল্পী : মিস আমোদিনী। এফ. টি. ৪১৭৯ হাল্কা সুরের গান। তথ্যের উৎস : এইচ. এম. ভি. কোম্পানির রেজিস্টার।]

২৬০

(মম) প্রাণ নিয়ে নিঠুর খেল এ কি খেলা (হায়)।
ক্ষণে ভালোবাসা হায় ক্ষণে অবহেলা।
সকালে গাঁথিয়া মালা
পায়ে দল বিকালে তায়।
তেমনি দলিতে চাহ
আমার পরান কি হায়।
সহিতে পারি না আর এই হেলাফেলা।
জলরূপী একি কোন মরীচিকা তুমি কি গো।
ডেকে এনে মরুভূমে বধিবে এ বনমৃগ।
বুঝিয়াছি কখন হায় ফুরায়েছে বেলা।

[টুইন, মে, ১৯৩৪। মিস উষা রানী। এফ. টি. ৩৩০৫। তথ্যের উৎস এইচ. এম. ভি. কোম্পানির রেজিস্টার।]

২৬১

প্রিয়তম এসো ফিরে
রহিবে কি দূরে দূরে
ভুলি মোরে চিরতরে
ভাসাইয়া আঁখি নীরে।

আছি বসে পথ চেয়ে
আঁধার এলো যে ছেয়ে
মনের বনের ছায়ে
এসো মিলন মধুর সুরে।।
নয়নের মণিহারা
নিভে গেছে শুকতারা
ভেসে আসে কালো মেঘ
আমার গগন ঘিরে।।

[টুইন, অক্টোবর, ১৯৩৪, ১৯৩৪। মাস্টার কমল। এফ. টি. ৩৪৩৮। সুর : কমল দাশগুপ্ত।]

২৬২

ফুলের বনে ফুলের সনে
ফুলেল হাওয়া নাচে দুলিয়া দুলিয়া।
টগর হেনা চামেলি মালতী বেলি
ফুটিল দল মেলি শরম ভুলিয়া।।
মউ বিলাসী প্রজাপতি
নেচে ফেরে অথির মতি
নাচে হরিণ চপল গতি
চটুল আঁখি তুলিয়া।।

[নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।]

২৬৩

ফুল চাই — চাই ফুল — টগর চম্পা চামেলি
ফিরি ফুলওয়ালি নিয়ে ফুল ডালি
মল্লিকা মালতী জুঁই বেলি।।
যার প্রাণে বিরহ জ্বালা
লহ এ অশোক মাধবী মালা
এ হাসুহানা নেবে যে বালা
কাটিবে জীবন তার হাসি খেলি।।
মোর এই বকুল মালা পরে যে আদর করে
বঁধু তার ব্যাকুল হয়ে ফিরিয়া আসে ঘরে।

আমার এই পলাশ জবা রঙন ও কৃষ্ণচূড়া
বিনোদ বেণীতে খোঁপায় পরে নববধূরা।
শুনি মোর ফুলের বাণী সন্ধ্যারানী
পরে গোধূলি রাঙা চেলি॥

[তথ্যের উৎস : এইচ. এম. ভি. কোম্পানির পুরনো রেজিস্টার। হিজ, মে. ১৯৩৪। শিল্পী : মিস অনিমা (বাদল)। এন. ৭২২৬।]

২৬৪

বকুল তলে ব্যাকুল বাঁশি কে বাজায়।
সে বাঁশরি শুনে কিশোরী
সহসা যেন গো যৌবন পায়॥
রয় না মন ঘরে সেই বাঁশির সুরে
দূরে ভেসে যেতে চায়
পরান ঘুরে মরে তাহার রাঙা পায়॥
তারি যে লীলাভূমি নিতিদিনি প্রাণে মোর
নিবিড় রাতে আসে পাশে বসে মনোচোর।
তারে কি মালা দিব পদ্ম–মন্দা গাঁথা
বিছাব পথে কি তার মরা ফুল ঝরা পাতা
প্রাণের কি টানে, জানি না কি ব্যথায়॥

[তথ্যের উৎস : এইচ. এম. ভি. কোম্পানির পুরনো রেজিস্টার ও নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পাণ্ডুলিপি হতে রেকর্ডের বাণী বেশ কিছুটা ভিন্ন। এফ. টি. ২৯৯৭। শিল্পী : মিস পদ্মরানী। এই পদ্মরানী, পদ্মরানী চ্যাটার্জী (গাঙ্গুলি) নন। ইনি অভিনয়ও করতেন।]

২৬৫

বকুল ছায়ে ছিনু ঘুমায়ে
গোপন পায়ে আসিলে তুমি।
রাতের শেষে ভোরের মতন
ভাঙিলে স্বপন নয়ন চুমি॥
ফুলের বুকে মধুর সম
আসিলে তুমি আমার প্রাণে

মরুর বুকে উঠিল ফুটে
রঙিন কুসুম বেদন ভুলি॥
জাগিয়া হেরি পরান ভরি
উঠিতেছে ঢেউ এ কি এ ব্যথার
বেদনা যত মধুও তত
হিয়াতে শরম নয়নে আশার।
অকালে ফাগুন আগুন শিখায়
রাঙিল মনের কানন ভূমি॥

[তথ্যের উৎস : নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। এই পাণ্ডুলিপির পাঠ হতে রেকর্ডের পাঠ কিছুটা স্বতন্ত্র। টুইন, ১৯৩৪। শিল্পী : মিস ঊষারানী। এফ. টি. ৩৩০৫।]

২৬৬

বাঁশির কিশোর লুকায়ে হেরিছে একেলা
পিয়াল বনের পথে নিরালা সাঁঝের বেলা।
হেলে দুলে চলে কে কাঁখে গাগরি
কাহার ঝিয়ারি ও কাহার পিয়ারি ওই নবীনা নাগরি॥
নূপুর মিনতি করে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
আমারে রাখিও চরণে বাঁধিয়া
পিয়া পিয়া বলে ডেকে ওঠে পাপিয়া
অঙ্গ জড়ায়ে দোলে আনন্দে ঘাগরী॥
চাঁদের মুখে যেন চন্দন মাখিয়া
কাজল কালো চোখের কলঙ্ক আঁকিয়া
আকাশ সম ওরে রেখেছে ঢাকিয়া
পিয়া বলে এসেছে ভাবিয়া॥

[হিজ, নভেম্বর, ১৯৩৬। শিল্পী : মিস হরিমতী। এন. ৯৭৯৯। শেষ পঙ্‌ক্তিটির বুলেটিনে পাঠ — 'নীলাম্বরী'।]

২৬৭

বিদেশি অতিথি সিন্ধুপারে।
পথহারা ফেরে দ্বারে দ্বারে
চাই এ হৃদয়ে
বন্ধু এসো এ পারে॥

তোমারে বুঝি না, বুঝি না এ দেশ
নয়নের ভাষা বঁধু সব দেশে এক।
তুমি উদ্দাম তুমি সুন্দর করো খেলা ভোরবেলা
দুবেলা স্বপনসম রাঙা জীবন মম শোভন দুধারে॥
তব কণ্ঠে সুরগুলি হায় অপরূপ স্মৃতি জাগায় ;
গেঁথেছি নব কুসুমের মালিকা পর গলায়।
চল যাই যথা নাই দেশের বন্ধন
লভিব সুন্দর নিরুদ্দেশের পথে লোভন ওপারে॥

[মেগাফোন, ১৯৩৩। শিল্পী : জ্ঞানদত্ত ও শ্রীমতী পারুল। জে. এন. জি. ৭১। তথ্যের উৎস : মেগাফোন কোম্পানির রেজিস্টার।]

২৬৮

বহে বনে সমীরণ ফুল জাগানো
এসো গোপন সাথি মোর ঘুম ভাঙানো॥
এসো আঁধার রাতের চাঁদ
আমার স্বপন সাধ
এসো পরানে পাতি মায়ার ফাঁদ।
ধীরে আঁখি নীরে এসো হৃদয় সায়রে দোল লাগানো॥
বনে মোর ফুলগুলি আছে তব পথ চেয়ে
পরান পাপিয়া পিউ পিউ ওঠে গেয়ে
এসো তরুণ অরুণ আলোকের পথ বেয়ে
এসো আমার হৃদয় আকাশ রাঙানো॥

[তথ্যের উৎস : নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। তিলককামোদ মিশ্র দাদ্‌রা।]

২৬৯

বৈকালি সুরে গাও চৈতালি গান
বসন্ত হয় অবসান।
নহবতে বাজে সকরুণ মুলতান॥
নীরব আনমনা পিক
চেয়ে আছে দূরে অনিমিখ
ধূলি ধূসর হলো দিক
আসে বৈশাখ অভিযান॥

চম্পা-মালা বিমলিন লুটায়
ফুল ঝরা বন বীথিকায়,
ঢেলে দাও সঞ্চিত প্রাণের মধু
যৌবন দেবতার পায়।
অনন্ত বিরহ ব্যথায়
ক্ষণিকের মিলন হেথায়
ফিরে নাহি আসে যাহা যায়
নিমেষের মধুতর গান॥

[টুইন, ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭। শিল্পী : সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়। এফ. টি. ৪৮৩২। 'চৈতী' গান। তথ্যের উৎস : আজহারউদ্দীন তালিকা ও সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য।]

২৭০

ব্যথার উপরে বঁধু ব্যথা দিও না
দলিত এ হৃদি মম দলে যেও না॥
লয়ে কত সাধ আশা
তোমার দুয়ারে আসা
(বঁধু) দিলে যদি ভালোবাসা ফিরে নিয়ো না॥
স্রোতের কুসুম প্রায়
ভাসিতাম অসহায়
তুলে নিয়ে বুকে তারে ফেলে দিলে পুনরায়।
নিরদয় এ কি খেলা
প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা
খেলার লাগিয়া ভালোবাসিও না॥

[তথ্যের উৎস : এইচ. এম. ভি. কোম্পানির রেজিস্টার ও নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। টুইন, ১৯৩৪। শিল্পী : মিস উষারানী। এফ. টি. ৩২১৩।]

২৭১

ব্যথার আগুনে হৃদয় আমার
জ্বলিছে দিবস রাতি গো
কাঁদিতে আসিলে এ তনু শ্মশানে
কে তুমি ব্যথার ব্যথী গো।

মুছিয়া গিয়াছে চন্দনের লেখা
খুলে শুকাইয়া গিয়াছে মন্দারের মালা
নিভেছে আশা দীপ আজি অবেলায়
কে তুমি রাতের সাথি গো॥

[তথ্যের উৎস : আজাহারউদ্দীন তালিকা ও মেগাফোন রেজিস্টার মেগাফোন ১৯৩৩। শিল্পী : গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী। জে. এন. জি. ৮২।]

২৭২

ভুলে যাও বলে জানাও মনে রাখার আবেদন
অনুরোধে ভুলবো যদি মনে রাখা সে কেমন॥
মনে যে রাখতে জানে সে কি মুখের মানা মানে
ভুল দিয়ে যার মন ভরা তারে ভুলতে বলা অকারণ॥
চাঁদ চলে যায় আবার আসে ফিরে আসে ফাগুন হাওয়া
কোয়েল এসে যায় কয়ে তার মনে রাখার দাবি–দাওয়া।
ভালোবাসায় ফুলের বাগে ঝরে কুসুম আবার জাগে
বন্ধ দুয়ার মন দেউলের খোল হাজার বাতায়ন।

[তথ্যের উৎস : এইচ. এম. ভি. কোম্পানির পুরানো রেজিস্টার। হিজ, জানুয়ারি, ১৯৩৪। শিল্পী : মিস বীণাপাণি। এন. ৭১৮৩।]

গজল

২৭৩

ভুখা আঁখি কাজ কি ঢাকি ওড়না দিয়ে গুলবদন
পিয়েই না হয় নিলে ও রূপ আঁখির ক্ষুধা আর্ত মন॥
'হারুত' সম সই হামেশা আশেক হওয়ার হয়রানি।
হায়, যদি না দেখত কভু ও রূপ আমার দুই নয়ন।
'হারুত' কি হায় বন্দি হতো চিবুক টোলের রস–কুঁয়ায়
'মারুত' যদি না কইতো গো সেই রূপসির রূপ কেমন॥
আমার মতন ও রূপ দেখে ভুল বকে কি বুলবুলি?
তোমার মুখের খোশবু লেগে ফুলের বাসে মাতল বন॥
তোমায় ভালোবেসে সখি দুঃখ ব্যথার অন্ত নাই।
ঘোমটা খোলো, হাফিজ তোমার রূপ দেখে নিক মনমোহন।

[তথ্যের উৎস : কল্লোল ভাদ্র, ১৩৩৪। গজল। কল্লোল, পত্রিকার উক্ত সংখ্যার সূচিপত্রে পরিচিতি হিসাবে 'গান' নির্দেশিত হয়েছে।]

২৭৪

যাও হেলে দুলে এলোচুলে কে গো বিদেশিনি
কাহার আশে কাহার অনুরাগিণী॥
আমি কনক চাঁপার দেশের মেয়ে
এনু উষার রঙের গাঙে নেয়ে
আমি মল্লিকা গো পল্লিবাসিনী॥
চিনি চিনি ওই চুড়ি কাঁকনের রিনিকিঝিনি
তুমি ভোর বেলা দাও স্বপনে দেখা।
তোমার রঙে কবি আঁক আমারই ছবি
তুমি দেবতা রবি আমি তব পূজারিনি॥
এসো ধরণীর দুলালি আলোর দেশে
যথা তারার সাথে চাঁদ গোপনে মেশে।
আনো আলোক তরী আমি যাইব ভেসে।
চল যাই ধরণীর ধূলির উর্ধ্বে
যথা বয় অনন্ত প্রেম মন্দাকিনী॥

[তথ্যের উৎস : নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। হিজ, এপ্রিল, ১৯৩৪। শিল্পী : ধীরেন দাস ও মিস হরিমতী। এন. ৭২২৪।]

২৭৫

যৌবনে যোগিনী সাজিয়া লো সজনি
খুঁজি বন-মালীরে বনে বনে।
শুনি তার বাঁশরি কুল-লাজ পাশরি
পথে পথে ধাই তারি অন্বেষণে॥
হেরেছি বৈশাখে তার মোহন-চূড়া কৃষ্ণচূড়ায়
হেরেছি ঘূর্ণি ঝড়ে চাঁচর তার চিকুর ওড়ায়।
হেরেছি আষাঢ়-মেঘে নব দূর্বাদলশ্যামে
শ্রাবণ বারিধারায় তারি নূপুর-ছন্দ নামে
রাখালিয়া বেণু শুনি ভাদর নদী তটে
বনশিওয়ালারে মোর পড়ে মনে॥
তাহারি শীতল পরশ হেমন্তিকার হিমেল হাওয়ায়,
মায়াবী গুণ্ঠন তার শীতের ধূসর কুহেলিকায়।

বসন্তে দোলে তাহার বাসন্তী রং পীত ধড়া
চোখে ধরেছি তারে বুকে তবু যায় না ধরা।
জনমে জনমে সখি সে আমার আমি তার
জীবনে মরণে বিরহে মিলনে॥

[তথ্যের উৎস : 'গানের মালা' গীতিগ্রন্থ। ভজন। দেশমিশ্র।]

২৭৬

যাস্ কোথা সই একলা ও তুই অলস বৈশাখে
জল নিতে যে যাবি ওলো কলস কই কাঁখে?
সাঁঝ ভেবে তুই ভর দুপুরেই দুকূল নাচায়ে
পুকুর পানে ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বাজায়ে
যাস্‌নে একা হাবা ছুঁড়ি
অফুট জবা চাঁপা কুঁড়ি তুই
ওলো রঙ দেখে তোর লাল গালে যায়
দিগবধূ ফাগ থাবা থাবা ছুঁড়ি
পিকবধূ সব টিটকিরি দেয় বুলবুলি চুমকুড়ি
আহা বউল ব্যাকুল মহুল তরুর সরস ঐ শাখে॥

[তথ্যের উৎস : ছায়ানট ও পূবের হাওয়া গীতগ্রন্থ। ভারতী, শ্রাবণ, ১৩২৮। গৌড় সারঙ্গ–দাদ্‌রা।]

২৭৭

যাবার বেলায় মিনতি আমার রাখিও মনে,
ডাক দিও গো সাঁঝের ছায়ে সঙ্গোপনে।
যখন সন্ধ্যাবধূ আঁকবে রঙের আলপনা,
আমার হিয়া দুলবে তখন তোমার প্রদীপ সনে
যখন নিরালাতে গাঁথবে মালা আনমনে।
(আমি) রইব ঘিরে তোমার মালার গন্ধসনে (প্রিয় আমার)
আমি দুলিয়ে যাব অলক তব মৃদু পবনে
ওগো একটি মালা গলায় নিও আমার স্মরণে॥

[টুইন, নভেম্বর, ১৯৩৫। শিল্পী : কালীপদ সেন। এফ. টি. ৪১১৬।]

২৭৮

শ্রাবণ রাতের আঁধারে নিরালা
বসে আছি বাতায়নে
রেবা নদীর অধীর খর স্রোত
বহে বেগে আমার মনে।
দিগন্তে করুণ কাতর
শুনি কার ক্রন্দন স্বর
ভেসে আসে বন–মর্মর ঝরঝর
সজল উতল পুবালি পবনে।
বিরহী যক্ষ কাঁদে একাকী কোথায়
কোন দূর চিত্রকূটে
আমার গানে যেন তার বেদনার
সকরুণ ভাষা ফুটে।
আমার মনের অলকায়
কোন বিরহিণী পথ চায়
মালবিকার আঁখি ধার ঝরে হায়
অঝোর ধারায় মোর নয়নে॥

[টুইন, জুলাই, ১৯৩৬। শিল্পী : কুমারী গীতা বসু। এফ. টি. ৪৪৭১। সুর : নজরুল। আধুনিক।]

২৭৯

সুদূর সিন্ধুর ছন্দ উতল
আমরা কলগীতি চল চঞ্চল॥
তুফান ঝঞ্ঝা
কল্লোল ছলছল
ঊর্ধ্বে আমি ঝড় বহি শন্‌শন্
মম বক্ষে তব মঞ্জরি তোলে গো রনন্
আনন্দ চিত্তে মেতে উঠি নৃত্যে
গুরু গুরু গুরু বাজে বাদল মাদল॥
তুমি গগন তলে উঠি মেঘের ছলে
জল বিম্বমালা বালা পরাও গলে॥
তুমি বাদল হাওয়ায় করো আদর যখন
মোরে কান্না পাওয়ায়।

ধূলি গৈরিক ঝড়ে সাগর নীলাম্বরি
জড়াইয়া অপরূপ করে ঝলমল ॥

[তথ্যের উৎস : আজাহারউদ্দীন তালিকা ও নজরুল সংগীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।]
হিজ, এপ্রিল ১৯৩৪। শিল্পী : ধীরেন দাস ও মিস বীণাপাণি। এন ৭২২৪। পাণ্ডুলিপির বাণী ও রেকর্ডের বাণীর মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে, যথা —

পাণ্ডুলিপির বাণী	**রেকর্ডধৃত বাণী**
ক. তাই আনন্দ চিত্তে উঠি নৃত্যে	ক. আনন্দ চিত্তে মেতে উঠি নৃত্যে
খ. গুরু গুরু শুনি বাদল মাদল	খ. গুরু গুরু গুরু বাজে বাদল মাদল

২৮০

হার মানি ননদিনি,
মুখর মুখের বাণী শুনি তোর লজ্জাও লাজে সখি ভোলে
পুলকে প্রাণ মন দোলে দোলে
পলকের চাহনিতে কে জানে কেমনে
প্রাণে এলো এত মধু এত লাজ নয়নে
বাহিরে নীরব কথার কুহু
অন্তরে মুহু মুহু বোলে
মুহু মুহু কুহু কুহু বোলে ॥
তোরি মতো ছিনু সই বনের কুরঙ্গী
মানি নাই কোনদিন তাদের ভ্রূভঙ্গি
মধুরা মুখরা ওলো ! মিষ্টি মুখের তোর
সব মধু খেয়েছে কি ঠাকুর জামাই চোর ?
তব অভিনব বাণী হিল্লোলে
গুণ্ঠন আপনি খোলে
পুলকে প্রাণ মন দোলে ॥

['বিয়ে বাড়ি' রেকর্ড নাটিকা।]

২৮১

হে প্রিয় আমারে দিব না ভুলিতে
মোর স্মৃতি তাই রেখে যাই শত গীতে।
বিষাদিত সন্ধ্যায় শুনিবে দূরে
বিরহী বাঁশি ঝুরে আমারি সুরে

আমারি করুণ কথা গাহিবে কে কোথা
সজল মেঘ ঘেরা নিশীথে।
গোধূলি ধূসর ম্লান আকাশে
হেরিবে আমারি মুরতি ভাসে
তব পদদলিত ফুলের বাসে
পড়িবে মনে আমারে চকিতে॥

[তথ্যের উৎস : রেকর্ড লেবেল। হিজ, ডিসেম্বর, ১৯৩৬। শিল্পী : কুমারী বিজন ঘোষ। এন. ৯৮৩৬।]

২৮২

বলো এ কোন রঙ্গ রে
পিয়ার বিরহে হিয়া কেঁদে কহে
চাহি সে নিঠুরের সঙ্গ রে।
ভালো যে বেসেছে ভোলে সে কেমনে,
যদি গো ভুলিলো পড়ে কেন মনে,
আঁখি জলে ভাসি তবু ভালোবাসি
একি নিদারুণ আনন্দ রে;
বলো এ কোন রঙ্গ রে॥

[তথ্যের উৎস : দুর্গাদাস চক্রবর্তী। বেতারের অনুষ্ঠান হতে গৃহীত।]

২৮৩

চঞ্চল হিয়া বারে বারে হায় যারে চায়,
তারে নাহি যে পায় তাই সে কেঁদে সুধায়
সে কোথায় সে কোথায় হায় গো সে কোথায়
মোর মতো হা হুতাশ
করে আকাশ বাতাস
শিশির বিন্দু হয়ে আঁখি ঝরে যায়।

[তথ্যের উৎস : দুর্গাদাস চক্রবর্তী। বেতারের অনুষ্ঠান হতে গৃহীত।]

২৮৪

আয়লো আয়লো লগন যায় লো
খেলিবি যদি হোরি।
হরষিত মনে হরিৎ কাননে
হরি উঠেছে ভরি।
আগুন রাঙা ফাগুন লাল
রঙিন অশোক গালে দেয় গাল
জোছনা আঁচল করিল বিভোল
লাগে যেন লাল জরি॥

[তথ্যের উৎস : দুর্গাদাস চক্রবর্তী। বেতারের অনুষ্ঠান হতে গৃহীত।]

২৮৫

বয়ে যাই উতরোল অসীম সুদূরে
অজানার লাগি চলি অচিন সে পুরে।
না জানি পথের কথা
উদাসী পথিক যথা
হয়েছে উদাস মন
বাঁশির ঐ সুরে॥
কবে মোর হবে জয় — মন অভিসার
সফল হইবে সে মুখ হেরি বঁধুয়ার
জানি না সে কোন দেশে
সে কোন পথের শেষে
মোর প্রিয় সনে হবে দেখা
আঁখি তাই ঝরে॥

[তথ্যের উৎস : জগৎ ঘটকের পাণ্ডুলিপি। বেতারে অনুষ্ঠিত 'প্রবাহ' ও 'জীবনস্রোত' গীতি-আলেখ্যের গান।]

২৮৬

শীতের হাওয়া বয় রে ও ভাই
উদাস হাওয়া বয়।
ঘরের পানে ফিরতে রে ভাই
মন যে উতল হয়।

বেলা শেষে বাঁশির তান
নেয় যে কেড়ে বিরহী প্রাণ ;
থেকো না আর মান করে রাই
বাঁশির সুরে কয়
সেই সুরে মন করে কেমন
পরান পাগল হয়॥

[তথ্যের উৎস : জগৎ ঘটকের পাণ্ডুলিপি। বেতারে অনুষ্ঠিত 'প্রবাহ' ও 'জীবনস্রোত' গীতি-আলেখ্যের গান।]

২৮৭

বল কতদূর ! আর কতদূর
কবে হবে পথ অবসান।
তোমারি কণ্ঠে শুনিব হে স্বামী
কবে তব প্রিয় আহ্বান॥
শ্রান্ত মনের বেদনার ভার
ক্লান্ত তনু বহে না যে আর
দিন শেষে আজ তোমার চরণে
দাও মোরে প্রিয় স্থান॥

[তথ্যের উৎস : জগৎ ঘটকের পাণ্ডুলিপি। বেতারে অনুষ্ঠিত 'প্রবাহ' ও 'জীবনস্রোত' গীতি-আলেখ্যের গান।]

২৮৮

রহিতে যে নারি ধৈরজ ধরি
যাচি হে তোমার দেখা।
পথের বেদন সহিতে যে নারি
পথের মাঝারে একা॥
শুনেছি তোমার বাঁশরির সুর
কোন্ সে অতীতে দূর বহুদূর
তব বাঁশরির সুরে সঙ্গীত ঢালি
(আজি) শোনাও সে প্রেম গান॥

[তথ্যের উৎস : জগৎ ঘটকের পাণ্ডুলিপি। বেতারে অনুষ্ঠিত 'প্রবাহ' ও 'জীবনস্রোত' গীতি-আলেখ্যের গান।]

২৮৯

আমার মনের বেদনা হে অভিমানী
বুঝিলে না ; আমার মনের বেদনা
চাহিনি মালার ফুল
বুঝিলে না আপনার ভুল
মালা দিলে মন দিলে না
আমার মনের বেদনা ॥

[রেকর্ড নং ৭ ই পি ই ৩১৭১। শিল্পী : দীপালি নাগ। ১৯৭৭ সাল। রেকর্ড লেবেলে মুদ্রিত : কথা : কাজী নজরুল ইসলাম।]

২৯০

আঁখি পাতা ঘুমে জড়ায়ে আসে
ওগো চাঁদ জাগিয়া কে গো
সুদূর আকাশে ॥
জাগিয়া থেকো কবরীর মালা
পথ যেন পাই এসে
তোমারি শুভ যে এলে ॥

[হিজ, জানুয়ারি, ১৯৪১। শিল্পী : দীপালি তালুকদার ; এন. ২৭০৭৩। সুর : নজরুল, কাফি কানাড় — আদ্ধা চৌতাল]

২৯১

পিউ পিউ বোলে
পাপিয়া পিউ পিউ বোলে
ফাগুন উন্মন বন ব্যাপিয়া ॥
বিরহিণী মন বিহগী
ওরি সাথে কাঁদে একা
ঘরে নিশি জাগিয়া ॥

[হিজ. অক্টোবর ; ১৯৪১ ; শিল্পী : দীপালি তালুকদার এন. ২৭১৯৩।]

২৯২

বিষাদিনী এসো শাওন সন্ধ্যায়
কাঁদিব দুজনে
দীপালির উৎসবে আঁধারের ঠাঁই নাহি
কাহারো হাসি যদি নিভে যায়।
তোমারি মতো তাই ম্লান মুখ চিরদিন
লুকায়ে রাখি অবগুণ্ঠনে॥

[তথ্যের উৎস : রেকর্ড লেবেল ও পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি (ফটো) নজরুল মৃত্যুবার্ষিকী স্মারক : ১২ই ভাদ্র, ১৩৯৬। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা। ৭ ই পি ই ৩১৭১। শিল্পী : দীপালি নাগ। ১৯১৭। শাওন্তী কল্যাণ — ত্রিতাল]

২৯৩

রিম ঝিম রিম ঝিম বরষা এলো
আমারি আশালতা সজল হলো।
কুসুম কলি মুঞ্জরিল
বিরহী লতিকা সহসা ফুটিল
মন এলোমেলো মেদুর ছাইলো॥

[৭ ই. পি. ই. ৩১৭১। শিল্পী : দীপালি নাগ : ১৯১৭ সাল। তথ্যের উৎস : রেকর্ড লেবেল।]

২৯৪

সুনয়না চোখে কথা কয়ে যায়
বনের বাণী
দুটি ফুলে শুনি
নয়ন ফাঁকে প্রাণ লুকিয়ে চায়॥
দেহ দেউলে
দুটি দীপ দুলে
হেরি সারা অন্তর তায়॥

[তথ্যের উৎস : আজাহারউদ্দীন-তালিকা ও নিতাই ঘটকের পুরানো গানের খাতা এবং এইচ. এম. ভি. রয়্যালটি রেজিস্টার। হিজ, ডিসেম্বর, ১৯৩৩। শিল্পী : মিস মানদা। এন. ৭১৭৫।]

ভক্তিগীতি

২৯৫

অন্ধকারের তীর্থপথে ভাসিয়ে দিলাম নামের তরী
মায়া মোহের ঝড় বাদলে এবার আমি ভয় না করি
যে নাম লেখা তারায় তারায়
যে নাম ঝরে অশ্রুধারায়
যাত্রা শুরু সেই নামেরি জপমালা বক্ষে ধরি ॥
এই আঁধারের অন্তরালে লক্ষ রবি চন্দ্র জ্বলে
নিত্য ফোটে আলোর কমল জানি তোমার চরণ তলে
এবার ওগো অশিব নাশন থামাও তোমার ঢেউর নাচন
সেই তো অমর মরণ যদি ধ্যান সাগরে ডুবে মরি ॥

[টুইন, নভেম্বর, ১৯৩৫। শিল্পী : জগন্নাথ মুখার্জী এফ. টি. ৪১১৪। আধুনিক]

২৯৬

আজিকে তোমারে স্মরণ করি
মৃত্যু আড়ালে জীবন তোমার
ওঠে অপরূপ মহিমায় ভরি ॥
জীবন তোমার তটিনীর মতো
বয়ে গেছে বাধা উপল–আহত
আত্মারে রাখি চির জাগ্রত
অম্বরে শির রেখেছিলে ধরি ॥
তোমার এ স্মৃতি বাসরে আমরা
তোমারে শ্রদ্ধা তর্পণ দানি,
তোমার ধর্ম তোমার কর্ম
দিক অভিনব মহিমা আনি।
এসো আমাদের করুণ স্মৃতিতে
নয়নের জলে বিষাদিত চিতে
জীবনের পরপার হতে
পড়ুক আশীষ সান্ত্বনা ঝরি।

[নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা]

২৯৭

আমারে চরণে দিও ঠাঁই
ও চরণ বিনা ওহে গিরিধারী
কামনা কিছুই নাই।
ব্যথিত হৃদয় হতে
আকুল মরম বাণী।
থেকে থেকে ভেসে আসে
ফিরে এসো এসো রানী
ফিরিতে পারি না আর অসীমে মিশিয়া যাই
তুমি ফিরে যাও সখা আমাতে আর আমি নাই॥

[মীরাবাঈ রেকর্ড নাটিকা। মীরার গান]

২৯৮

আয় মা মুক্তকেশী আয়
(মা) বিনোদ বেণী বেঁধে দোব এলোচুলে।
প্রভাত রবির রাঙা জবা (মা) দুলিয়ে দোব বেণীমূলে
আয় মুক্তকেশী আয়।
মেখে শ্মশান ভস্ম কালি,
ঢাকিস কেন রূপের ডালি
তোর অঙ্গ ধুতে গঙ্গাবারি
আনব শিবের জটা খুলে।
দেব না আর শ্মশান যেতে
সহস্রারে রাখব ধরে।
খেলে সেথা বেড়াবি মা রামধনু রং শাড়ি পরে।
ক্ষয় হলো চাঁদ কেঁদে কেঁদে
(তারে) দেব মা তোর খোঁপায় বেঁধে
মোর জীবন মরণ বিল্বজবা।
দিব মা তোর পায়ে তুলে॥

[মেগাফোন, জুন, ১৯৪০। শিল্পী : পরেশচন্দ্র দেব (পাঁচু)। জে. এন. জি. ৫৪৮০। সুর : নজরুল]

২৯৯

আয় সবে ভাই বোন
আয় সবে পদধূলি শিরে লয়ে মার।
মার বড়ো কেহ নাই কেহ নাই কেহ নাই
নতি করি মা আমার মা আমার মা আমার।

[মাতৃস্তোত্র রেকর্ড নাটিকা ; রেকর্ড নং জি. টি. ৩৭ ; শিল্পী : শিশু মঙ্গল সমিতি]

৩০০

আজো হেথা তেমনি ধারা বাজে শ্যামের বাঁশরি
আজও হেথা নিশীথরাতে কুঞ্জে আসে কিশোরী॥
বাঁশির তানে শ্রীযমুনা তেমনি উজান বয়
গোঠে গিয়ে বৎস ধেনু ঊর্ধ্বমুখী রয়
কে বলে শ্যাম চলে গেছে
যায়নি কানু ব্রজেই আছে
সে কিরে সই থাকতে পারে বৃন্দাবন পাসরি॥

[মীরাবাঈ রেকর্ড নাটিকা। এন. ৭১৪৩—এন ৭১৫৪]

৩০১

একি অসীম পিয়াসা
শত জনম গেল তবু মিটিল না
তোমারে পাওয়ার আশা।
সাগর চাহিয়া চাঁদে
চির জনম কাঁদে
তেমনি যত নাহি পায়
তোমা পানে ধায়
অসীম ভালোবাসা॥
তোমারে যে চাহিয়াছে ভুলে একদিন
সেই জানে তোমারে ভোলা কি কঠিন
তোমার স্মৃতি তার মরণের সাথী হয়
মেটে না প্রেমের পিয়াসা॥

[হিজ, ডিসেম্বর, ১৯৩৬। শিল্পী : কুমারী বিজনবালা ঘোষ। এন. ৯৮৩৬। রেকর্ড লেবেলে মুদ্রিত—কথা : নজরুল]

৩০২

এসো মাধব এসে পিও মধু
এসো মাধবী লতার কুঞ্জ বিতানে
মধু মাধবী রাতে এসো বঁধু।
এসো মৃদুল মধুর পা ফেলে
এসো ঝুমুর ঝুমুর ঘুমুর বাজায়ে
শ্রবণে অমিয়া মধু ঢেলে
এসো বাজায়ে বাঁশরি যে সুর লহরি
শুনে কূল ভোলে ব্রজবধূ॥
এসো নিবিড় নীরদ বরণ শ্যাম
তমাল কাননে কাজল বুলায়ে
দুলায়ে চাঁচর চিকুর দাম।
এসো বামে হেলায়ে শিখী পাখা
ত্রিভঙ্গ ঠামে এসো বঁধু॥
এসো নারায়ণ এসো অবতার
পার্থসারথি বেশে এসো পাপ কুরুক্ষেত্রে আরবার
তুমি মহাভারতের ভাগ্যবিধাতা
গীতা উদগাতা নহ শুধু॥

[নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা]

৩০৩

এলো শিবানী-উমা এলো এলোকেশে
এলোরে মহামায়া দনুজদলনী বেশে।
এলো আনন্দিনী গিরি নন্দিনী
রবে না কেহ আর বন্দী বন্দিনী
শক্তি প্রবাহ বহিল মৃতদেশে।
এলো রে বরভয়া ভয় হরিতে
শ্মশান কঙ্কালে বজ্র গড়িতে।
এলো মা অন্নদা আয়রে ভিখারি
বর চেয়ে নে যার যে অধিকারী
মুক্তি বন্যায় ভারত যাক ভেসে॥

[কলম্বিয়া, শারদীয়া অর্থাৎ অক্টোবর ১৯৪৩। শিল্পী : সত্য চৌধুরী এন্ড পার্টি। জি. ই. ২৬১৪। সুর : চিত্ত রায়। রেকর্ড লেবেল মুদ্রিত—কথা : কাজী নজরুল]

৩০৪

চির আপনার তুমি হে হরি
তুমি ভুলো না যদি আমি রই পাসরি ৷৷
আমি ভুলিয়া যদি কভু রহি ঘুমে
তুমি ঘুম ভাঙাও মোর আঁখি চুমে
তুমি আমি এক তরীতে তরি ৷৷
আমার বাঁধন মোচন মাঝে
হরি হে তোমারও মুকুতি রাজে
তুমি জীবনে আমার আছ প্রাণ ধরি ৷৷

[নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা]

৩০৫

এসো মা দশভুজা
দশহাতে কল্যাণ আন দশভুজা
মৃত্যুঞ্জয় ঘরনি ! মৃতজনে অমৃত দান
নিরাশ প্রাণে দেও আশা
মূকজনে দাও ভাষা
আঁধার মহিষাসুর বুকে
আলোর ত্রিশূল মান।
দেও জয় বরাভয়, শক্তি, তেজ, প্রেম, প্রীতি

দনুজদলনী ! শাপ মুক্ত করো ক্ষিতি
এলে যদি আর বার মাগো
ভক্তের হৃদি মাঝে জাগো
দুঃখ শোক আর দিও না গো
তারিণী সন্তানে ত্রাণ ৷৷

[টুইন, অক্টোবর, ১৯৩৫। শিল্পী : মাতৃপূজারীর দল। রেণু বসু ও দেবেন বিশ্বাস। এফ. টি. ৪১০১। সুর : নজরুল]

৩০৬

আমি গিরিধারী মন্দিরে নাচিব
আমি নাচিব প্রেম যাচিব ॥
নেচে নেচে রস শেখরে মোহিব
মধুর প্রেম তার যাচিব (আমি)
প্রেম প্রীতির বাঁধিব নূপুর
রূপের বসনে সাজিব (আমি) ॥
মানিব না লোক-লাজ্ কুলের ভয়
আনন্দ রাসে মাতিব।
শ্যামের বেদিতে বিরাজিব বামে
হরিরে মীরার রঙে রাঙিব (আমি) ॥

['কমল দাশগুপ্তের কথা' : আসাদুল হক ! নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা (বাংলাদেশ), ভাদ্র, ১৩৯৪]

৩০৭

ওমা দৈত্য দলে তুই বিনাশ ছলে
আশ্রয় দিলি মাগো চরণ তলে
অভাজনে মহামায়া দিবি নাকি পদ-ছায়া।
করুণাময়ী মাগো আশ্রিত-পালিনী ॥

[সুরথ উদ্ধার রেকর্ড নাটিকা]

৩০৮

(ওমা) কালী সেজে ফিরলি ঘরে
কোটি ছেলের কাজল মেখে
একলা আমি কেঁদেছি মা
সারাটি দিন ডেকে ডেকে।
হাত বাড়ায়ে মা তোর কোলে
(আমি) যাব না আর মা মা বলে
মা হয়ে তুই ঘুরে বেড়াস
আমায় ধুলায় ফেলে রেখে।

তোর আর ছেলেদের অনেক আছে
আমার যে মা নেই গো কেহ
আমি শুধু তোরেই জানি, যাচি শুধু তোরই স্নেহ।
তাই আর কারে যেই ধরিস কোলে
মোর দু চোখ ভরে ওঠে জলে (মা গো)
আমি রাগে অনুরাগে কাঁদি
অভিমানে দূরে থেকে॥

[কলম্বিয়া, জুন, ১৯৪৪। শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ। জি. ই. ২৬৭৯ ; সুর চিত্ত রায়। অপ্রকাশিত নজরুল (হরফ) গ্রন্থে গানটির যে বাণী আছে ; প্রথম পংক্তি ছাড়া, তার সাথে এই বাণীর কোন মিল নেই। এই বাণী রেকর্ডের]

৩০৯

ওরে অবোধ আঁখি
আর কতদিন রইবি রূপে ভুলে
অরূপ সাগর দেখলি না তুই দাঁড়িয়ে রূপের কূলে।
যে সুন্দর চুপে চুপে লীলা করেন রূপে রূপে
তুই দেখলি না সেই অপরূপে
রূপের দুয়ার খুলে॥

[বিল্বমঙ্গল রেকর্ড নাটিকা]

৩১০

ওরে তরু তমাল শাখা
আছে পল্লবে তোর মোর বল্লভ
কৃষ্ণ কান্তি মাখা।
আমি তাইতো তমাল কুঞ্জে আসি
তাইতো তমাল ভালোবাসি
তোর পথ-ছায়ায় আছে যে তার
চরণ চিহ্ন আঁকা (কৃষ্ণ)॥
তোর চূড়ায় ময়ূর নাচে
যেন কৃষ্ণ-ময়ূর পাখা

তাই দেখে পরান বাঁচে
কৃষ্ণহারা পরান আমার বাঁচে।
তোর শাখাতে স্বর্ণ-লতা দোলে
আমি ভাবি শ্যামের পীত বসন বলে
মোর অঙ্গ যেন থাকেরে তোর
কালো ছায়ায় ঢাকা
তোর ছায়া নয়রে শ্যামের ছোঁওয়া
যেন শ্যামের শীতল ছোঁওয়া।

['কমল দাশগুপ্তের কথা' আসাদুল হক। নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, বাংলাদেশ, ভাদ্র, ১৩৯৪]

৩১১

কিশোরী সাধিকা রাধিকা শ্রীমতী
চির কিশোর আরাধিকা শ্রীমতী॥
কমলা গোলোকে গোপিনী ভূলোকে।
সেবিকা প্রকৃতি পরমা তপতী॥
শ্যাম ভুবন কালে রাই অরুণ আলো।
হরি পূজারিনি প্রেম মূর্তিমতী॥
ব্রজধাম বাসিনী লীলা বিলাসিনী
শ্যাম নাম ভাষিণী বিরহ ভারতী॥
শ্যাম মেঘ গলে রাই বিজলি দোলে
শ্যাম পত্র কোলে রাই ফুল আরতি॥
লয়ে যাঁহার নাম হরি হন রাধা শ্যাম।
সুর নর অবিরাম করে যাঁয় প্রণতি॥

[হিজ, নভেম্বর, ১৯৩৫। শিল্পী : কমল দাশগুপ্ত। এন. ৭৪৩৪]

৩১২

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল রে মন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোল
রে মন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোল রে বোল
প্রেমের লহর তোল
(রে মন) মালার বন্ধন খোল॥

নিরালা হ্রদ যমুনাতে
কে বাজায় বাঁশি আধেক রাতে
কূল ভুলে চল অরি সাথে
প্রেম আনন্দে দোল॥
সে গোলক হতে ভালোবাসে গোকুল বৃন্দাবন
মধুর প্রেমের ভিখারি সে মদনমোহন
প্রেম দিয়ে যে বাঁধতে পারে
সাধ করে তার কাছে হারে
মুনি ঋষি পায় না তারে
গোপীরা পায় কোল॥

[রেকর্ড লেবেলে মুদ্রিত—কথা : কাজী নজরুল। টুইন। শিল্পী : আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এফ. টি. ৪৭৪৮]

৩১৩

কও কথা কও কথা, কথা কও হে দেবতা।
তুমি তো জান স্বামী আমার
প্রাণে কত ব্যথা॥
মোর তরে আজি সকল দুয়ার
হইল বন্ধ হে প্রভু আমার
তুমি খোলো দ্বার! সহে না যে আর
সহে না এ নীরবতা॥
শুনি অসহায় মোর ক্রন্দন
গলিবে না পাষাণের নারায়ণ
ভোল অভিমান চরণে লুটায়
পূজারিনি আশাহতা॥

[তথ্যের উৎস : নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। এই গ্রন্থের বাণীর সাথে রেকর্ডধৃত বাণীর কিছু পার্থক্য আছে। উপরে উদ্ধৃত বাণী রেকর্ডধৃত বাণী। মীরাবাঈ, রেকর্ড নাটিকা। শিল্পী : মিস প্রভা, মীরার গান।]

৩১৪

কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি
যে কৃষ্ণ নাম জপেন ইন্দ্র ব্রহ্মা মহেশ্বর
যে নাম করে ধ্যান যোগী ঋষি সুরাসুর নর

এই অসীম বিশ্ব সীমা যাঁহার পায় নাকো খুঁজি
আমি জীবনে মরণে যেন সেই নামই ভজি॥
কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি॥
যাঁর অনন্ত লীলা যাঁহার অনন্ত প্রকাশ
মধু কৈটভ মর কংসে যুগে যুগে করেন নাশ
ন্যায় পাণ্ডবের হলেন সখা সারথি সাজি
এই পাপ কুরুক্ষেত্রে কাঁদি তাঁহারেই খুঁজি
কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি॥
যাঁর মুখে গীতা হাতে বাঁশি নূপুর রাঙা পায়
কভু শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে কভু গোরা নদীয়ায়
ফেরে প্রেম-যমুনার তীরে চির-রাধিকায় খুঁজি
মোর মন গোপিনী উন্মাদিনী সেই নামে মজি
কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি॥

[নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।]

৩১৫

গাহ নাম অবিরাম কৃষ্ণনাম কৃষ্ণনাম
মহাকাল যে নামের করে প্রাণায়াম॥
যে নামের গুণে কংস কারার খোলে দ্বার
বসুদেব যে নামে যমুনা হলো পার
যে নাম মায়ায় হলো তীর্থ ব্রজধাম॥

[হিজ, নভেম্বর, ১৯৩৫ ; শিল্পী : কমল দাশগুপ্ত ; এন. ৭৪৩৪]

৩১৬

চোখের বাঁধন খুলে দে মা
খেলব না আর কানামাছি।
আমি মার খেতে আর পারি না মা
এবার বুড়ি ছুঁয়ে বাঁচি॥
তুই পাবি অনেক মেয়ে ছেলে
যাদের সাধ মেটেনি খেলে খেলে।

তুই তাদের নিয়েই খেলনা মাগো
শ্রান্ত আমি রেহাই যাচি।
দুঃখ শোক ঋণ অভাব ব্যাধি
মায়ার খেলুড়িরা মিলে।
শত দিকে শত হাতে
আঘাত হানে তিলে তিলে॥
চোর হয়ে মা আর কত দিন
ঘুরব ভেবে শান্তিবিহীন
তোর অভয় চরণ পাই না কেন
মা তোর এত কাছে আছি॥

[হিজ, এপ্রিল, ১৯৪৮। মৃণালকান্তি ঘোষ। এন. ২৭৮১২ ; সুর : চিত্ত রায়]

৩১৭

জয় বৃন্দাবন জয় নরলীলা
জয় গোবর্দ্ধন চেতন শিলা
নারায়ণ ! নারায়ণ ! নারায়ণ !
চেতন যমুনা চেতন রেণু
গহন কুঞ্জ বন ব্যাপিত বেণু।
নারায়ণ ! নারায়ণ ! নারায়ণ !
খেলা খেলা খেলা খেলা
নিরঞ্জন নির্মল ভাবুক ভেলা
নারায়ণ ! নারায়ণ ! নারায়ণ !

[বিল্বমঙ্গল রেকর্ড নাটিকা]

৩১৮

জয় ভূতনাথ হে দেব প্রলয়ংকর,
ভৈরব শ্মশানচারি শিব প্রমোদিত শঙ্কর।
ভয়াল করাল দানব এসো পরিহার মানব
ধূর্জটি রুদ্র মহেশ জয় জয় শিব শঙ্কর।

[প্ল্যানচেট রেকর্ড নাটিকা]

৩১৯

জ্বালো দেয়ালি জ্বালো
অসীম তিমিরে শ্যামা মা যে
অযুত কোটি আলো।
এলো শক্তি অশিব নাশিনী
এলো অভয়া চির বিজয়িনী
কালো রূপের স্নিগ্ধ লাবণি
নয়ন মন জুড়ালো॥
গ্রহ তারার দেওয়ালি জ্বলিছে পবনে
জ্বালো দীপালি জীবনের সব ভবনে।
এলো শিবানী প্রাণ দিতে সবে
নাশিতে লোভী পাপ দানবে
রক্ষা করিতে পীড়িত মানবে
ধারারে বাসিতে ভালো॥

[হিজ, নভেম্বর, ১৯৩৬। শিল্পী : ইন্দু সেন। এফ. টি. ৪৬৪৯]

৩২০

তুমি বিরাজ কোথা হে উৎসব দেবতা
মম গৃহ অঙ্গনে এসো সঙ্গী হয়ে
দানো আনন্দ বারতা।
পূজা সম্ভারে প্রসন্ন দৃষ্টি হানো
শুভ শঙ্খ বাজাও দশদিক জাগানো
হে মঙ্গলময় ! আসি অভয় দানো
আনো প্রভাত আকাশ সম নির্মলতা।
লহো বিহগের গীতি অভিনন্দন
চাঁদের থালিকা হতে গোপীচন্দন
আনন্দ অমরার নন্দন হে প্রণত করো চরণে
কহো কথা কহো কথা॥

[টুইন, মে, ১৯৩৮। শিল্পী : কার্তিকচন্দ্র দাস। এম. টি. ১২৩৭৩। লেবেল : কথা ও সুর : নজরুল]

৩২১

তোমার মদন মোহন রূপেরই দোষ সুন্দর শ্যাম চাঁদ
মুনির যদি মন টলে নাথ তাদের নয় সে অপরাধ॥
তোমার রূপমাধুরী দেখি যত
রূপের তৃষ্ণা বাড়ে তত
হায় দু'দিনের জীবন দিয়ে সাধলো বিধি বাদ
কোটি জনম ও রূপ দেখে মিটবে না সে সাধ॥
হে অপরূপ চির মধুর
কি দোষ দেব কুলবঁধুর
যে দেখেছে ভুবন-মোহন তোমার রূপের ফাঁদ
সাধ করে যে ভুলেছে নাথ কুল মানের বাঁধ॥

['কমল দাশগুপ্তের কথা' : আসাদুল হক। নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, বাংলাদেশ, ভাদ্র, ১৩৯৪। শ্রীমতী রাধারানী গানটি ৮.৬.১৯৪০ তারিখে ঢাকা বেতার কেন্দ্র হতে নজরুলের গান হিসাবে গেয়েছিলেন।]

৩২২

তোমার প্রেমে সন্দেহ মোর
দূর করো নাথ ভক্তি দাও।
যেখানে হোক তুমি আছে—
এই বিশ্বাস শক্তি দাও।
যে কোন জনমে আমি
পাবই পাব তোমায় আমি
অবিশ্বাসের আঁধার রাতে
তোমায় পাওয়ার পথ দেখাও॥
শত দুঃখ ব্যথার মাঝে
এইটুকু দাও শান্তি নাথ।
কাঁদিবে তুমি আমার দুঃখে
আজকে যতই দাও আঘাত॥
হয়তো কোটি জনম পরে
পাব তোমায় আমার করে,
তোমায় আমায় মিলন হবে
এই আশাতে মন দোলাও॥

[টুইন, ডিসেম্বর, ১৯৩৬। শিল্পী : অমরেন্দ্র ঘোষ। এফ. টি. ৪৭১১। ভজন।]

৩২৩

তোরা দেখে যা আমার কানাই সেজেছে নবীন নাটুয়া সাজে॥
তালে তালে রুমুঝুমু রুমুঝুমু চরণে নূপুর বাজে॥
ত্রিভঙ্গ হয়ে নাচে হেলে দুলে
টলে শিখি-পাখা চূড়া পরে টলে
হেসে পড়ে ঢলে গোপীদের কোলে
অপরূপ এই রসরাজে দেখে গলে যায় চাঁদ লাজে॥
রসের অমিয়া সাগর মথিয়া
মেঘ গলাইয়া আকাশ ছানিয়া
কে গড়িল কৃষ্ণ চাঁদে
সে যখন নাচে চরণের কাছে ত্রিভুবন-বাসী কাঁদে
এ কোন অপরূপ রূপধার এলো আমার আঙিনা মাঝে॥

['কমল দাশগুপ্তের কথা' : আসাদুল হক। নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, বাংলাদেশ, ভাদ্র, ১৩৯৪।]

৩২৪

তোরা মা বলে ডাক তোরা প্রাণ ভরে ডাক মা বলে রে
রইবে না আর দুঃখ শোক।
আমার মুক্তকেশী মায়ের নামে
মুক্তি লভে সর্বলোক॥
নাম জপে যে বরাভয়ার
ত্রিভুবনে ভয় কি রে তার।
সে অন্তবিহীন অন্ধকারে
দেখতে পায় আশার আলোক॥

['সুরথ উদ্ধার' রেকর্ড নাটিকা]

৩২৫

দাসী হতে চাই না আমি হে শ্যাম কিশোর হে বল্লভ,
আমি তোমার প্রিয়া হওয়ার দুঃখ লব।
জানি জানি হে উদাসীন,
দুঃখ পাব অন্তবিহীন,
বঁধুর আঘাত মধুর যে নাথ
সেই গরবে সকল সব

তোমার যারা সেবিকা নাথ, আমি নহি তাদের দলে,
সর্বনাশের আসায় আমি ভেসেছি প্রেম-পাথার জলে।
দয়া যে চায় যাচুক চরণ,
আমার আশা করবো বরণ,
বিরহে হোক মধুর মরণ,
আজীবন সুদূরে রব।।

[টুইন, জুন ১৯৩৬। শিল্পী : কুমারী রেণু বসু। এফ. টি. ৪৩৯৯। সুর : নজরুল। 'আমার আশা করব বরণ' রেকর্ডধৃত এই পংক্তিটি রেকর্ড বুলেটিনে—'আমার আশায় করব বরণ'।]

৩২৬

নতুন করে গড়ব ঠাকুর
কষ্টি পাথর দে মা এনে
দিব হাতে বাঁশি মুখে হাসি
ডাগর চোখে কাজল টেনে।।
মথুরাতে আর যাবে না
মা যশোদায় কাঁদাবে না
রইবে ব্রজ গোপীর কেনা
চলবে রাধার আদেশ মেনে।।
শ্রীচরণ তার গড়ব না
গড়লে চরণ পালিয়ে যাবে
নাইবা শুনলে নূপুর ধ্বনি
ঠাকুরকে তো কাছে পাবে
চরণ পেলে দেশে দেশে
কুরুক্ষেত্র বাঁধাবে সে
গন্ধমালা দিসনে মাগো
ভক্ত ভ্রমর ফেলবে জেনে।।
দেখে কখন করবে চুরি
একলা ঘরে মরব ঝুরি
গন্ধমালা দিস নে মাগো
ভক্ত ভ্রমর ফেলবে জেনে।

[কলম্বিয়া, জানুয়ারি, ১৯৬৫। শিল্পী : ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়। জি. ই. ২৫২০৩।]

৩২৭

নন্দকুমার বিনে সই
আজি বৃন্দাবন অন্ধকার
নাহি ব্রজে আনন্দ আর ॥
যমুনার জল দ্বিগুণ বেড়েছে
ঝরি গোকুলে অশ্রুধারা।
শীতল জানিয়া মেঘ বরন
শ্যামের শরণ লইয়া সই
তৃষিতা চাতকি জ্বলে মরি হায়
বিরহ দাহনে ভস্ম হই
শীতল মেঘে অশনি থাকে।
কে জানিত সখি সজল কাজল
শীতল মেঘে অশনি থাকে।
ব্রজে বাজে না বেণু আর
চরে না ধেণু
(আর) পড়ে না গোকুলে শ্যাম চরণ রেণু;
তার ফেলে যাওয়া বাঁশি নিয়ে শ্রীদাম সুদাম
ধায় মথুরার পথে আর কাঁদে অবিরাম।
কৃষ্ণে না হেরি দূর বন পার উড়ে গেছে শুক সারি
কৃষ্ণ যেথায় সেই মথুরায় চল যাই ব্রজনারী ॥

[তথ্যের উৎস : আজাহারউদ্দীন : তালিকা ও নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। টুইন, ১৯৩৪। শিল্পী : সুধীরা সেনগুপ্ত। এফ. টি. ৩৩০০। 'নজরুল সঙ্গীত সম্ভার' পুস্তকটিতে পাণ্ডুলিপিধৃত বাণীর সাথে রেকর্ডের বাণীর কিছু পার্থক্য রয়েছে। এখানে রেকর্ডধৃত বাণীই দেওয়া হয়েছে।]

৩২৮

ফিরে এলে কানাই মোদের এবার ছেড়ে দিস নে তায়।
তোর সাথে সব রাখাল মিলে বাঁধবো সে ননী চোরায় ॥
তুই যখন তায় রাখতিস বেঁধে ছাড়ায়েছি কেঁদে কেঁদে
তখন জানতো কে যে খুললে বাঁধন পালিয়ে যাবে মথুরায় ॥
আমরা এসে ডাকলে শ্যামে গোঠে যেতে দিসনে তায়
অক্রুর মুনির সাথে গো মা পালিয়ে যাবে শ্যাম রায় ॥
কেউ যাব না বনে মা আর খেলবো তোর এই আঙ্গিনায়।
শুধু খেলবো লুকোচুরি খেলা আগলাতে চোরের রাজায় ॥

[হিজ, এপ্রিল, ১৯৩২। শিশুমঙ্গল সমিতি। জি. টি. ১৭]

৩২৯

বন তমালের শ্যামল ডালে
দোলে ঝুলন দোলায় যুগল রাধাশ্যাম
কিশোরী পাশে কিশোর হাসে
ভাসে আনন্দ সাগরে আজ ব্রজধাম
ওগো যুগলরূপ হেরি মুনির মন হরে
পুলকে গগন ছাপিয়া বারি ঝরে
বাজে যমুনা তরঙ্গে শ্যাম শ্যাম নাম।
বনে ময়ূর নাচে ঘন দেয়ার তালে
দোলা লাগে কেতকী কদম ডালে
আকাশে অনুরাগে ইন্দ্রধনু জাগে
হেরে ত্রিলোক থির হয়ে রূপ অভিরাম।

[টুইন, জুলাই, ১৯৩৬। শিল্পী : সমর রায়। অফ. টি. ৪৪৭৫। সুর : নজরুল। ভজন।]

৩৩০

বল দেখি মা নন্দরানী ওগো গোকুলবালা
(ওমা) কেমন করে তোদের ঘরে (মা) এলো নন্দলাল।
(মা তুই) কোন সাধনায় দধি মথন করে
তুললি ননী হৃদয় পাত্র ভরে ;
(তুই) সেই নবনী দিয়ে যতন করে
(মা তুই) গড়লি কি এই ননীর পুতুল
আঁধার চিকণকালা॥
অমন রসবিগ্রহ মা গড়তে পারে কে ?
গোপঝিয়ারী গড়তে পারে কে ?
গোকুল মেয়ে নস তুই মা তুই কুমারের ঝি।
(মাগো) তুই নস যোগিনী তবু স্বগুণ বলে
(মা তুই) শ্রীকৃষ্ণে বাঁধলি উদূখলে
(আমায়) সেই যোগ তুই শিখিয়ে দে মা
বসেই জপমালা॥

[মেগাফোর্স, সেপ্টেম্বর, ১৯৪০। শিল্পী : কমল গাঙ্গুলী। জে. এন. জি. ৫৪৯৮। সুর : নজরুল]

৩৩১

ভুবনময়ী ভবনে এসো সীমার মাঝে এসো অসীমা,
ভক্ত মনের মাধুরী দিয়ে গড়িয়াছি মা তোমার প্রতিমা।
চিন্ময়ী গো ধর মৃন্ময়ীরূপ
কত যুগ মাগো জ্বলিবে পূজাধূপ
মানসপটে বোধন ঘটে
হও চির আসীনা করুণাময়ী মা।
সে কোন অতীতে সুদূর ত্রেতায়
এসেছিলে মা অশিব নাশিনী
আসিলে না আর ধূলির ধরায়
দিলে না মা বর অমৃত ভাষিণী।
কত যুগ গেল কত বরষ মাস
কত বিফল পূজা কত কাঁদন হুতাশ
জাগ যোগমায়া যোগনিদ্রা ভোল
পুন বিশ্বে প্রচার হোক তব মহিমা।

[টুইন, অক্টোবর, ১৯৩৫। শিল্পী : মাতৃপূজারীর দল (রেণু বসু ও দেবেন বিশ্বাস)। এফ. টি. ৪১০১। সুর : নজরুল। ভৈরবী।]

৩৩২

মাগো মহিষাসুর সংহারিণী
অসুর কারায় শৃঙ্খলিতা।
কাঁদিছে মা গো তব দুহিতা॥

[সুরথ উদ্ধার রেকর্ড নাটিকা]

৩৩৩

মোরে পূজারী কর তোমার ঠাকুর ঘরে
হে ত্রিজগতের নাথ।
মোর সকল দেহ লুটাক তোমার পায়ে
(হয়ে) একটি প্রণিপাত॥
নিত্য যেন তোমারি মন্দিরে
চিত্ত আমার ব্যাকুল হয়ে ফিরে

গ্রহ যেমন সূর্যলোক ঘিরে
ঘুরে দিবস রাত॥
মোর নয়ন যেন তোমারি রূপ হেরে
সকল দেখার মাঝে
যেন এ রসনা জপে তোমারি নাম
হে নাথ সকল কাজে।
তোমার চরণ রয় যে শতদলে
তারি পানে মোর মন যেন চলে
নিত্য তোমায় নমস্কারের ছলে
(যেন) যুক্ত থাকে হাত॥

[টুইন, মে, ১৯৩৮। শিল্পী : কার্তিকচন্দ্র দাস। এফ. টি. ১২৩৭৩। সুর : নজরুল।]

৩৩৪

মা মোরে মায়ার ডোরে বাঁধিস যদি মা
তোরেই সে ডোর খুলতে হবে।
খুলিয়া মায়া ডোর মুছিবি আঁখি লোর
(আমি) আকুল হয়ে মা কাঁদব যবে॥
ওমা তোর কালি নাম যখনই মনে হয়
মনের কালিমা অমনই হয় লয়
অভাবে দুঃখে শোকে আমার কিবা ভয়
আমি যে গর্ব করি তোরি গরবে॥
শত অপরাধ করে দিনের খেলায়
ছুটে আসি তোর কোলে সন্ধ্যাবেলায়
সংসার পথে মা মাখি যতই ধূলি
মুছিয়ে রাঙা হাতে কোলে নিবি তুলি
আমি সেই ভরসাতে মা হাসি খেলি ভবে॥

[হিজ, অক্টোবর, ১৯৪৪)। শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ। এন. ২৭৪৮২। সুর : চিত্ত রায়।]

৩৩৫

ললাটে মোর তিলক এঁকো মুছে বঁধুর চরণ ধূলি
আঁখিতে মোর কাজল মেখো ঘনশ্যামের বরনগুলি॥

বঁধুর কথা মধুর প্রিয় কর্ণমূলে দুলিয়ে দিও
বক্ষে আমার হার পরিও বঁধুর পায়ের নূপুর খুলি॥
(তার) পীত বসন দিয়ে করো এই যোগিনীর উত্তরীয়
হবে অঙ্গেরি চন্দন আমার কলঙ্ক তার মুছে নিও।
সে দেয় যা ফেলে মনের ভুলে
তাই অঞ্চলে মোর দিও তুলে
(তার) বনমালার বাসি ফুলে ভরো আমার ভিক্ষা ঝুলি॥

[তথ্যের উৎস : রেকর্ড লেবেল। হিজ, ডিসেম্বর, ১৯৩৬। শিল্পী : শ্রীমতী বীণাপানি মুখার্জী (মধুপুর)। এন. ৯৮১৭।]

৩৩৬

সখি কই গোপীবল্লভ শ্যামল পল্লব কান্তি
সখি আমার হরি বিনে হরি চন্দনে নাহি শান্তি।
ঐ দেখ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে
ও নহে কদম তমাল পিয়াল পিয়া মোর ঐ দাঁড়িয়ে।
ও নহে তরুণ শাখা ও যে মোর বঁধু আসে বাহু বাড়িয়ে।
পুষ্প পাগল তরু কি কখনো দুলে গো অমন করিয়া
(ও যে) বনমালা গলে বনমালি মোর নাচিছে হেলিয়া দুলিয়া।
তোরা দেখে আয় তোরা দেখে আয়
অভিমানে শ্যাম আসিছে না কাছে
ডেকে আয় তারে ডেকে আয়।
তারি বিগলিত নীল লাবণি কি ঐ
যমুনার কালো জলে
বিজলির আঁখি ইঙ্গিতে সে কি
ডাকে মোরে মেঘ দলে।
সখি গো ! তোরা যেতে দে মোরে যেতে দে
আর দিস্ নে বাধা
(ঐ) গহন কালোতে গাহন করিয়া
জুড়াক আলোক রাধা॥

[তথ্যের উৎস : আজাহারউদ্দীন তালিকা ও নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। টুইন, জুন, ১৯৩৪। শিল্পী : সুধীরা সেনগুপ্ত। এফ. টি. ৩৩০০। কীর্তন। পাণ্ডুলিপি ও রেকর্ডের বাণীর মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে।]

৩৩৭

সখি কেন এত সাজিলাম যতন করি
জাগিয়া পোহাল হায় বিভাবরী
চাহিতে মুকুর পানে
সজ্জা লজ্জা স্থানে।
অভিমানে লুটাইয়া কাঁদে কবরী।
সখি, লুকায়ে হাসিবে সবে দেখিয়া মোরে
বল এ মুখ দেখাব আমি কেমন করে?
সখি ঐ দেখ লোকে জাগে
কেহ জাগিবার আগে
নিয়ে চল যমুনাতে ডুবিয়া মরি॥

[তথ্যের উৎস : রেকর্ড লেবেল। টুইন, জানুয়ারি, ১৯৩৭। শিল্পী : শান্তা বসু। এফ. টি. ৪৭৪৭। রেকর্ডের 'চাহিতে মুকুর পানে' পংক্তিটি রেকর্ড বুলেটিনে রয়েছে—'চাহিয়া মুকুর পানে।']

৩৩৮

সখি এবার রাধার আধার ভাঙিয়া
মিশিব হরির সঙ্গে।
সে কেমন লীলা মাধুরী
আমি ডুবিব রস শেখর অঙ্গে।
ভালো মন্দ দেখবো না তার
সাঁতারির লীলার পাথার
দেখিব সখি—
সে কেমন লীলা মাধুরী
আমি ডুবিব রস শেখর অঙ্গে
মিশিব হরির সঙ্গে॥

['কমল দাশগুপ্তের কথা' : আসাদুল হক, নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, বাংলাদেশ, ভাদ্র, ১৩৯৪।]

৩৩৯

সখি গো বৃথা প্রবোধ দিস নে
কোন প্রাণে তুই বলতে পারিলি মোর শ্রীকৃষ্ণে ভুলিতে।
সেই নন্দপুরের চন্দ্র বিহনে নাহি আনন্দ মোর
তারে না হেরিলে তিলেকের তরে বাঁচে না চিতচকোর।

বলে দে বলে দে কোথা আমার প্রাণসখা
ভাসি আমি আঁখিনীরে
কেঁদে কেঁদে অন্ধ হলাম
ভাসি আমি আঁখিনীরে।
সখি, এই তো আমার সাধনা
আমার মতো জগত কাঁদুক এই তো আমার কামনা
কাঁদতে হবে,
যে হরিবে মোর হরিবে তায়
রাধার মতো কাঁদতে হবে।
সে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে চিরজীবন কাঁদবে ভবে।
সখি কাঁদলে তারে যায় না পাওয়া
তাহলে সখি আমি পেতাম।
যদি কাঁদলে তারে পাওয়া যেত
যশোমতী তারে হারাতো না।
সে যে প্রেমের চিরকাঙাল
প্রেম বিনে তায় যায় না পাওয়া।

[টুইন, সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫। শিল্পী : চিত্ত রায়। এফ. টি. ১৩৯৭৭। সুর : চিত্ত রায়।]

৩৪০

সখিরে আমি তো নিয়েছি বঁধুরে কিনে॥
আমি যে সবার মাঝে
কিনেছি যে ব্রজ রাজে
তবু কেন মোরে কহে চোর
কেহ কহে লইয়াছি ছিনে॥
যাহার যাহা সাধ বলুক না ওরা
কেহ বলে কালো কেহ বলে গোরা
আমি তো লয়েছি সখি আঁখি খুলে চিনে॥
কেহ নির্গুণ কয়
কেহ কহে গুণময়
আমি জানি প্রেমময় গো—
আমি দিয়েছি তাহারে মোর অঙ্গের ভূষণ
মনি মুকুতার হার মুকুট ও কঙ্কন
পূর্ব জনমের শপথ ছিল তাই
মীরা লয়েছে তার গিরিধারী চিনে॥

['কমল দাশগুপ্তের কথা : আসাদুল হক, নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, বাংলাদেশ, ভাদ্র, ১৩৯৪।]

৩৪১

সন্ধ্যা হলো ওগো রাখাল এবার ডাক মোরে
বেণুর রবে ধেনু গণে ডাক যেমন করে
সংসারেরি গহন বনে ঘুরে ফিরি শূন্য মনে
ডাকবে কখন বাঁশির স্বনে আমায় আপন ঘরে।
ভেঙেছে মোর প্রাণের মেলা ভেঙ্গেছে মোর খেলা
মোরে ডাক এবার তোমার পায়ে, আর করো না হেলা
মোর জীবনের কিশোর রাখাল
বাঁশি শুনে কাটল সকাল
তন্দ্রা আন ক্লান্ত চোখে
তোমার সুরের ঘোরে।

[টুইন, জুলাই, ১৯৩৫। শিল্পী :-শ্রীমতী আশালতা রায়। এফ. টি. ৪১০৫। সুর : নজরুল। মালবশ্রী।]

৩৪২

সদা হরিরস-মদিরায় মাতাল যে জন
আমি শিরে ধরি তার মদ অলস চরণ।।
যে কলঙ্কিনী নারী
আপন পতিরে ছাড়ি
শ্রীহরিরে পতিরূপে করেছে বরণ
তার কলঙ্ক-কালী মোর গোপী চন্দন।।
যে গুহকে কোল দেন আপনি শ্রীরাম
সেই চণ্ডালের পায়ে আমার প্রণাম
উৎপীড়নের ছলে
যে অসুর কৌশলে
ধরিয়াছে শিরে শ্রীহরির শ্রীচরণ
আমি যাচি সেই গয়াসুরের স্মরণ।।

[তথ্যের উৎস : প্রবর্তক, চৈত্র, ১৩৪৩।]

৩৪৩

(হরি) নাচত নন্দদুলাল
শ্যামল সুন্দর মদন মনোহর
নওল কিশোর কানাইয়া গোপাল।

নাচত গিরিধারী ময়ূর মুকুট পরি
দিকে দিকে ছন্দ আনন্দ পড়িছে ঝরি
নাচে গোপী সখা বংশিওয়ালা হরি
রুনুঝুনু বাজাওতো ঘুঙ্গুর তাল॥

[তথ্যের উৎস : ১লা আগস্ট, ১৯৩৬, বেতার জগৎ ও নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। মীরাবাঈ রেকর্ড নাটিকা। শিল্পী : মিস প্রভা।]

৩৪৪

হরি প্রভু বলে মোরা দূরে রাখি
তুমি তাই দূরে থাক সরে
পাষাণ দেউলে রাখিয়াছি হায়
তোমারে পাষাণ করে।
তোমায় পেয়েছিল গোপিনীরা
সে দিনও পেয়েছে মীরা
ডেকে প্রিয়তম বলে
গোপাল বলিয়া ডাকিয়া পাইল
যশোদা ও শচী কোলে
অন্তরতম হতে নিশিদিন
কাঁদ তুমি অন্তরে
দেবতা ভাবিয়া পূজা দিই মোরা তুমি তাহা নাহি খাও
তুমি লুকায়ে ভিখারি সাজিয়া মোদের পাতের অন্ন চাও
রাখাল ছেলের আধ খাওয়া ফল
কেড়ে খাও তুমি হে চির-সরল
মোরা ভয় করি তাই লুকাইয়া থাক
তুমি অভিমান ভরে॥

[মেগাফোন, মে, ১৯৪০। শিল্পী : ভবানীচরণ দাস। জে. এন. জি. ৫৪৭৩। সুর : নজরুল।]

৩৪৫

হায় ভিখারি কাহার কাছে হাত পাতিলে হায়।
তোমায় চেয়েও আমি যে দীন কাঙাল অসহায়।
আমার হয়তো কিছু ছিল কভু
সব নিয়েছেন কেড়ে প্রভু

আমায় তিনি নেননি তবু
তাঁহার রাঙ্গা পায়।
তোমায় তিনি পথ দেখালেন
ভাবনা কিসের ভাই
তোমার আছে ভিক্ষা ঝুলি
আমার তাহাও নাই।
চাইনে তবু আছি পড়ে
সংসারেরে জড়িয়ে ধরে
কবে তোমার মতন পথের ধূলি
মাখব সারা গায়।

[টুইন, অক্টোবর, ১৯৩৫। শিল্পী : শ্রীমতী আশালতা রায়। এফ. টি. ৪১০৫।]

৩৪৬

হোরি খেলে নন্দলালা
প্রেমের রঙে মাতোয়ালা।
বিশ্ব-রাধা সে সাথে
রঙের খেলায় মাতে॥
রাঙা আলোক আবীর ছড়ায়
ভরি রবি শশী থালা॥
আজি বনে বনে মনে মনে হোরি
মনের মরুতে লতায় তরুতে
রাঙা ফুল ফোটে মরি ! মরি !
আজি প্রাণে প্রাণে ফুলদোল
দোল পূর্ণিমা রাতি রাঙা ফুল-তারা দীতি
ধরণিতে আকাশে জ্বালা॥

[তথ্যের উৎস : নিতাই ঘটকের খাতা ও নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পাণ্ডুলিপি ও রেকর্ডের বাণীর মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। ছন্দেও পার্থক্য আছে। পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী ছন্দ ত্রিমাত্রিক অর্থাৎ দাদরা কিন্তু রেকর্ডে তালফেরতা (দাদরা ও ত্রিতাল)। পাণ্ডুলিপিতে 'রঙের খেলায় মাতে' এই পংক্তির পর 'রঙে রঙে ত্রিভুবন ছায়' এই পংক্তিটি রয়েছে—যা রেকর্ডে নেই।]

৩৪৭

দেব আশীর্বাদ—লহ সতী পুণ্যবতী
লহ ত্রিলোকের আশিস বাণী—লহ লহ আয়ুষ্মতী॥
ধর পূজা আরতির শুভ বরণ ডালা
পর স্বর্গের মন্দার পারিজাত মালা,
রবি দিল কুণ্ডল সাগর মুকুতা দল
চাঁদ দিল চন্দন স্নিগ্ধ জ্যোতি॥
মঙ্গল ঘট দিল দেবী মেদিনী
পুণ্য সলিল দিল মন্দাকিনী
অগ্নি দিলেন দীপ—শুকতারা দিল টিপ
দিল ধান্য দূর্বা মুনি ঋষি তপতী॥
বিষ্ণু দিলেন তাঁর লীলা কমল
ব্রহ্মা দিলেন কমণ্ডলু জল—
সিঁথির সিন্দুর ভূষা দিলেন অরুণা উষা
(চির) এয়োতির নোয়া দিল অরুন্ধতী॥

[মন্মথ রায় রচিত 'সতী' নাটকের গান।]

৩৪৮

বিরূপ আঁখির কি রূপই তুই আঁকলি হৃদয় পটে,
চাঁদের পাশে আগুন জ্বলে যাহার ললাট তটে॥
সে সোনার অঙ্গে ভস্ম মাখিয়ে
বেড়িয়ে বেড়ায় সাপ-নাচিয়ে ;
এই ভবঘুরে বেদে নিয়ে তোর কলঙ্ক না রটে॥
ঘটে ইহার বুদ্ধি হতে সিদ্ধি অনেক বেশি,
বিষ খেয়ে এঁর প্রশান্ত মুখ লীলা এ কোন দেশী,
আপনারে যে করে হেলা
তার সনে তোর একি খেলা,
তুই দেখলি কোথায় আত্মভোলা
এই সে তরুণ নটে॥

[মন্মথ রায় রচিত 'সতী' নাটকের গান।]

৩৪৯

বাবার হলো বিয়ে
ষাঁড়ের পিঠে চড়েরে ভাই—
(সাপের) খোলস মাথায় দিয়ে॥
বাবার জটায় ছিলেন গঙ্গা এবার কোথায় এলেন সতী
প্রাণের কোঠায় এলেন সতী
আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি পেলেন পরম পতি :
মাকে দেখে রেগে মেগে পেত্নীরা সব গেল ভেগে
(আজ) গৃহীর দীক্ষা নিলেন বাবা দাক্ষায়ণী নিয়ে॥
মোরা মা আসবার অনেক আগে জন্মে আছি ঘরে
এই অগ্রপথিক ছেলেদের মা চিনবে কেমন করে ;
বাজা রে সব বগল বাজা, আর খাব না সিদ্ধি গাঁজা
এই ভূতেরা সব মানুষ হবে (মায়ের) স্নেহ সুধা পিয়ে॥

[মন্মথ রায় রচিত 'সতী' নাটকের গান]

৩৫০

দেবী তোমার চরণ কমল রাঙা তরুণ রাগে
রাঙা আবির কুঙ্কুম ফাগে।
কি হবে আলতা পরায়ে (যে পায়)
সন্ধ্যা উষা সদা জাগে॥
রাঙা রামধনু হেরিয়া যে পায়
উঠিয়া লুকায় নিমেষে লজ্জায়
অশোক কিংশুক অঞ্জলি হয়ে চরণে শরণ মাগে॥
তব চরণ-রাগ নব বসন্তে
জাগে ফুলদলে নারী সীমন্তে
রবি শশী তারা হলো জ্যোতির্ময়—তব চরণ অনুরাগে॥

[মন্মথ রায় রচিত 'সতী' নাটকের গান।]

৩৫১

বাজো বাঁশরি বাজো বাঁশরি বাজো বাঁশরি
বাজো বাজো বাজো
আসে নন্দন নন্দিনী আনন্দিনী
সবে উৎসব সাজে সাজে॥
পুষ্প মাল্য আনো, আনো হেম ঝারি ;
মঙ্গল ঘটে আনো তীর্থ বারি ;
লাজ অঞ্জলি লয়ে পুরাঙ্গনা নগর ভবনে ভবনে বিরাজো॥
হংস-মিথুন আঁকা নীলাম্বরী,
পরি এসো তরুণী নাগরী কিশোরী,
চলো পথে পথে গাহি আগমনী
ঘরে আলসে বসিয়া কে আছিস আজো॥

[মন্মথ রায় রচিত 'সতী' নাটকের গান।]

৩৫২

পাষাণী মেয়ে ! আয়, আয় বুকে আয়।
জগত জননী হয়ে কি মাগো জননীরে কাঁদায়॥
রাজার দুলালী কোন অভিমানে
ভিখারিনি হয়ে বেড়াস শ্মশানে
ত্রিলোকের যত পতিত অধমে ঠাঁই দিয়েছিস পায়॥
তোর সোনার বরন হইয়াছে কালি বলে এসে কত লোকে,
কুস্বপন দেখে জেগে উঠি প্রাতে ধারা বহে মাগো চোখে—
ক্ষীর নবনীর থালা কাছে রাখি
কাঁদি আর তোর নাম ধরে ডাকি
তোরে যে মাগো খোঁজে মোর আঁখি
প্রতি—রূপ—প্রতিমায়॥

[মন্মথ রায় রচিত 'সতী' নাটকের গান]

৩৫৩

ত্রিভুবনবাসী যুগল মিলন দেখরে দেখ চেয়ে।
পাহাড়ী বাবার পাশে রাজদুলালী মেয়ে॥

দেবতা মোদের হর পরম মনোহর
হরমনোহারিণী তার চেয়ে সুন্দর
যেন ঝরে রূপের পাগল ঝোরা ধবল গিরি বেয়ে॥
বরফের পাহাড় ঘিরে ভোরের সোনার আলো
আছে থির হয়ে যেন দেখে চোখ জুড়াল ;
চাঁদ যেন লো লতা হয়ে
(আছে) চন্দ্রচূড়ে ছেয়ে॥

[মন্মথ রায় রচিত 'সতী' নাটকের গান]

৩৫৪

সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইল মাগো
তুমি ফিরিলে না ঘরে।
শূন্য ভবনে ভয়ে ভয়ে মরি মা
মন যে কেমন করে॥
তোমার বিরহে মা গভীর বিষাদে
শ্মশানে মশানে মহাকাল কাঁদে
সূর্যে তেজ নাই জ্যোতি নাই চাঁদে
উঠিয়াছে হাহাকার চরাচরে॥
ক্ষুধার অন্ন নাই শুধায়না কেহ—
উপবাসী চিত্ত চায় মার স্নেহ।
মাতৃহারা হয়ে বিশ্বের সন্তান
ফিরে আয় ফিরে আয় ডাকে কাতরে॥

[মন্মথ রায় রচিত 'সতী' নাটকের গান]

৩৫৫

ঐ কালো অঙ্গ রাঙা হবে
মোদের রঙ্গের পিচকারিতে।
এসো ও শ্যাম নাইবে যদি
গুলাল ফাগের রং—ঝারিতে॥

আজ ফাগুনের আগুন সাথে
প্রেম আগুনে পরান মাতে
তোমায় সেই প্রেমেরই রাঙা রঙে
এসেছি শ্যাম রাঙিয়ে দিতে॥

[তথ্যের উৎস : জগৎ ঘটকের পাণ্ডুলিপি। বেতারে অনুষ্ঠিত প্রবাহ ও জীবনস্রোত গীতি আলেখ্যের গান]

৩৫৬

চলে ঐ আনন্দে ঝর্ণারানী
নৃত্যভঙ্গে দোলে অঙ্গখানি।
সে নাচ ছন্দে ঝরে স্বর্ণরেণু
বন রাখাল বাজায় মোহন বেণু
আবেশে অবশ আজি শ্যাম বনানি॥
হেরে সে নৃত্য ঐ শত তারকা;
গগনে খুলিয়া আজি মেঘ ঝরোকা।
বিহগ বিহগী নাচে শিখরে শিখী
তরুলতা সাথে নাচে কাননে মৃগী
করে চাঁদিমায় রজনীতে কানাকানি॥

[তথ্যের উৎস : জগৎ ঘটকের পাণ্ডুলিপি। বেতারে অনুষ্ঠিত প্রবাহ ও জীবনস্রোত গীতি আলেখ্যের গান]

৩৫৭

জল ফেলে জল আনতে গেলি
ওলো কূলের রাধা;
ছল করে তুই নামলি ঘাটে
ভাঙতে কূলের বাধা॥
কদমতলায় রাখাল ছেলে
বাজায় বসে বাঁশি
তাই শুনে তুই আসলি ছুটে ওলো সর্বনাশী।
ঘরের বাঁধন সইল না তোর রইলি না তাই বাঁধা।
জটিলা শাশুড়ি রে তোর কুটিলা ননদী
শাস্তি তোরে দেবে কঠিন জানতে পারে যদি।

নন্দের নন্দন ও কালা
মানে নাকো মানা।
কত বধূর কুল ভাঙ্গালো
নেই কো যে অজানা।
ঐ বাঁশির সুরে যাদু আছে শেষে
সার হবে তোর কাঁদা॥

[তথ্যের উৎস : জগৎ ঘটকের পাণ্ডুলিপি। বেতারে অনুষ্ঠিত প্রবাহ ও জীবনস্রোত গীতি আলেখ্যের গান।]

৩৫৮

ওরে ব্যাকুল বেণুবন
তোকে দিয়েই হতো শ্যামের মুরলি মোহন॥
তোর শাখাতে লেগে আছে শ্যামের হাতের ছোঁয়া
আজো কি তার পরশ লোভে ডালগুলি তার নোওয়া
আমার পড়লো মনে
তোরে দেখে ও বেণুবন পড়লো মনে
বৃন্দাবনে যে সাতটি সুর বাজাত
শ্যাম বাঁশির শুনে॥
তার প্রথম সুরে
আয় আয় বলে গোপিকায় ডাকে দূরে
তার দ্বিতীয় সুরে
বহে যমুনা উজান ব্রজকুমারী ঝুরে।
তার তৃতীয় সুরে
সেই সুরে বাজে তার পায়ের নূপুর
সেই সুর শুনে নাচে বনের ময়ূর
শুনি চতুর্থ সুর
গুরু গম্ভীর রোল
মেঘে মৃদঙ্গ বাজে লাগে ঝুলনায় দোল।

৩৫৯

পঞ্চম সুরে তার
কোয়েলা বোলে
ব্রজ বসন্ত আসে মাতে হোরির রোলে।

ষষ্ঠ সুরে
কেঁদে ডাকে সে রাধায়
সপ্তমে নিষাদ সে ভুবন কাঁদায়।
(আখর)
নিষাদ সে তাই সাধ মিটিল না
ডাকিয়া বাঁশির সুরে বধে হরিণীরে
নিষাদ সে
তারে ভালোবেসে সাধ মেটে না
নিষাদ সে॥

[তথ্যের উৎস : আজাহারউদ্দীন তালিকা ও আসাদুল হকের সাক্ষাৎকার : বাবু রহমান, নজরুল একাডেমী পত্রিকা, বাংলাদেশ, গ্রীষ্ম ১৩৯৪। বেতার জগৎ ১-৬-৩৯। গানটি বেতারে ১১/৬/৩৯ তারিখে বিজনবালা ঘোষ দস্তিদার গেয়েছিলেন। জনাব আসাদুল হক বিজনবালা ঘোষ দস্তিদারের খাতা হতে সংগ্রহ করেছিলেন।]

৩৬০

জগতের নাথ, তুমি, তুমি প্রভু প্রেমময়
(আমি) জগতের বাহিরে নহি দেহ চরণে আশ্রয়।
যাহাদের তরে আমি খাটিনু দিবস রাতি
(আমার) যাবার বেলায় কেহ তাদের হলো না সাথের সাথী
সম্পদ মোর পাঁচ ভূতে খায়
কর্ম কেবল সঙ্গে রয়॥
ভুলিয়া সংসার মোহে লই নাই তোমার নাম,
তরাতে এমন পাপী পাবে না হে ঘনশ্যাম।
শুনেছি তোমারে যদি কাঁদিয়া কেহ ডাকে,
তুমি অমনি তারে কর ক্ষমা চরণে রাখ তাকে,
(আমি) সেই আশাতে এসেছি নাথ
যদি তব কৃপা হয়॥

[টুইন, অক্টোবর, ১৯৩৬। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। এফ. টি. ৪৬০৭। সুর : নজরুল। রেকর্ড বুলেটিনে প্রকাশিত বাণীর সাথে রেকর্ডধৃত বাণীর সামান্য পার্থক্য আছে, যথা :

	বুলেটিন :		বুলেটিন :
ক.	যাবার বেলায় তাদের কেহ হলো না সাথের সাথী	ক.	আমার যাবার বেলায় কেহ তাদের হলো না সাথের সাথী
খ.	তুমি অমনি তায় কর ক্ষমা চরণে রাখ তাকে	খ.	তুমি অমনি তারে কর ক্ষমা চরণে রাখ তাকে

৩৬১

তুমি লহ প্রভু আমার সংসারেরই ভার
লহ সংসারেরই ভার।
আজকে অতি ক্লান্ত আমি বইতে নারি আর
এ ভার বইতে নারি আর।
সংসারেরই তরে খেটে
জন্ম আমার গেল কেটে
তবু অভাব ঘুচল না হায়
খাটাই হলো সার।
বিফল যখন হলাম পেতে
সবার কাছে হাত
তখন তোমায় পড়ল মনে
হে অনাথের নাথ
অভাবকে আর করি না ভয়
তোমার ভাবে মগ্ন হৃদয়
তোমায় ফিরিয়ে দিলাম হে মায়াময়
তোমারি সংসার।

[টুইন, সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫। শিল্পী : আবদুল লতিফ। এফ. টি. ৪০৭৪।]

৩৬২

তুমি সুন্দর কপট হে নাথ মায়াতে রাখ বিভোর।
তোমার ছলনা যে বুঝে না নাথ সেই সে দুঃখী ঘোর॥
কত শত রূপে নিঠুর আঘাতে
তুমি চাও নাথ তোমারে ভোলাতে
তবু যে তোমারে ভুলিতে পারে না
ধরা দাও তারে চোর॥
কাঁদাও তাহারে নিশিদিন তুমি
জপে যে তোমার নাম,
তোমারে যে চাহে শত বন্ধনে
বাঁধ তারে অবিরাম।
সাগরে মিশিতে চায় বলে নদী
জনম গোঁয়ায় কেঁদে নিরবধি

ভক্তে তেমনি দিয়াছ হে নাথ
অসীম আঁখিলোর॥

[টুইন, ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭। আবদুল লতিফ। এফ. টি. ৪৭৭৫ ; সুর : কে. মল্লিক।]

ইসলামী সংগীত

৩৬৩

আল্লা নামের দরখতে ভাই ফুটেছে এক ফুল
তাঁরে কেউ বলে মোস্তফা নবী কেউ বলে রসুল॥
পরগম্বর ফেরেস্তা হুর পরী ফকির ওলি
খুঁজে জমিন আসমান ভাই দেখতে সে ফুল—কলি
সে ফুল যে দেখেছে সেই হয়েছে বেহেশতি বুলবুল॥
আল্লা নামের দরিয়াতে ভাই উঠলো প্রেমের ঢেউ,
তারে কেউ বলে আমিনা দুলাল, মোহাম্মদ কয় কেউ,
সে ঢেউ যে দেখেছে সে পেয়েছে অকূলেরও কূল॥
আল্লা নামের খনিতে ভাই উঠেছে এক মণি
কোটি কোহিনূর ম্লান হয়ে যায় হেরি তার রোশনি
সেই মণির রঙে উঠলে রেঙে ঈদের চাঁদের দুল
তাঁরে কেউ বলে মোস্তফা নবী, কেউ বলে রসুল॥

[মেগাফোন, মে, ১৯৪০। শিল্পী : অনন্তবালা। জে. এন. জি. ৫৪৭১। সুর : নজরুল।]

৩৬৪

ঈদ মোবারক হোক আজি ঈদ মোবারক হোক।
সব ঘরে পঁহুচুক এ ঈদের চাঁদের আলোক।
যে আছে আজ প্রাণের কাছে আছে আপন পুরে
যে আছে পরদেশে যার লাগি নয়ন ঝুরে
আজ সবারে বারে বারে খোশ খবরি কোক॥
আজের মতো দিলে দিলে থাকুক মহাব্বত
আজের মত খুশি থাকুক সবার তবিয়ত
কারো যেন থাকে না আর দুঃখ ব্যথা শোক॥

আজের মতো এক জামাতে মিলন ঈদগাহে
দাঁড়াই যেন চলি যেন খোদারই রাহে
দীন ইসলামের এ কওমি যোশ জিন্দা হোক॥

[হিজ, ডিসেম্বর, ১৯৩৬। শিল্পী : লুতফাউন্নিসা। এন. ৯৮২৫]

৩৬৫

এলো রমজানেরই চাঁদ এবার দুনিয়াদারি ভোল
সারা বরষ ছিলি গাফেল এবার আঁখি খোল॥
এই একমাস রোজা রেখে, পরহেজ থাক্ গুনাহ থেকে
কিয়ামতের নিয়ামত তোর ঝুলি ভরে তোল॥
বন্দি রহে এই মাসে শয়তান মালাউন
এই মাসে যা করবি সওয়াব দর্জা হাজার গুণ
তার দর্জা হাজার গুণ।
ভোগ বিলাসের মাখলি যে পাঁক
রমজানে তা হবে রে সাফ
এফতারের তোর করবে সামান আল্লা রসুল বোল॥

[হিজ, ডিসেম্বর, ১৯৩৬। শিল্পী : রাবেয়া খাতুন। এন. ৯৮২২। রেকর্ড লেবেলে মুদ্রিত—কথা : কাজী নজরুল।]

৩৬৬

খোদার রহম চাহ যদি নবীজিরে ধর
নবীজিরে মুর্শিদ কর নবীর কলমা পড়।
আল্লা যে ভাই অসীম সাগর
কয়জন জানে তাঁহার খবর
(যদি) ঐ সাগরে যাবে নবী নামের নায়ে চড়।
নবীর সুপারিশ বিনা আল্লার দরবারে
কেউ যেতে নাহি পারে
ও ভাই আল্লা যেন সুর সেই সুরে সুমধুর
বাজে নবীর বীণা তারে।

আল্লা নামের ঝিনুকে ভাই মুক্তা যেন নবী
আল্লা নামের আসমানে ভাই নবী যেন রবি
প্রিয় মোহাম্মদের নামরে ভাই আল্লাতালার চাবি
খোদা দয়া করবেন সদা নবীরে সার কর।

[মেগাফোন, মে, ১৯৪০। শিল্পী : অনন্তবালা। জে. এন. জি. ৫৪৭১। সুর : নজরুল]

৩৬৭

ছয় লতিফার উর্ধ্বে আমার আরফাত ময়দান ;
তারি মাঝে আছে কারা জানে বুজর্গান॥
যবে হজরতেরি নাম জপি ভাই হাজার হজের আনন্দ পাই,
জীবন মরণ দুই উটে ভাই দেই সেথা কোরবান॥
আমি তুর পাহাড়ে সুর শুনে ভাই প্রেমানন্দে গলি,
ফানাফির রসুলে আমি হেরার পথে চলি।
হজরতের কদম চুমি হিজরে আসোয়াদ
ইব্রাহিমের কোলে চড়ে দেখি ঈদের চাঁদ
মোরে খোদবা শুনান ইমাম হয়ে জিব্রাইল কোরআন॥

[টুইন, নভেম্বর, ১৯৪১। শিল্পী : মিঃ আসরফ আলি। এফ. টি. ১৩৭০৬।]

৩৬৮

তোমার গরবে গরব আমার আল্লা পরম স্বামী।
(মোর) অন্তর বাহির জুড়িয়ে থেক যেন দিবাযামী॥
আমি যদি পথ ভুলি, আল্লা, হাত ধরে ফিরাইও
মোর নিবেদিত দেহ-মন-প্রাণ কবুল করিও প্রিয়
(তব) পরমাশ্রয় ছেড়ে যেন আর ধূলি পথে নাহি নামি॥
প্রেম যদি মোরে নাহি দাও, খোদা, পরম বিরহ দিও
পাষাণ এ প্রাণ তোমার বিরহে তিলে তিলে গলাইও।
কোথায় দুনিয়া কোথা আখেরাত, তুমি ছাড়া কিছু নাই,
তুমি লা-শরিক—এই বিশ্বাস চিরদিন যেন পাই
রহমত দিয়া ফুল ফুটাইও ভুল যদি করি আমি॥

[টুইন, নভেম্বর, ১৯৪১। শিল্পী : মিঃ আসরফ আলি। এফ. টি. ১৩৭০৬।]

৩৬৯

তোমারি মহিমা গাই বিশ্বপালক কর তার।
করুণা কৃপার তব নাহি সীমা নাহি পার।
রোজ হাশরের বিচার দিনে তুমি মালিক অ্যায় খোদা।
আরাধনা করি প্রভু আমরা কেবলি তোমার॥
সহায় যাচি তোমারি নাথ দেখাও মোদের সরল পথ।
তাদের পথে চালাও খোদা বিলাও যাদের পুরস্কার।
অবিশ্বাসী ধর্মহারা যাহারা সে ভ্রান্ত পথ
চালাও না তাদের পথে এই চাহি পরওয়ার–দেগার॥

[হিজ, নভেম্বর, ১৯৩২। শিল্পী : মহ: কাশেম। এন. ৭০৫৬।]

৩৭০

নতুন করে রেজওয়ান জান্নাত সাজায়—আজ রোজায়
লাগল চাবি দোজখেরই দরওয়াজায়—আজ রোজায়।
মসজিদেরই মিনার চূড়ে
আজ বেহেশতি নিশান উড়ে
গাফলতি নাই আর কারো নামাজ কাজায়—আজ রোজায়॥
রোজার শবে–কদর রাতে
কোরান এলো দুনিয়াতে
ফেরেশতা সব সালাম জানায় মোর্তজায়
আজ রোজায়॥

[রেকর্ড লেবেলে মুদ্রিত : কথা : কাজী নজরুল। হিজ, ডিসেম্বর, ১৯৩৬। শিল্পী : রাবেয়া খাতুন। এন. ৯৮২২।]

৩৭১

পাপে তাপে মগ্ন আমি জানি জানি তবু
পাপের চেয়ে তোমার ক্ষমা অনেক অধিক প্রভু॥
শিশু যেমন সারা বেলায় ধুলা মাখে
খেলার শেষে সন্ধ্যাবেলায় মাকে ডাকে,
(ওগো) ধুলায় মলিন সে ছেলেরে মা কি ত্যাজে কভু॥

তোমার ক্ষমা যে দেখেছে হে মোর প্রেমময়
অশেষ পাপে পাপী হলেও করে না সে ভয়॥
মুছবে তুমি তুমিও যদি মাখাও ধূলি
কাঁদাও যদি তুমি নেবে কোলে তুলি,
আমি তাই করি যা করাও তুমি হে লীলাময় প্রভু॥

[টুইন, ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭। শিল্পী : আবদুল লতিফ। এফ. টি. ৪৭৭৫। সুর : কে. মল্লিক।]

৩৭২

ফিরদৌসের শিরনি এলো ঈদের চাঁদের তশতরিতে
লুট করে নে বনি আদম ফেরেশতা আর হুরপরীতে॥
চোখের পানি হারাম আজি
চলুক খুশির আতস বাজি
(তার) মউজ লাগুক দূর সেতারা
জোহরা আর মোশতরিতে।
দুশমনে আজ দোস্ত মেনে নে
তারে তুই বক্ষে টেনে
হসনে নারাজ দরাজ হাতে
দৌলত তোর বিলিয়ে দিতে
বিলিয়ে দিতে॥

[তথ্যের উৎস : আজাহারউদ্দীন তালিকা/হিজ, ডিসেম্বর, ১৯৩৬। শিল্পী : লুতফাউন্নিসা। এন. ৯৮২৫।]

৩৭৩

মরুর ফুল ঝরিল অবেলাতে
ফোরাত নদী কাঁদে বেদনাতে
সাকিনা কাঁদে পড়ে ধুলায়
হাতের মেহদি মুছিয়া হায়।
কেয়ামত এলো যেন কারবালাতে॥
খুনের বাদল ঝরিছে আসমানে
হুরপরী কাঁদে থির নাহি মানে।

কাঁদিছে আলি ফাতেমা কাঁদে
ঘেরিল মেঘে সূরয চাঁদে
ঝরিছে আঁসু রসুলের আঁখি পাতে॥

[হিজ, মার্চ, ১৯৩৭। শিল্পী : মুসলিম বন্ধুদ্বয়। এন. ৯৮৭২। সুর : শিল্পী।]

৩৭৪

মাঠে আমার ফলল ফসল মনের ফসল কই
শূন্য মনে আল্লা তোমার পানে চেয়ে রই॥
আরব মরুভূমে নবীজিরে পাঠাইলে
আমার মনের মরুভূমি বিফল রাখিলে
গরিব বলে আমি কিগো বান্দা তব নই॥
চাই না যশ মান আমি চাহি না দৌলৎ
আমি চাহি শুধু—তোমার নামেরি সরবত
যে যাহা চায় তুমি নাকি তারে তাহাই দাও
আমার মানত পূর্ণ করে পরান বাঁচাও
আমি যেন আল্লা নামের তস্‌বি শুধু বই॥

[টুইন, আগস্ট, ১৯৪০। শিল্পী : আসরফ আলি। এফ. টি. ১৩৩৯৫। সুর : নজরুল।]

দেশাত্মবোধক

৩৭৫

গাও স্যব ভারত কা প্যারা
ঝাণ্ডা উঁচা র‍্যহে হামারা
হিন্দুস্থানকা তিলক থা বো
মিটগ্যায়ে আব্ মিটগ্যায়ে উয়ো
ভ্যকত তুমহি হো দেশ তুমহারা॥
হিন্দু-মুছলমান স্যব মিলি আও
ভুলো বেদ অ্যর গ্যল ল্যগ যাও
গাও প্রেম নদী কিনারা
ঝাণ্ডা উঁচা র‍্যহে হামারা॥

[হিজ, সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮; শিল্পী : কুমারী বিজনবালা ঘোষ; এন. ১৭১৯০। সুর : শিল্পী।]

৩৭৬

জাগো ভারত রানী
ভারতজন তুমহে চাহে
গগনমে উঠত যো বাণী
সো হি জগজন গাহে॥
রোবত ভারতকে নরনারী
বোলাতা জাগ মাই হামারী
দুঃখ-দৈন্য ভারতকো ঘেরি
তুম অব সেবত কাহে।
নীল সিন্ধু তুম্‌হা লাগি
গ্যারজত ঘন অনুরাগী
কেঁউ নাহি উঠত জাগি
যব্‌ ভারত প্রেম গাহে॥

[হিজ, সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮। কুমারী বিজনবালা ঘোষ। এন. ১৭১৯০। সুর : শিল্পী।]

৩৭৭

হোক প্রবুদ্ধ সঙ্ঘবদ্ধ মোদের মহাভারত
হোক সার্থক নাম।
হোক এই জাতি ধর্মে এক, কর্মে এক, মর্মে এক
এক লক্ষ্যে মধুর সখ্যে
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক আর্যাবর্তধাম।

[সুরথ উদ্ধার রেকর্ড নাটিকা]

কমিক

৩৭৮

কুব্জা কীর্তন

ঐ কুব্জার কি রূপের বাহার দেখো
তারে চিৎ করলে নৌকা যেন উপুড় করলে হয় সাঁকো॥

চিৎ হয়ে সে শুতে গেলে কাৎ হয়ে পড়ে
কুপোকাৎ হয়ে পড়ে
আবার উল্টে গিয়ে ডিগবাজি খায় চাইতে গেলে উপরে
আবার চলতে গেলে ঢেঁকির মতন (হ্যাকোচ প্যাকোচ)
করে সে আঁকো পাঁকো॥
বসলে কোলা ব্যাঙটি যেমন অষ্টাবক্রের পিসি
নেংটির আবার বখেয়া সেলাই মুলো দাঁতে মিশি
চুল নয়তো বাবুই রশি বাঁধতে গেলে রয় নাকো।
শূর্পণখার নখতুতো বোন মাওই মা সে হিড়িম্বের
আবার ঢোলের মতন ঢোলা মাজা পা দুটি উচ্চিড়িঙ্গের
ও কন্যে হোঁদল কুৎকুতে লো দোহাই এবার কুঁজ ঢাকো॥
বলি ও তাড়কার মাসশাশুড়ি তোমার উটের মতন
কুঁজ ঢাকো॥

[তথ্যের উৎস : এইচ. এম. ভি. রয়্যালটি রেজিস্টার। টুইন, জুন, ১৯৩২। শিল্পী : প্রফ: জি. দাস। এফ. টি. ২০২৮।]

৩৭৯

গিন্নীর কাছে গয়নার ফর্দ :

ও গিন্নী বদন তোল একটু হানো নয়না।
আমি জুয়েলারির দোকান হব গায়ে হব গয়না॥
(তোমার) সিঁথের হব সিঁথিপাটি কেশে হেয়ার পিন
চিরুনি হয়ে খোঁপায় বিঁধে রইব চিরদিন।
টায়রা ঝাপটা লেসপিন তাহলে মন্দ হয় না।
টানা টিকলি কাঁটা হব ফুলের নয় গো চুলের
টাপ মাকড়ি দুল হব গো একটু বেশি ঝুলের।
কানের উপর কান হব গো নাকছাবি ঐ নাকের,
কাঁচ পোকা আর খয়েরি টিপ হব ভুরুর ফাঁকে,
নোলক বেসর তাও হব যা আজকাল লোক ছোঁয় না॥
গলার হব হার নেকলেস গজমতির মালা,
হাতে হব বাজু বন্দ, পৈঁচি চুড়ি বালা।
তাগা কেয়ূর, রুলি, শাঁখা, জসম, আংটি, খাড়ু
তাবিজ হব নোয়া হব অনন্ত সুচারু।
ভুলে গেছি—নথ নৈলে গিন্নীর মান রয় না॥

নূপুর তোড়া হ্যাদে দেখো ভুলেই গেছি দেখি
ঝুমকো ঢেঁড়ি চিকের কথা মাদুলাও বাকি,
জাল পাটরি কি হই আর কী যে ফেলে রাখি
বাদ কী গেল দাও লিস্টি মুখ ভার আর সয়না॥

[তথ্যের উৎস : এইচ. এম. ভি. রয়্যালটি রেজিস্টার ও অপ্রকাশিত নজরুল, আবদুল আজীজ আল-আমান, টুইন, মে, ১৯৩৫, শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এফ. টি. ৩৭৯১।]

৩৮০

ও তুই নয়ন কোণে চা
আমায় একবার দেখে যা
আমি গোলোকপতির সখা (বুঝলে কিনা)
নামটি বিরিঞ্চি বাঞ্ছা॥
সেইখানেতে তোমায় আমায় হলো আলাপন
(তোমার বুঝি মনে নেই)
(তুমি) হলদে রংয়ের পরতে শাড়ি
(খাসা শৌখিন ছিলে ঠাকরুন)
গোড়ো গয়লার কড়ে রাঁড়ি
পিছল পথে জল আনিতে হড়কে গিয়ে ভাঙ্গলে পা।
(আমি ঘাটের এক পাশেই ছিলুম)

[মীরাবাঈ রেকর্ড নাটিকা]

৩৮১

গাড়োয়ালি উল্লাস

কলগাড়ি যায় ভোঁসর ভোঁসর হাওয়া গাড়ি খুচুর খুচ
ছ্যাকরা গাড়ি ঘসড় ফসড় ঝড়াং ঝড়াং ঘুচুর ঘুচ॥
চলো সই চলো সই ঘুঁটে কুড়ুতে
না লো সই না লো সই মাথা ধরেছে
ঐ পাড়ার ঐ খালভাৱারা টাকা বাজাচ্ছে
গিজতা গিজাং গিজতা গিজাং জাক জাক জাঘির ঘিনা
জারা ঘিনিতা ঘিসাক দুম খিসাক্ দুম খিসাক্ দুম্।
গরুর গাড়ি ক্যাঁচোর কোঁচর সাইকেল যায় শিরিং সাঁই
ইচিং বিচিং জামাই কিচিং কুল কুচ দেয় পুচুর পুচ॥

উর্‌র বরের মা বরের মা পান দেলো খাই
তোর টিপসে মাজার বালাই যাই
জলকে যাবি না দেখতে পাবি না
দে গরুর গা ধুইয়ে ল্যাজ শুদ্ধু
খা তোর নানার হুঁকো লইচে সমেত।
উর্‌র ভোঁ কিৎ কিৎ বকর বকর জাগ্ জাগ্ জাগির ঘিনা
ল্যাংড়া চলে হ্যাঁকোচ প্যাঁকোচ ধুনুরি যায় ধাপুর ধাই
ডোমনী চলে নিচিক পিচিক চীনে চলে ফুচুং ফুচ॥
উর্‌র্ ও বাবা টোকা ডু-ডুম ও দাদা কুলে ডু-ডম
ও দাদা ডু-ডুম ডু-ডুম
গাই নাই তোর বলদ দুইয়ে দে
বিন্দে পালাচ্ছে গোবিন্দ পালাচ্ছে
ল্যাজ ঠেসে ধর বক দেখেছ?
বকের মাথায় ভালুক নাচে তা দেখেছ?
দেখবি নাকি? মজা দেখবি নাকি?
কুকুর ছা বিড়াল ছা কুকুর ছা বিড়াল ছা
মিয়াও মিয়াও ফ্যচ।

[তথ্যের উৎস : এইচ. এম. ভি. রয়্যালটি রেজিস্টার ও গোলাম কুদ্দুস রচিত 'সুরের আগুন' গ্রন্থ; টুইন, জুন, ১৯৩২। শিল্পী : প্রফ: জি. দাস। এফ. টি. : ২০২৮; কমিক গান।]

৩৮২

স্ত্রী স্তোত্রম্

গ্রহণি-রোগ-সমা গৃহিণী প্রিয়তমা
প্রসীদ! কর ক্ষমা! দেবী নমস্তে।
শতমুখধারিণী ভীমহুঙ্কারিণী
যেন গণ্ডারিণী দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে। দেবী নমস্তে॥
চিৎকারে মাঝ র‍্যাতে পড়শিরা জেগে যায়
তক্তাপোষের নীচে ছেলে পিলে ভেগে যায়
পদভরে দুদ্দাড় ভেঙ্গে পড়ে ঘর দ্বার
চেড়িদের সর্দার হাতা-বেড়ি-হস্তে॥ দেবী নমস্তে॥
শান্তশিষ্ট এই গোবেচারা স্বামী
তোমার পুলিশ কোর্টে চিরকাল আসামী।
তেড়ে আস বীরজায়া তুমি কুঁদো মোটকা॥

বেগতিক দেখে ছুটি আমি রোগা পটকা।
কাঁছাকোঁচা বেসামাল ব্যস্তে সমস্তে॥ দেবী নমেস্ত॥
তুমি পূর্বজন্মে ছিলে ভোজপুরি দারোয়ান
আমি বলীবর্দ তুমি ছিলে গাড়োয়ান ;
ময়দা ছিলাম আমি তুমি নিয়ে ঠাসতে।
আহা হা টুটি টিপে ধর কেন? আস্তে, শ্বস্তে॥ দেবী নমস্তে॥

টুটি কেন টিপে ধর (রেকর্ড)
[তথ্যের উৎস : আজাহারউদ্দীনের তালিকা ও রয়্যালটি রেজিস্টার। হিজ, মে, ১৯৩৪, শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ; এন ৭২৩১ ; রেকর্ড বুলেটিনে প্রকাশিত বাণীর সাথে রেকর্ডধৃত বাণীর সামান্য পার্থক্য রয়েছে ; সেটি তারকা চিহ্নিত অংশে দেখানো হয়েছে।]

৩৮৩

উড়ে গেল উড়ে গেল
কি? কি? চামচিকে উড়ে গেল—বম্
চাম্চিকে চিকে বম্।
ছুকছুকে ছুঁচো চায় কিস্মিস্ চম্চম্।
শিঙে ফোঁকা, ফুঁকো শিঙে,
শিঙে ফোঁকো ফোঁকো হায়! হায়! এইত! এইত! এইত!
শিঙে ফোঁকো বম্ বম্
বম্বে হম্বেটে কম্পম্॥
বেঁটেখাটো বম্বু ল্যাংলেঙে লম্বু
নিট পিটে বম্বম্ বম্বম্ বম্বম্
চক্চকে চাক্তি, চুলবুলে খাক্তি
চুপচাপ যুক্তি ধূমধড়াক্কা দুম্দাম্ দম্দম্॥
কালো কুচকুচে কেঁচো কোঁচকায়
ছিচকে চোরের চোখ বোঁচকায়।
সব চলে গেছে চাবি দিয়ে/কি হবে উপায়?
সব চলে গেছে চিকাগো/চিচিঙে চিটে গুড়
বাবুদের টম্ টম্—দমদমাদ্দম দমদম দমদম
বমবমাম্বম বম্বম্ বম্বম্॥

[তথ্যের উৎস : রেকর্ড লেবেল ও আজাহারউদ্দীনের তালিকা ; রেকর্ড বুলেটিনে গীতিকারের পরিচয়—'জনৈক ওস্তাদ কবি।' হিজ, সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ ; শিল্পী : রঞ্জিত রায় ; এন. ২৭৩৯৯ ; সুর : শিল্পী।]

৩৮৪

দুখের কথা শুনাই কারে ওমা জগদম্বা
বলতে গেলে দম ফুরাবে ফর্দ বেজায় লম্বা !
বাপ মা আমার মারা যেতে পাড়ার বুড়োবুড়ি।
সান্ত্বনারি কথা শোনান—দু কাহন পাঁচকুড়ি !
বললে তারা ভয় কি বাবা ?
(এই আমরা তোমার বাপ মা আছি বাবা)
বল্‌লে তারা ভয় কি বাবা ? রও তুমি নির্ভরসা
আমরা তোমার বাপ মা হলাম কাটল দুখের বরষা।
ভাবলাম এবার দুঃখু কি তোর দেখলাম মা রম্ভা
হায় মা ! আমার ফুটো কপাল, সারবে সে কোন্ মিস্ত্রি
দুদিন বাদেই যমের বাড়ি গেলেন চলে ইস্ত্রী।
পাড়ার এত বৌ থাকতে পোশাকি আটপৌরে
স্বামী আমি আছি বলে কেউ এলো না দৌড়ে।
চক্ষু মেলে রইলুম চেয়ে হায় রে হতভম্বা॥
(আমি) ভাবলাম বউ যাক্‌গে আছেন বহুত শ্বশুর কন্যা
ঝুপ করে কেউ আসবে চলে ছুটবে প্রেমের বন্যা।
(আবার) দেড় গণ্ডা ছেলে মেয়ে পাবেন বিনা কষ্টে
হঠাৎ মাগো দেখি সেদিন এলেন আমারি গোষ্ঠে।
রাজমহিষমর্দিনী এক বিকট নিতম্বা॥
বিরাট মহিষমর্দিনী এক বিকট নিতম্বা।

[টুইন, মার্চ, ১৯৩৫ ; শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এফ. টি. ৩৭৮০। তথ্যের উৎস : রেকর্ড কোম্পানির পুরানো রেজিস্টার ও আজাহারউদ্দীন—তালিকা।]

৩৮৫

নাচে তেওয়ারি চৌবেজী দৌবে পাঁড়ে নাড়ে
তালে তালে ভুঁড়ি নাচে (হাঁরে) !
নাচে কাবলিওয়ালা আগা হেলায় দাড়ি
নাচে ইয়া গোঁফওয়ালা পরে ঘাঘরি শাড়ি।
নাচে পাণ্ডাজী থপাস থপাস
নাচে যুপী বুড়ি থপাস থপাস ;
ফোঁপরা ঢেঁকিতে যেন চাল কাঁড়ে।

নাচে তাড়কা হিড়িম্বে শূর্পণখা
নাচে উচ্চিংড়ে আরশুলা গুবরে পোকা ;
নাচে কিঙ্কড় কাল্লু গামা
নাচিছে ধুচুনি নাচিছে ধামা ;
নাচিছে ডুয়েট ঘটোৎকচ ও গোপাল ভাঁড়ে ৷৷
নাচে নানা মিঞা হায় হায় ঘুরিয়ে লুঙ্গি ;
নাচ, মাদ্রাজি উড়িয়া মগ বার্মিজ ফুঙ্গি ;
তাকিয়ার খোল পরে বল নাচে
সায়েবের সাথে মেম পাছে পাছে
ঘুরে ঘুরে যেন গরু ধান মাড়ে ৷৷

[তথ্যের উৎস : আজাহারউদ্দীন—তালিকা ও কোম্পানির পুরানো রেজিস্টার। হিজ, মে, ১৯৩৪। শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এন. ৭২৩১।]

৩৮৬

বছর ফিরল ফিরল না বউ ভাইয়ের বাড়ির থনে
হালার হুমুন্দিরা দেয় না ছাইর‍্যা, হাইর‍্যা আসছি রণে
তাগর সনে মুই হাইর‍্যা আসছি রণে ৷৷
বহিন ঘরে রাইখ্যা কি ভাই (কন্ দেহি কর্তা)
আপনি হালাই হইবে বোনাই, দুষখু আমার কারে হোনাই
হায়রে যামু কনে ৷৷
মুই পাগল হইলাম ছাগল হইলাম বউ বউ কইর‍্যা ডাইক্যা
(বউ মুই তোমার লাইগ্যা পাগল ঐয়া আবোল তাবোল
পেচাল পাড়ছি, মুই ছাগল ঐছি)
বউয়ের লাইগ্যা ভেউর হইছি গোপ দাড়ি চুল রাইখ্যা।
ঘরের মাচার লাউ ছিল সে (বোঝঝেননি কর্তা)
উপরি পাওনার ফাউ ছিল সে,
তার সোয়ামির বিধবা কইর‍্যা
গেল ভাইয়ের সনে ৷৷
সে ছিল মোর কোলের মেউর
ছিল বাস্তু পেঁচা
(একদিন) রাগের মাথায় কইর‍্যা ছিলাম
তারে আদা ছেঁচা।
দশ হালায় মোর দশটা খুইন্যা (ওরে বাবা)

ছুইট্যা আইল তাইনা হুইন্যা
মোরে দিল যেন তুলা ধুইন্যা ফেইলে কচু বনে।
(দেহেন কর্তারা মোর পিঠের ঘা অ্যাহনও শুহোয়নি)
এবার মলে বউয়ের ভাই হব মুই
ভাইব্যা রাখছি মনে।

[টুইন, ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭। শিল্পী : চিন্তাহরণ মুখার্জী। এফ. টি. ৪৭৭৬।]

৩৮৭

লেংচে কেন চলছি আমি জামায় কেন কাদা
দুঃখের সে কাহিনী মোর না-ই শুনিলে দাদা॥
কলকাতাতে পায়ে হেঁটে জো আছে কি চলার
পা দিয়েছি যেই রাস্তায় সামনে দেখি রোলার।
ফুটপাতে যেই উঠতে গেছি হায় একি উৎপাত
কলার খোলায় পা হড়কে পড়লাম চিৎপাত
খিলখিলিয়ে উঠল হেসে পাশে সব হাঁদা॥
যেই উঠেছি সামনে দেখি মস্ত মোটর গাড়ি
কাছা খোলা অবস্থাতেই ছুটনু তাড়াতাড়ি।
যেমনি দুপা এগিয়ে গেছি অমনি মোটর বাস ;
ধাক্কা মেরে ফাঁসিয়ে দিল আমার ধুতির ফ্যাঁস।
রগঘেঁসে এক ছুটল ফিটন লাগল চোখে ধাঁধাঁ।
হকচকিয়ে মোড় ঘুরতেই ধাক্কা খেলাম ট্রামে
ট্রামের পাশে লরি ছুটে (যেন) রাধা শ্যামের বামে।
এদিক পানে ভয়সা গাড়ি বাইসিকেলে একধা।'
(দাদা) যাক গে ধুতি প্রাণ পেয়েছি ধুতি রেখে বাঁধা॥

[তথ্যের উৎস : আজহারউদ্দীন—তালিকা ও অপ্রকাশিত নজরুল—আবদুল আজীজ আল-আমান। টুইন, মে, ১৯৩৫। শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এফ. টি. ৩৭৯১।]

৩৮৮

যদি বুদ্ধির শ্রীবৃদ্ধি চাও সিদ্ধি খাও—সিদ্ধি খাও।
মোক্ষ মুক্তি ঋদ্ধি চাও, কিম্বা অষ্টসিদ্ধি চাও
সিদ্ধি খাও সিদ্ধি খাও॥

ওরে স্বর্গের অলম্বুষ—ওরে মর্তের লেদ্ধড়ুস
শিব লোকে এই আসার ঘুষ মহাসিদ্ধির মহিমা গাও।
এই কৈলাসী ষাঁড়ের নাদ খেয়ে হও দাদা প্রেমোন্মাদ
পাইয়া ঈষৎ এর প্রসাদ মৃত্যু বুড়োরে বগ দেখাও
বড়দিদি ইনি হন গঞ্জিকার।
খেলে ঘুচে যায় যত ভব বিকার
সব দুঃখ শোক হবে পগার পার—
ছটাক খানিক খেয়ে গলা ভিজাও।

[মন্মথ রায় রচিত 'সতী' নাটকের গান।]

হিন্দী-গীত

৩৮৯

প্রেম ক্যাটারী লগ্য গ্যই তোরে কারী কারী
প্যায়ারে ভঁ্যওরে ডোলাৎ হ্যায় যো নিস্‌দিন ডারী ডারী।
শুনা প্যায়ারে ভঁ্যওর ও প্রেম-কাহানী
বাগামে যাতা হ্যায় প্রেমসে গাতা হ্যায়
কয়া মানমেঁ ঠানী।
ফুলো সে ক্যয়া তুঝকো প্রেম ইয়া হ্যায়
মেরী তারহা ক্যায়া তু প্রেমী ব্যনা হ্যায়
ত্যড়পত হ্যায় কিসকী তু বরহা মেঁ নিস্‌দিন
পাই হ্যায় কিসসে হয়ে প্রেমনিশানী
ফুলমে হ্যায় হ্যায় গুলসে গালো কি রং গাৎ
মিলতি হ্যায় ইনসে প্রীতম কি প্যারী সুরাত
ইস্‌সে ম্যায় কারতিহু ফুলসে উলফত
ফিরত হুঁ ব্যন ব্যন ব্যন্‌কে দিওয়ানী।।

[হিজ, নভেম্বর, ১৯৩৭। শিল্পী : মিস সীতা দেবী। এন. ৯৯৯৬। সুর : নজরুল।]

৩৯০

ব্যন্‌মে শুন স্যখিরি পিয়া পিয়া বোলে বাঁশুরিয়া।
স্যখি ক্যওন উও বনশি ব্যজায়ে ঘ্যরমে ন্য র্যহন্ যায়,

মন্ ভ্যয়ে উদাস্ স্যখি ন্যহি মানে জিয়া রি
পিয়া পিয়া বোলে বাঁশুরিয়া॥
নিরালা ডাঁই বাজে মৃদঙ্গ ম্যওর পাপিহা বোলে রি
চ্যরণন্ মে ছ্যন্দ জাগে ত্যন্ মন্ প্রাণ ডোলে রি
প্রেম্‌সে ম্যতয়ালী ভ্যয়ি চাঁদ কি আঁখিয়া রি
পিয়া পিয়া বোলে বাঁশুরিয়া॥
স্যখি প্যহনো নীল শাড়ি
চূড় বাঁধো ম্যন্‌হারি
যাঁহা ব্যন্‌চারী চ্যলো ক্যরকে সিঙ্গার
চ্যরণন্ মে গুজরী গ্যালেমে চম্পা হার—
নাচুঙ্গী আজ ওয়াকে সাথ্ গাওঙ্গি র‍্যসিয়ারি
পিয়া পিয়া বোলে বাঁশুরিয়া॥

[হিজ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮। শিল্পী : মিস প্রমোদা। এন. ১৭০৪২।]

৩৯১

বালা যোব্যন মোরি স্যখিরি পরদেশে পিয়া।
ক্যায়সে স্যামহালু সোলা ব্যয়স উম্যারিয়ারি
পরদেশে পিয়া॥
ভ্যয়রি ভ্যয়রি যোবান্ দিলমে ন্যহি চ্যয়ন্
দিল ন্য লাগে কাম্‌মে জাগি কাটে ব্যয়ন
সোতে ড্যর লাগে একেলি স্যবরিয়া রি
পরদেশে পিয়া॥
ফিকা লাগে খানা পিনা ন্যয়নোমে নিদ ন্যহিরা,
যাঁহা মোরি বিদেশীয়া লেব্য মোহে ওয়াহিরি।
আয়ে ফাগান চৈত্ স্যখি খিলা যোবান ফুল মোর
স্যতায়ে নিস্‌দিন মোহে বুলবুল আওর ফুলচোর
ক্যায়সে ছিপাউঁ উও ফুল পত্যরি আঙ্গিয়ারি
পরদেশে পিয়া॥

[হিজ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮। শিল্পী : মিস প্রমোদা। এন. ১৭০৪২। তেপান্তরের মাঠে বঁধু হে গানটির সুরে এই গানটি রচিত।]

৩৯২

মোরে মন মন্দিরমে শুনো সখিরি
শোওত হায় গিরধারী।
জাগ জাগ কর প্রেম হামারা প্যহরা দেও দ্বারী।
ছাতিপে মেরে কৃষ্ণ শোওত হায় ভক্তি চাঁওর ঢুরাওয়ে
উন্‌কে শিরামনে দীপগ মোরি আঁখিয়া
প্রীতি হায় দাসী হামারি।
চোরি চোরি শাস ননদ মোরা দেখ রহি হ্যঁায় নেম।
উনকা ড্যর মোহে কুছওয়া না লাগে
জাগত হায় মোরা প্রেম॥
আধি রাত যব জাগে বিহারী
ধ্যারি হ্যঁায় হাথ কৃষ্ণ মুরারি
ধ্যান ধ্যরে অব ইয়ে প্রাণ মোরা য্যয়সে রাধাপারী।

[তথ্যের উৎস : আজাহারউদ্দীন তালিকা ও এইচ. এম. ভি. কোম্পানির রেজিস্টার। হিজ, ডিসেম্বর, ১৯৩৬। শিল্পী : মড কস্টেলো। এন. ৬৭২৮।]

৩৯৩

স্যাখিরী দেখেতো বাগমেঁ কামিনী
সুহি চাম্বলী কি ক্যয়সী ব্যহার হ্যায়॥
আও আও হ্যর ডালি সে যোড়কে
ক্যচ্চি কলিও কো গুন্ধে হ্যম যোড়কে
প্রেমমালা পিন্‌হায়ে দিলদার ইয়ার কো
ম্যস্ত হোক্যর গলে মিলতী হ্যর ডার হ্যায়।
ম্যয় হুঁ সুন্দর নার নওয়েসী প্যরী
প্যহনা ফুলোঁ কা গ্যহনা যো ম্যায়নে স্যখী
দুলহান ব্যন গ্যই।
প্যয়ারে প্রীতমকে মিলনে কি আই ঘ্যড়ি
ইসী কারণ স্যখীরী ব্যনী সুন্দরী
আয় বাল্যম কে ম্যন কো লুভাউঙ্গী
ইসী আশা পে সারা ইয়ে সিঙ্গার হ্যায়।

[হিজ, নভেম্বর, ১৯৩৭। শিল্পী : সীতা দেবী। এন. ৯৯৯৬।]

৩৯৪

আও জীবন মরণ সাথী
তুমকো ঢুঁঢাতা হ্যায় দূর আকাশ মে
মোহনী চাঁদনী রাতি।
ঢুঁঢাতা প্রভাত নিত গোধূলিলগন মে
মেঘ হোকে ম্যয় ঢুঁঢাতা গগন মে।
ফিরত হুঁ রোকে শাওন পবন মে।
পামেমে ঢুঁঢা তা তোড়ী পাপী
শ্যামা হোকে জ্বালা ম্যয় তোমারি আঁখমে
বুঝ গ্যায়া রাতকো হায় নিরাশ মে।
আভি ইয়ে জীবন হ্যায় তুমহারি পিয়াস মে।
গুলা না হো যায়ে নয়ন কি বাতি॥

[হিজ, মার্চ, ১৯৩৭। শিল্পী : গিরীন চক্রবর্তী, এন. ৯৮৬৮।]

৩৯৫

আকুল ব্যাকুল ঢুঁড়ত্ব ফিরু শ্যাম
তুম বিনা রহন না যায়।
তুমহারে কারণ সব কুছ ছোড়ি
প্রীতি ছোড়ন না যায়।
কেঁও তরসাও অন্তরযামী
আওয়ো মিলো কৃপা কর স্বামী
নিঁদ নাহি রয়না
দিন নাহি চায়না
বিরহ কি আগ জ্বালায়।

[টুইন, অক্টোবর, ১৯৩৫, শিল্পী : কুমারী রেবা সোম ও হেমচন্দ্র সোমা ; এফ. টি. ৪১০৪, সুর : নজরুল।]

৩৯৬

আজি মধুর গগন মধুর পবন মধুর ধরতীধাম
আয়ে ব্রিজমে ঘনশ্যাম।
বাজত বনমে মধুর মুরলী বোলাতা রাধা নাম
আয়ে ব্রিজমে ঘনশ্যাম।

আজ থির যমুনা আধীর ভ্যায়ি আয়ে গোকুলকে চাঁদ
অন্ধেরি গ্যয়ি
বোলে কোয়েলিয়া ময়ূর পাপিহা পিয়া পিয়া অবিরাম
আয়ে ব্রিজমে ঘনশ্যাম
ব্রিজকে কোঁয়ারি বনকে যোগিনী রোতি থী বিরহ মে
আজ লেকে গ্যাগরি ওড়ে নীল শাড়ি
চলে ফের নীর ভরণে,
আজ হরিকে সাথ হরিভি আয়ে
রাঙা আবিরমে গোকুল ছায়ে
বন্‌শী বাজাওয়ে রসিয়া গারে বিভোর ব্রিজধাম
আয়ে ব্রিজমে ঘনশ্যাম।

[হিজ, মার্চ, ১৯৩৭ ; গিরীন চক্রবর্তী। এন ৯৮৬৮। রেকর্ড বুলেটিনে 'ব্রিজকে ঘনশ্যাম' রয়েছে—রেকর্ডের বাণী 'ব্রিজমে ঘনশ্যাম।]

৩৯৭

জপলে রে মন মেরা প্রভুকে নামকে মালা
সবের সামমে হর এক কামমে জপ লে উও নাম নিরালা।
বসন ভূষণ উওহি নামসে সাজাও
উওহি নামসে ভুখ তৃষ্ণা মিটাও
উও নাম লেকে ফিরো রোতে রোতে নামসে কর হৃদয় উজিয়ালা।
উওহি নাম কি নামাবলী গ্রহতারা রবিশশী ঝুলে গগনমণ্ডল মে
ছোড় লোভ মোহ ক্রোধ কামকো
জপত রেহা সদা মধুর উও নামকো
নামমে রহো সদা মাতোয়ালা॥
আদর ভাব কর মন উনহিসে।
প্রেম প্রীতি কর উনহিকে চরণ সে
উওহি নাম ধ্যানমে উওহি নাম জ্ঞানমে
উওহি নাম জপত রহো মন প্রাণমে
উওহি হায় সবকে পালন ওয়ালা॥

[তথ্যের উৎস : আজাহারউদ্দীন তালিকা ও এইচ. এম. ভি. কোম্পানির রেজিস্টার। হিজ, ডিসেম্বর, ১৯৩৬। শিল্পী : মড কস্টেলো। ৩ম ৬৭২৮।]

৩৯৮

তুম আনন্দ ঘনশ্যাম
ম্যয় হুঁ তুম দেওয়ানী রাধা
বাঁশরি শুনকে তোরি আয়ি মধুবনমে
না মানু কলঙ্ককি বাধা॥
যুগ যুগান্ত অনন্তকাল সে
হৃদয় বৃন্দাবন মে
তুমহারে হামরে এহি লীলা নাথ
চলত্ রহি মন মে।
মেরে সঙ্গ রোয়ে প্রেম বিগলিতা
ভক্তি বিশাখা প্রীতি ললিতা
তুমকো যো চাহে মেরি তরহেসে
রোয়ত জীব সামাধা॥

[মেগাফোন। শিল্পী : মিঃ এস এল সাইগল (সিধু) অর্থাৎ সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়। জে. এন. জি. ১১৯৬। গানটির প্রশিক্ষক ছিলেন হিমাংশু দত্ত।]

৩৯৯

মেরে শ্রীকৃষ্ণ ধরম শ্রীকৃষ্ণ করম
শ্রীকৃষ্ণ তন মন প্রাণ।
সবসে নিয়ারে পিয়ারে শ্রীকৃষ্ণজি
নঁয়নুকে তারে সমান।
দুখ সুখ সব শ্রীকৃষ্ণ মাধব
কৃষ্ণহি আত্মা জ্ঞান,
কৃষ্ণ কণ্ঠহার আঁখকে কাজর
কৃষ্ণ হৃদয়মে ধ্যান,
শ্রীকৃষ্ণ ভাষা শ্রীকৃষ্ণ আশা
মিটায়ে পিয়াস ওয়ো নাম
স্বামী সখা পিতা মাতা শ্রীকৃষ্ণজি
ভ্রাতা বন্ধু সন্তান॥

[টুইন, অক্টোবর, ১৯৩৫। শিল্পী : কুমারী রেবা সোম ও হেমচন্দ্র সোম। এফ. টি. ৪১০৪। সুর : নজরুল।]

৪০০

মা

[গান]

পুরবি—মধ্যমান

আজ যুগের পরে ঘরকে ফিরে
মায়ের কথা পড়লো মনে।
শূন্য ঘরে মন বসে না
গুম্‌রে মরে হিয়ার বনে।
আজো সে ঘর সবাই আছে,
মা কেবলই নেই গো কাছে,
ঐ দাওয়া আর ঐ কানাচে
আজো মায়ের স্বরটি রনে।

যত্ন কারুর সইতে নারি, কণ্ঠ ছিঁড়ে কান্না আসে;
ওষ্ঠ চেপে যায় না রাখা, রূপ যে তোমার চক্ষে ভাসে!
পাইনি মাগো সাতটি বরষ
একটুকু ক্ষীণ স্নেহের পরশ,—
(ও মা) 'বুনো' তোমার হলো না বশ
চল্‌লো ফিরে ফের বিজনে।
হারলো স্নেহ বাঁধন-হারার বাঁধতে নিয়ে ডোর-সৃজনে!

৪০১

আবাহন

কোন সে অচিন পরীর মুলুক ঘুরে
নেয়ে হুরীর নূরে,
চুরি করে কিন্নরীদের সুধা-ক্ষরা সুরে
এলি, শিশু ওরে,
আঁধার মোদের বিজন কুটির জ্যোতিতে তোর ভরে!
ওরে কোমল, ওরে কচি,
ওরে অমল, ওরে শুচি,
কি দিয়ে আজ বরণ করি তোরে
সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে,

রূপকথার সে কোন্‌ ‘কোকাফের ধারে
ছিলি শিশু ওরে?

অশ্রুতে তোর মুক্তো ঝরে, হাসলে মানিক ক্ষরে।
ওরে যাদু, ওরে খোকন,
ওরে মোদের বুক–চেরা ধন,
কি দিয়ে আজ বরণ করি তোরে!
পাড়ার সকল ঘরে
সকাল–সাঁঝে ছেলেরা সব দাপাদাপি করে,
অকাজের সেই ঘরটি তাদের তাতেই থাকে ভরে।
আমাদেরি কুঁড়েয়
সারাটা দিন জুড়েই
মুষড়ে–পড়া নিঝুম নিরানন্দ পড়ত ঝরে।
ওগো দিগম্বর অবধূত,
ওগো ছোট্ট স্বর্গীয় দূত!
কোন্‌ জননীর আসন কোথায়
টলেছিল মোদের ব্যথায়?—
তাইতে সেদিন ভোরে
তোর সে ছোট'র রাজ্যি হতে ধরে,
থুয়ে গেলেন মোদের বুকে তোরে এমন করে?
“সকল ব্যথা রঙিন” হলো পেয়ে যাদু তোরে!
আজ যে বুকে কোথাও ফাঁকা নাই,
তোর সে মুখরতায় ভরে' আছে সকল ঠাঁই!
ওরে ছোট, ওরে কাঁচা,
ওরে মানিক সাগর–সেঁচা,
কি দিয়ে আজ বরণ করি তোরে!

মোদের বুকের কামনায় কি সুপ্ত ছিলি ওরে,
শিশু হয়ে এলি সকল ইচ্ছা মূর্তি ধরে!
কুটির হলো রাজসিংহাসন
সোনা হলো সকল ভবন
তোর সে মায়ার কাঠির ছোঁয়ায় কি রে?
ওরে স্নেহ ওরে মায়া,
ওরে শুভ, ওরে পয়া!
আমার ‘আমি’ হারিয়ে ফেলে পেয়েছি আজ ফিরে
বহুদিনের হারিয়ে–যাওয়া কচি ‘আমি’টিরে।

নতুন সংযোজিত গান

[১]

অমন করে হাসিসনে আর রাইলো।
যুই পোড়ার মুখে হাসিসনে আর রাইলো
ছি ছি রঙ্গ করিস অঙ্গে মেখে কৃষ্ণ কালির ছাই লো॥

বাঁশি হাতে গাছে চড়া
কয়লা বরণ গয়লা ছোঁড়া সে লো
সেই নাটের গুরু নষ্টের গোড়া তোর প্রেমের গোঁসাই লো॥

ঐ গো-রাখা রাখালের সনে
তোর নিন্দা শুনি বৃন্দাবনে রাই লো
ছি ছি কেষ্ট ছাড়া ইষ্ট কি আর ত্রিভুবনে নাই লো
ঐ অমাবস্যার কৃষ্ণ-চাঁদে
বাসলে ভালো কোন সুবাদে তুই লো
তুই দিন-কানা হয়েছিস রাধে ভাবিয়া কানাই লো॥

রেকর্ড নং : H.M.V.N. 17262 শিল্পী : কে. মল্লিক

[২]
তেওড়া

অম্বরে মেঘে মৃদঙ্গ বাজে জলদ-তালে
লাগল মাতন ঝড়ের নাচন ডালে ডালে॥

দিগন্তের ঐ দুর্গ-মূলে ধূলি-গৈরিক কেতন দুলে
কে দুরন্ত আগল খুলে ঘুম-ভাঙালে॥

থির সাগরের নীল তরঙ্গে আনন্দেরি
সেই নাচনের তালে তালে বাজিল ভেরি।

মাভৈঃ মাভৈঃ ডাক শুনি যার
পথ ছেড়ে দে রথ এলো তাঁর।
দুর্দিনে সে বজ্র-শিখার মাতন জাগে॥

রেকর্ড নং : H.M.V.N. 7251 শিল্পী : শংকর মিশ্র

[৩]
কাহার্‌বা

আজকে শাদি বাদশাজাদীর
পান করো শিরাজি॥
নেশার ঝোঁকে চোখে চোখে
খেলুক আতস বাজি
(সবে) পান করো শিরাজি॥
সামনে মোরা যাকে পাব
রঙিন পানি পান করাবো
প্রাণে খুশীর রঙ ঝরাবো
নেচে গেয়ে আজি
সবে পান করো শিরাজি॥

রেকর্ড নং : H.M.V.N. 7398 শিল্পী : মিস ইন্দুবালা

[৪]
তাল-ফের্‌তা

আজি অলি ব্যাকুল ওই বকুলের ফুলে
কত আদরে টানি
চুমে বদনখানি
ফুলকলি লাজে পড়ে বুকে ঢুলে ঢুলে॥

আসে ফুল-বধূ
বুকে ভরা মধু
হাসে ভ্রমর-বঁধু কলি সনে দুলে দুলে॥

সোহাগে গুনগুনিয়ে সব কথা তার কইতে বাকি
সলাজ ফুল-কুমারীর ঘোমটা খানি খুলতে বাকি,
গোপনে গোপন বুকের সুধাটুকু লুটতে বাকি,
না-কওয়া যত কথা কানে কানে বলে খুলে॥

রেকর্ড নং : H.M.V.N. 7054 শিল্পী : ধীরেন্দ্রনাথ দাস

[৫]
কাহারবা

আজি আল কোরায়শী প্রিয় নবী এলেন ধরাধাম
তাঁর কদম মোবারকে লাখো হাজারো সালাম।
তওরত ইঞ্জিলে মুসা ঈশা পয়গম্বর
বলেছিলেন আগাম যাঁহার আসারি খবর
যাঁহার দিয়েছিলেন নাম
সেই আহমদ মোর্তজা আজি এলেন আরব ধাম॥

আদমেরি পেশানিতে জ্যোতি ছিল যাঁর
যাঁর গুণে নূহ তরে গেল তুফান পাথার
যাঁর নূরে নমরুদের আগুন হলো ফুলহার
সেই মোহাম্মদ মুস্তাফা এলেন নিয়ে দ্বীন-ইসলাম॥

এলেন কাবার মুক্তিদাতা মসজিদের প্রাণ
শাফায়াতের তরী এলো পাপী তাপীর ত্রাণ,
দিকে দিকে শুনি খোদার নামের আজান
নবীর রূপে এলো খোদার রহমতেরি জাম॥

রেকর্ড নং : TWIN FT4884 শিল্পী : আবদুল লতিফ এন্ড পার্টি

[৬]
পদ্মাবতী-ঝাপতাল

আজি নন্দলাল সুখচন্দ নেহারি
অধীর আনন্দে
অন্তর কাঁপে ঝরে প্রেমবারি॥

বকুল বনে হরষে ফুলদল বরষে
গাহে রাধা শ্যাম নাম
হরি-চরণ হেরি শুকসারি॥

রেকর্ড নং : H.N.V. 1705 শিল্পী : প্রফেসর জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী

[৭]

কাহারবা

আজি নাহি কিছু মোর মান-অপমান বলে।
সকলি দিয়াছি মোর ঠাকুরের
রাঙা চরণ তলে॥

মোর দেহ-প্রাণ, জাতি কুল মান,
লজ্জা ও গ্লানি আর অভিমান ;
(আমি) দিছি চিরতরে জলাঞ্জলি গো
কালো যমুনার জলে॥

মোরে যদি কেহ ভালোবাসে আজ
জল আসে আঁখি ভরে
মোর ছল করে সে যে ভালোবাসে
মোর শ্যাম সুন্দরে॥

মোরে না বুঝিয়া কেহ করিলে আঘাত
কেঁদে বলি, ওরে ক্ষমা করো নাথ॥
বৃন্দাবনে সে প্রেম মধুর হয়
আঘাত নিন্দাচলে॥

রেকর্ড নং : H.M.V.N. 27820 শিল্পী : মৃণাল কান্তি ঘোষ

[৮]

সিন্দুরা-ত্রিতালা

আজো বোলে কোয়েলিয়া
চাঁপা বনে প্রিয়
তোমারি নাম গাহিয়া॥

তব স্মৃতি ভোলেনি
চৈতালি সমীরণ
আজো দিকে দিকে
খুঁজে ফেরে কাঁদিয়া॥

নিশীথের চাঁদ আজো জাগে
ওগো চাঁদ তব অনুরাগে
জলধারা উথলে যমুনার সৈকতে
খোঁজে তরুলতা ফুল আঁখি মেলিয়া॥

রেকর্ড নং : H.M.V.N. 17346 শিল্পী : কুমারী দীপালি তালুকদার (ডলি)

[৯]
কাহারবা

দ্বৈত ॥ আবার শ্রাবণ এলো ফিরে তেমনি ময়ূর ডাকে,
দোলনা কেন বাঁধলে না গো এবার কদম শাখে॥
স্ত্রী ॥ সঙ্গে লয়ে গোপ–গোপীরে
পুরুষ ॥ ব্রজের কিশোর যাবে ফিরে
দ্বৈত ॥ লীলা–কিশোর শ্যাম যে লীলা–সাথির সাথে থাকে
আবার শ্রাবণ এলো ফিরে তেমনি ময়ূর ডাকে॥

দ্বৈত ॥ দোলনা বেঁধে রইবো চেয়ে আমরা মেঘের পানে
আয় ওরে আয়, নির্জন বনকে জাগাই সেই কাজরি গানে গানে॥
স্ত্রী ॥ বৃষ্টি ধারায় টাপুর টুপুর
পুরুষ ॥ শুনবো তাহার পায়ের নূপুর
দ্বৈত ॥ বিজলিতে তার চপল চাওয়া দেখব মেঘের ফাঁকে॥

রেকর্ড নং : TWIN F-T 12490 শিল্পী : কুমারী বীণা দত্ত ও ভক্তিরঞ্জন রায়

[১০]
দাদ্‌রা

মা, মা গো—
আমার অহঙ্কারের মূল কেটে দে কাঠুরিয়া মেয়ে,
কত নিরস তরু হলো মঞ্জুরিত তোর চরণ–পরশ পেয়ে॥

রোদে পুড়ে জলে ভিজে মা দিয়েছিস ফুল ফল
শাখায় আমার, নীড় বেঁধেছে বিহঙ্গের দল।
বটের মতো সারা দেহ মাগো মায়ার জটে আছে ছেয়ে॥

ও মা মূল আছে তাই বৈতরণীর কূলে আছি পড়ি
নইলে হতাম খেয়াঘাটেরপারা পারের তরী।

তুই খড়গের ভয় দেখাস মিছে
মুক্তি আছে এরি পিছে মাগো
তোর হাসির বাঁশি শুনতে পাবো
অসির আঘাত খেয়ে॥

রেকর্ড নং : H.M.V.N. 27990 শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ

[১১]

কাহারবা

আমার আছে এই কখানি গান
তা দিয়ে কি ভরবে তোমার প্রাণ॥

অনেক বেশী তোমার দাবি
শূন্য হাতে তাইতো ভাবি,
কি দান দিয়ে ভাঙবো তোমার
গভীর অভিমান॥

তুমি চাহ গভীর ব্যাকুলতা
আমার আছে বলার দুটি কথা।
যে বাঁশরি গায় অবিরাম
প্রিয়তম তোমারি নাম
যাবার বেলায় তোমায় দিলাম
সেই বাঁশরি খান॥

রেকর্ড নং : TWIN FT 12436 শিল্পী : কুমারী গীতা বসু

[১২]
তাল–ফেরতা

আমার বিছানা আছে বালিশ আছে বৌ নাই মোর খাটে
(ওগো) তার বিরহে বারোটা মাস কেমন করে কাটে ও দাদা গো॥

বৈশাখা মাস, বৈশাখে প্রাণ ভয়সা যেন ধুঁকে রোদের তাতে (বাবু গো)
হাত–পাখা আর নড়েনা ভাই রাতে প্রিয়ার হাতে
জৈষ্ঠ্যিমাস, জৈষ্ঠ্যি মাসের গরমে হিয়ার গুষ্টি শুদ্ধু ফাটে ও দাদা॥

আষাঢ় মাস, আষাঢ় মাসে কটকটে ব্যাঙ ছটফটিয়ে কাঁদে
চুলকানি যে উঠলো বেড়ে প্রেমের মইষা দাদে,
শ্রাবণ মাস, শ্রাবণ মাসে রাবুণে প্রেম জাগে জলের ছাটে ও দাদা গো॥

ভাদ্র মাস, ভাদ্র মাসে আপনার বৌ হলো ভাদ্র বধূ (বাবু গো)
আশ্বিন মাসে চাখলাম না হায় পূজার মজার মধু
আমার পরাণ লাফায় পাঁঠা যেমন দাপায় হাঁড়িকাঠে ও দাদা গো॥

কার্তিক মাস, কার্তিকে মোর ময়ূরী এই কার্তিককে ফেলে (ওরে)
ও তার দাদার ঘরের রাধা হয়ে বেড়ায় পেখম মেলে
অঘ্রাণ, অঘ্রাণে ধান কাটে চাষা আমার কেঁদে কাটে ও দাদা গো॥

পৌষ মাস, পৌষে আমার বৌ সে কোথায় গুড়ের পিঠা খায় (বাবু গো)
আর হেথায় আমার জিহ্বা দিয়া নাল ঝরিয়া যায়,
মাঘ মাস, ওরে মাঘ মাসে যার মাগ নাই সে থাকে না শ্মশান ঘাটে ও বাবু গো॥

ফাল্গুন মাস, ফাল্গুনে ছাই ডাল–নুনে কি মেটে প্রেমের খিদে
হাতের কাছে কাকে খুঁজি রাতের বেলায় নিঁদে (আমি)
চৈত্র মাস, চৈত্র মাসে মধু খুঁজি হায়রে কদুর বাঁটে॥

রেকর্ড নং : H.M.V.N. KDB 10154 শিল্পী : রঞ্জিত রায় ও কুমারী স্বর্ণলতা বসুর সহযোগিতায়

[১৩]
ভৈরবী–দাদ্‌রা

আমার বুকের ভেতর জ্বলছে আগুন,
দমকল ডাক ওলো সই।
শিগগির ফোন কর বঁধুরে
নইলে পুড়ে ভস্ম হই॥

অনুরাগ দিশলাই নিয়ে
চোখের ল্যাম্প জ্বালিতে গিয়ে,
আমার প্রাণের খ্যাড়ো ঘরে
লাগলো আগুন ওই লো ওই॥

প্রেমের কেরোসিন যে এত
অল্পে জ্বলে জানি নে তো,
কি দাবানল জ্বলছে বুকে
জানবে না কেউ আমা বই॥

প্রণয় প্রীতির তোষক গদি
রক্ষে করতে চায় সে যদি
মনে করে আনতে বলিস (তারে)
আদর সোহাগ বালতি সই॥

রেকর্ড নং : H.M.V.N. 7249 শিল্পী : হরিদাস ব্যানার্জি

[১৪]

যৎ

আমার শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে
জপি আমি শ্যামের নাম
মা হলেন মোর মন্ত্র-গুরু
ঠাকুর হলেন রাধা-শ্যাম॥

ডুবে শ্যামা, যমুনাতে
মা খেলবো খেলা শ্যামের সাথে
শ্যাম যবে মোরে হান্‌বে খেলা
মা পুরাবেন মনস্কাম॥

আমার মনের দোতারাতে
শ্যাম ও শ্যামা দুটি তার,
সেই দোতারায় ঝংকার দেয়
ওঙ্কার রব অনিবার।

মহামায়া মায়ার ডোরে
আনবে বেঁধে শ্যাম-কিশোরে
আমি কৈলাসে তাই মাকে ডাকি
দেখবো সেথায় ব্রজধাম॥

রেকর্ড নং : H.M.V.N. 9974 শিল্পী : প্রফেসর জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী

[১৫]

আমার সকল আকাশ ভরলো
তোমার তনুর কমল-গন্ধে
আমার বন-ভবন ঘিরল
মধুর কৃষ্ণ-মকরন্দে॥

এলোমেলো মলয় বহে
বন্ধু এলো, এলো কহে
উজ্জ্বল হলো আমার ভুবন
তোমার মুখ-চন্দে॥

আমার দেহ-বীণায় বাজে তোমার
চরণ-নূপুর-ছন্দ
সকল কাজে জাগে শুধু
অধীর আনন্দ।

আমার বুকের সুখের মাঝে
তোমার উদাস বেণু বাজে
তোমার ছোঁয়ায় আবেশ জাগে
ব্যাকুল বেণির বন্ধে॥

রেকর্ড নং : H.M.V.N. 9723 শিল্পী : শ্রীমতী আভা সরকার

[১৬]

দাদ্‌রা

আমার হৃদয়-মন্দিরে ঘুমায় গিরিধারী,
জাগে আমার জাগ্রত প্রেম দুয়ারে তার দ্বারী॥

কানু আমার বুকে ঘুমায়
ভক্তি জেগে চামর ঝুলায়
শিয়রে দীপ আমার আঁখি
প্রীতি দাসী তারি ॥

চোরের মতো মোর গুরুজন
ঘুরুক কাছে কাছে
আমি তাদের ভয় করিনে,
(আমার) প্রেম যে জেগে আছে।

আধেক রাতে নিরালাতে
জাগবে হরি, ধরবে হাতে,
ওগো ধ্যান করে গো সেই আশাতে
এ প্রাণ রাধা-প্যারী ॥

রেকর্ড নং : H.M.V.N. 7389 শিল্পী : ধীরেন দাস

[১৭]

তাল-ফেরতা

আমি কলহেরি তরে কলহ করেছি বোঝ নাকি রসিক বঁধু।
তুমি মন বোঝ মনোচোর মান বোঝ নাকি হে—
তুমি ফুল চেন, চেন নাকি মধু?
তুমি যে মধুবনের মধুকর
তুমি মধুরম মধুরম মধুময় মনোহর
কলহেরি কূলে রহে অভিমান-মধু যে, চেন নাকি বঁধু হে—

কলঙ্কী বলে গগণের চাঁদ প্রতিদিন ক্ষয় হয়
তুমি নিত্য পূর্ণ চাঁদ সম প্রিয়তম চির অক্ষয়
এ চাঁদে একাদশী নাই হে—
রাগের মাঝে রহে অনুরাগ-মধু হে, দেখ নাকি বঁধু হে—
শুধু রাধা একা দোষী হলো নিত্য কেন পায়না
মোর কৃষ্ণ চাঁদে যে একাদশী নাই হে—

সেই ব্রজগোপীদের ঘর আছে পর আছে
কৃষ্ণ বিনা নাই রাধারি কেহ
অমিও জানি যেন আমারও শ্রীকৃষ্ণ কেবল রাধাময় দেহ।
সে রাধা প্রেমে বাঁধা ছাড়া জানেনা, রাধাময় দেহ
সে রাধা প্রেমে বাঁধা।

রেকর্ড নং : SENOLA. QS 537 শিল্পী : নীলিমা বন্দোপাধ্যায়

[১৮]
কাহার্‌বা

আমি মুলতানি গাই
শ্রোতারা বাছুর সম
মুখপানে চেয়ে মম
ঘন ঘন তোলে হাই॥

জাপ্‌টে সুরের দাড়ি
শ্বশুরের দাড়ি, ভাসুরের দাড়ি
সাপটে তান মারি—আ-আ-আ
জাপটে সুরের দাড়ি
সাপটে তান মারি
গমকে ধমক দেই, মীরের মাড় চটকাই॥

হায় হায় রে হায়—
বোলতানে আবোল-তাবোল তানে খেলি হা-ডু-ডু
কিতকিত—হা-ডু-ডু—হা-ডু-ডু কিত-কিত
মোড় মোড় মোড়—কিত-কিত
আমি বাটের চাট মেরে সুরে করি চিত
আমি তালের শিঙ দিয়ে বেদম গুতাই॥

মোর মুখের হা দেখে হিপ্পেটমাস
আফ্রিকার জঙ্গলে ভয়ে করে বাস
আমি যত নাহি গাই তার অধিক রাগাই॥

রেকর্ড নং : SENOLA QS 502 শিল্পী : শ্রী বরোদা গুহ

[১৯]

কাহার্‌বা

আমি রচিয়াছি নব ব্রজধাম হে মুরারি
সেথা করিবে লীলা এসো গোলক-বিহারী ॥

মোর কামনার কালীদহ করি মন্থন
কালীর নাগে হরি করিও দমন
আছে গিরি-গোবর্ধন মোর অপরাধ
যদি সাধ যায় সেই গিরি ধরো গিরিধারী ॥

আছে ষড়রিপু কংসের অনুচর দল
আছে অবিদ্যা পুতনা শোক দাবানল
আছে শতজনমের সাধ আশা ধেনুগণ
আছে অসহায় রোদনের যমুনা-বারি ॥

আছে জটিলতা কুটিলতা প্রেমের বাধা
হরি সব আছে, নাই শুধু আনন্দ-রাধা
তুমি আসিলে হরি-ব্রজে রাজেশ্বরী
আসিবেন হাসিনরূপে রাধা প্যারী ॥

রেকর্ড নং : SENOLA QS 486 শিল্পী : দিলীপ কুমার রায়

[২০]

কাহার্‌বা

আমি শ্যামা বলে ডেকেছিলাম,
শ্যাম হতে তুই কেন এলি !
ওমা লীলাময়ী কেমন করে
মনের কথা শুনতে পেলি ॥

তোরে শৈল-শিরে শিবের সাথে (মা)
পূজে ছিলাম গভীর রাতে।
হেসে কেন কিশোর হয়ে
তুই বৃন্দাবনে পালিয়ে গেলি ॥

তুই রক্তজবা ফিরিয়ে দিলি (মা)
প্রেম চন্দন মুছিয়ে দিয়ে
মুক্তি চেয়েছিলাম মা
এলি আশীর্বাদী মুকতা নিয়ে।

ছিনু তমোগুণে ডুবে (মা)
তবু প্রিয়তম হয়ে
তুই খেলতে এলি তমাল বনে ;
লয়ে মোর গেরুয়া রাঙা বসন কেড়ে
দিলি রাধার সোনার চেলি ॥

রেকর্ড নং : SENOLA QS 534 শিল্পী : শ্রীমতী শৈল দেবী

[২১]

আল্লাজী আল্লাজী রহম করো
তুমি যে রহমান
দুনিয়াদারীর ফাঁদে পড়ে
কাঁদে আমার প্রাণ ॥

পাইনা সময় ডাকতে তোমায়
বৃথা কাজে দিন বয়ে যায়
চলতে নারি মেনে আমার
নবীর ফরমান ॥

দুনিয়াদারীর চিন্তা এসে
মনকে ভোলায় সদা
তাইতো মনে তোমায় স্মরণ
করতে নারি খোদা ॥

দাও অবসর তুমি ডাকার
এই বেদনা সহেনা আর
সংসারের এই দোজখ হতে
করো মোরে ত্রাণ ॥

রেকর্ড নং : TWIN FT 13259 শিল্পী : আশরাফ আলী

[২২]
কাহার্‌বা

আল্লার নাম জপিও ভাই দিবস ও রাতে
সকল কাজের মাঝেরে ভাই তাঁহার রহম পেতে
কোরাস : আল্লাহ্, আল্লাহ্, আল্লাহ্, আল্লাহ্, আল্লাহ্॥

হাত করবে কাজরে ভাই মন জপবে নাম
ঐ : নাম জপতে লাগেনা ভাই টাকা কড়ি দাম,
নাম জপো ভাই মাঠে ঘাটে, হাটের পথে যেতে।

কোরাস : আল্লাহ্, আল্লাহ্, আল্লাহ্, আল্লাহ্, আল্লাহ্!
ঐ : আল্লার নাম যদিরে ভাই তুমি থাকো ধরে
ঐ : নামও তোমায় থাকবে ধরে দুঃখ বিপদ বাড়ে,
ঐ : নামেরে সঙ্গী করো নাইতে শুতে খেতে
কোরাস : আল্লাহ্, আল্লাহ্, আল্লাহ্, আল্লাহ্, আল্লাহ্॥

তোমার দেহ-মন হবেরে ভাই নূরেতে রওশন
তখন আমীর ফকির চাইবে সবাই তোমার দরশন
মাতোয়ারা হও জিকির করো খোদার প্রেমে মেতে।
কোরাস : আল্লাহ্, আল্লাহ্, আল্লাহ্, আল্লাহ্, আল্লাহ্॥

[২৩]
কাহার্‌বা

আল্লার নাম মুখে যাহার
বুকে আল্লার নাম
এই দুনিয়াতে পেয়েছে সে
বেহেশতী আরাম॥

সে সংসারকে ভয় করে না
নাই মৃত্যুর ডর
দুনিয়াকে শোনায় শুধু
আনন্দেরি খবর

দিবানিশি পান করে সে
কওসেরি জাম—
পান করে কওসেরি জাম॥

[আল্লার রহমত' ইসলামি নক্সার গান]

রেকর্ড নং : TWIN FT 13107 শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ

[২৪]

কাহার্‌বা

আল্লার নাম লইয়া বান্দা রোজ ফজরে উঠিও
আল্লার নামে আহলাদে ভাই ফুলের মতো ফুটিও॥
কাজে তোমার যাইয়ো বান্দা আল্লারি নাম লইয়া
ঐ নামের গুণে কাজের ভার যাইবে হাল্কা হইয়া।
শুনলে আজান কাজ ফেলিয়া মসজিদে শির লুটিও॥

আল্লার নাম লইয়ারে ভাই কইরো খানাপিনা
হাটে মাঠে যাইয়ো না ভাই আল্লার নাম বিনা।
ওয়াজ নসিহত হইলে মজলিসে আইসা জুটিও॥

স্ত্রী পুত্র কন্যা তোমার খোদায় সঁপে দিও
আল্লার নাম জিকির কইরা নিশীতে ঘুমিও।
এই নাম শুইনা জন্মেছ ভাই এই নাম লইয়া মরিও॥

রেকর্ড নং : TWIN FT 13259 শিল্পী : আশরাফ আলী

[২৫]

কাহার্‌বা

আল্লাহ রসুল বোলরে মন
আল্লাহ রসুল বোল।
দিনে দিনে দিন গেল তোর
দুনিয়াদারী ভোল।
আল্লাহ রসুল বোল॥

রোজ কেয়ামতের নিয়ামত এই
আল্লাহ্-রসুল বাণী
তোর আখেরের ভুখের খোরাক
পিয়াসের ঐ পানি
তোর দিল দরিয়ায় আল্লাহ্ রসুল
জপের লহর তোল্
আল্লাহ্ রসুল বোল॥

রেকর্ড নং : TWIN FT 12716 শিল্পী : আবদুল লতিফ

[২৬]
কাহারবা

আসিয়া কাছে গেলে ফিরে
কেন আসিয়া কাছে গেলে ফিরে॥
মুখের হাসি সহসা কেন
নিভে গেল আঁখি নীরে
ফুটিতে গিয়া কোন কথার মুকুল
ঝরে গেল অধরের তীরে॥
ঝড় উঠিয়াছে বাহির ভুবনে
আঁধার নামে বন ঘিরে
যে কথা বলিলে না-বলে যাও
বিদায়-সন্ধ্যা তিমিরে॥

রেকর্ড নং : N-1 27004 শিল্পী : দীপালি তালুকদার

[২৭]
কাহারবা

ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক
দোস্ত ও দুশমন পর ও আপন
সবার মহল আজ হোক রওনক॥

যে আছ দূরে যে আছ কাছে,
সবারে আজ মোর সালাম পৌঁছে।
সবারে আজ মোর পরাণ যাচে
সবারে জানাই এ দিল আশক॥

এ দিল যাহা কিছু সদাই চাহে
দিলাম জাকাত খোদার রাহে
মিলিয়া ফকির শাহানশাহে
এ ঈদে গাহে গাহুক ইয়াহক।

এনেছি শিরনি প্রেম পিয়ালার
এসো হে মোমিন করো হে ইফতার
প্রেমের বাঁধনে করো গেরেফতার
খোদার রহম নামিবে বেশক॥

রেকর্ড নং : TWIN FT 4176 শিল্পী : আবদুল লতিফ

[২৮]

কাহারবা

উপল নুড়ির কাঁকন চুড়ি বাজে
বাজে ঘুমতি নদীর জলে।
বুনো হাঁসের পাখার মতো
মন যে ভেসে চলে
সেই ঘুমতি নদীর জলে॥

মেঘ এসেছে আকাশ ভরে
যেন শ্যামল ধেনু চড়ে
নাগিণীর সম বিজলী–ফণা তুলে
নাচে, নাচে, নাচেরে
মেঘ–ঘন গগণ তলে॥

পাহাড়িয়া অজগর ছুটে আসে
ঝর ঝর বেনো জল
দিয়ে করতালি
পরে পিয়াল পাতার মাথালি

ছিটায় জল
গেঁয়ো কিশোরীর দল।

রিণিক ঝিণিক বাজে চাবি আঁচলে
কালনাগিণীর মতো পিঠে বেণি দোলে
তীর-ধনুক হাতে
বন-শিকারির সাথে
মন ছুটে যায় বনতলে॥

রেকর্ড নং : H.M.V.N. 27262 শিল্পী : বীণা চৌধুরী

[২৯]

সুর-মল্লার—ত্রিতাল

এ ঘনঘোর রাতে
ঝুলন দোলায়
দুলিবে মম সাথে॥

এসো নব জলধর
শ্যামল সুন্দর
জড়ায়ে রাধার অঙ্গ
বাঁশরি লয়ে হাতে॥

রেকর্ড নং : H.M.V.N. 17406 শিল্পী : প্রফেসর জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী

৩০

লেটো গান

এত করে বুঝাইলাম তবু বুঝলি না কেনে
এত উপহাসে তোর কি লজ্জা হলো না মনে॥
ঠিক বটে মূর্খের কাছে
শাস্ত্রালাপে কি লাভ আছে
দর্পণ দিলে অন্ধের কাছে সে কি মর্ম জানে॥

ভেলা দ্বারা অগাধ সাগর
পার হইবার বাসনা তোর
বামন হাতে শশধর ধরেছে রে কোনখানে॥
ছিছি রে মরি লজ্জাতে
খোঁড়া যায় পর্বত লঙ্ঘিতে
ঘুঁটে কুড়ানির বেটাতে রেশমের পোষাক কিনে॥
নির্বুদ্ধি অসভ্য তাঁতী
চিনে ছিল যেমন হাতি
সেইরূপে রে তোর বুদ্ধির জ্যোতি
নজরুল এসলাম ভনে॥

[কৈশোরকালে লেটোর দলে থাকতে এবং পরবর্তী পর্যায়েও কিছুকাল নজরুল নিজের নাম নজরুল এসলাম লিখতেন। 'ইসলাম'–এর বদলে 'এসলাম' শব্দটি সেকালে চালু ছিল।]

৩১

শোক–গাথা

হায় আমরা কি ভাগ্যহীন হেন ওস্তাদ প্রতীম
কাজী বজলে করিম হারিয়েছি!
কি এ পোড়া কপালে হারায়ে রত্ন অকালে
শোকে বুক নয়ন জলে ভাসাইতেছি॥

বিদ্বানগণ হেরে যার কবিত্ব প্রশংসা করেন অবিরত
হায় আমাদের সে নিধি কেড়ে লয়েছে বিধি
মস্তকহীন দেহ আমি ধরিতেছি॥
আহা তাহার সে ধর্মভাব দেখে প্রাণ হতো শীতল
যার গুণে বশীভূত শত্রু–মিত্র ওস্তাদ সকল
আহা শ্রবণে যাহা পাথর ফাটে হায় আহা
অকাল মৃত্যু তাঁর আহা শুনিয়াছি॥

কি শিশু কি বৃদ্ধ কি যুবা কি যুবতী
যাঁর নামে নয়ন জলে শোকে ভাসায় ছাতি
হায় নিষ্ঠুর কাল অকালে আশামূল বিনাশিলে
শোক–সাগরে সকলে ভাসিতেছি॥

সু-সন্তান বিয়োগ হেতু যেন বসুমতী
হাহাকার রবে কাঁপায় গগন জল-স্থল-ক্ষিতি
সুধা-রস রূপ পবিত্র সর্বভাষা মিশ্রিত
হারায়ে উন্মাদ আমরা আছি।।

অনিত্য এ সংসারে যদি তিনি গেছেন চলে
তাঁহার অক্ষয় কীর্তি অমর সর্বকালে।।
তিনি হন জিন্নাতবাসী এই দোয়া দিবানিশি
রহিম রহমানের কাছে করিতেছি।।

নজরুল এসলাম কয় চাচাজানের অকাল মৃত্যু শেল
নয় জলে বুক উন্মাদ টুকরা টুকরা ফেল
একে পিতৃবিয়োগ তাহে চাচাজানের শোক
হায় এ ছার মর্তলোক মিছামিছি।।

[কাজী বজলে করিম ছিলেন নজরুলের চাচা এবং কবির কৈশোরকালে ফারসী শিক্ষার এবং লেটো গানের ওস্তাদ। বজলে করিমও কবি ছিলেন। নজরুলের উপরোক্ত দুটি রচনা শেখ আজিবুল হক রচিত 'নজরুল ইসলাম ও বাংলা সাহিত্য' শীর্ষক গ্রন্থ থেকে (প্রথম প্রকাশ ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৪) সংকলিত]

৩২

ইংরেজি মিশ্রিত চাপান গান

ওহে ছড়াদার ওহে That পাল্লাদার
মস্ত বড় Mad
চেহারাটাও Monkey Like
দেখতে Very Bad
Monkey লড়বে বাবর কী সাথ
ঈয়ে বড়া তাজ্জব বাত।
জানেনা ও ছোট হলেও
হা মাভি Lion Lad
শুনো ওহে Brother দোহারগণ
মচ্ছ ছানারা সব করিয়াছে পণ
গান গাইবে আসর মাঝে
খবর বড় Sad

[কবিতাটি নজরুলের নাতী সুবর্ণ কাজীর 'চুরুলিয়া, কাজী পরিবার ও নজরুল' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে সংকলিত। দ্রষ্টব্য : 'ব্রহ্মপুত্র' প্রথম আন্তর্জাতিক নজরুল সম্মেলন সংখ্যা ২০০৫]

for Kamal Gupta
(H.M.V.)

৩৩

ভজন

(ভেরোঁ-গীতাঙ্গী)

প্রভাত-বীণা তব বাজে হে।
উদার অম্বর মাঝে হে॥

তুষার-কান্তি
তব প্রশান্তি
শুভ্র আলোকে রাজে হে॥

তব আনন্দিত গভীর বানী
শোনে ত্রিভুবন যুক্ত-পাণি।
মন্ত্রমুগ্ধ ভাব গঙ্গা
নিস্তরঙ্গা লাজে হে॥

for Mrs Kamala Devi
(H.M.V.)

৩৪

কীর্ত্তন

যা সখি যা তোরা গোকুলে ফিরে।
যে পথে শ্যামরায় চলে গেছে মথুরায়
কাঁদিতে দে লয়ে সেই পথ ধূলিরে॥

এ তো ধূলি নয় ধূলি নয়
হরি-চরণ-চিহ্ন আঁকা এ যে হরি -চন্দন
ধূলি নয় ধূলি নয়।
আমি এই ধূলি মাখিয়া
হয়ে পাগলিনী, ফিরিব শ্যাম শ্যাম ডাকিয়া।
হবো যোগিনী এই ধূলি তিলক আঁকিয়া।
শুনিয়াছি দূতীমুখে প্রিয়তম আছে সুখে
সেই মম পরম প্রসাদ।

ভুলিয়া এ রাধিকায় সে যদি সুখ পায়
তার সে সুখে সাধিব না বাদ।
আমার দীর্ঘশ্বাসে উৎসব বাতি তার যদি নিভে যায়
তাই ওলো ললিতা (আমি) রব ধূলি-দলিতা
যাবনা লো তার মথুরায়।

আমি মথুরায় যাবনা
মম হারানো মানিক সখি আর ফিরে পাবনা।
হারানো মাণিক তবু ফিরে লোকে পায়
হারানো হৃদয় ফিরে নাহি পাওয়া যায়।
সে চিরতরে হারায়
হৃদয় যে হারায় সে চিরতরে হারায়।
প্রেম যে হারায় সে চিরতরে হারায়॥

for Mrinal & Devi

৩৫

ভজন

মৃ॥ সাজে অভিনব-সাজে রাই শ্যাম পাগলিনী॥
দে॥ নয়ন টিপিয়া হাসে চারিপাশে আহিরিণী॥

মৃ{ আনমনে মনের ভুলে
বাঁধে চূড়া বেণী খুলে
দে॥ সিঁথি-মৌর ফেলে, পরে শিখি-পাখা বিনোদিনী॥

(রাই) সাজে এ কি সাজে রে
(তারে) হেরিয়া কি বনে শ্যাম লুকাইল লাজে রে
গাগরি বিসরি বাজায় সে বাঁশরি॥
পায়েলা পরা পায়ে নূপুর বাজে রে।

পরিহরি নীল শাড়ি এলো পীত ধড়া পরি
হেরিয়া কিশোর হরি মুখে বলে, হরি হরি॥

আয় শ্রীদাম যা রে দেখে
আয় রে সুবোল যারে দেখে,

কালাচাঁদে তোরা দেখেছিস
এবার গোরাচাঁদ যাগো দেখে॥

আয় বিরোজা যা রে দেখ
আয় বিশাখা যা রে দেখে
উছলে রূপের ছটা কোটি রবি শশী জিনি॥

৩৬

ছায়া—তেতালা

রিমিঝিম রিমিঝিম
বারিধারা বরষে। (শাওন ঘোর)।
নাচে শিখী শ্যাম ঘন দরশে॥

চমকে বিজলী ঘনঘন
শনশন পূব-হাওয়া বহিছে হরষে॥

এসো বিরহী শ্যামল মোর ভবনে
নূপুর শোনায়ে শ্রবণে।
চামে ফুটিতে এ হিয়া নীপ সম
তব মধুর সজল পরশে॥

৩৭

মডার্ণ

ঐ নীল গগনের নয়ন-পাতায়
নামল কাজল-কালো মায়া।
বনের ফাঁকে চমকে বেড়ায়
তারি সজল আলো ছায়া॥

তমাল তালের বুকের কাছে
কে ব্যথিত দাঁড়িয়ে আছে
ভেজা পাতায় কাঁপে গো তার
আদুল ঢলঢল কায়া॥

তার অতল কালো ছায়া দোলে
শাল পিয়ালের শ্যামলিমায়
আমলকি-বন ঝিমায় ব্যথায়
ঘনায় কাঁদন গগন-সীমায়।

তার বেদনাই ভরেছে দিক
ঘর-ছাড়া হায় এ কোন পথিক,
আকাশ-জোড়া স্তব্ধ তারি
অসীম রোদন বেদন ছায়া॥

৩৮

হাসির গান

(শ্রীমতী রাধিকার কুল ভক্ষণ)

(কুমারী রাধিকা ঘোষের প্রতি দিদিমার উক্তি)
মাথা খাস রাধে ; কথা শোন ওলো
কুল আর তুই খাসনে।
গোকুল ঘোষের কন্যা যে তুই, কুলগাছ পানে চাসনে
(পরের) কুল গাছ পানে চাসনে॥

ও কুল গাছে বড় কাঁটা
তোর গায়ে অথবা পায়ে বিঁধিলে দায় হবে পথ হাঁটা।
তুই গোকুলের কুলে কলঙ্ক দিলি, যার তার কুল চুরি করে (খেলি)
তুই ভাবিস এখনো বয়স হয়নি, কারণ বেড়াস ফ্রক পরে।
ঐ কুলগাছ আগলায় ভীমরুল চাক
তোর কুল খাওয়া বের হবে ফুলে হবি ঢাক (যবে)।
ওলো পড়তে না তুই কুল খেতে যাস রোজ রোজ ইস্কুলে,
কুলে কাঁটায় দুকুল ছিঁড়িস বেনি আসিস খুলে
খাস তুই টোপাকুল খাস নারকুলে কুল
অত কুল খেয়ে রাতে পেট ডাকে কুলুকুল।
আর কুলোতে নারি, (আমি) কুল দিয়ে আর কুলোতে নারি।
ছিল কুলুঙ্গীতে কুলে আচার, (আমি) কুল দিয়ে আর কুলোতে নারি।
ছিল কুলুঙ্গীতে কুলের আচার, তাও খেয়েছিস কুল খোওয়ারি।
ঐ কুল গাছ ধরে কোলাকুলি করে, তুই কি ফ্যাসাদ বাধাবি শেষে?
কুলত্যাগিনী হবি কি নাতিনী কুল গাছে ভালোবেসে॥

for
K. Gupta

৩৯

ভজন

খেলোনা আর আমায় নিয়ে প্রিয় অলস খেলা।
নিঠুর খেলা খেল এবার, ফুরায় খেলার বেলা॥

অন্ধকারের আড়াল হতে
লও হে টানি বাহির পথে,
চঞ্চলতার বিপুল স্রোতে
দাও ভাসাতে ভেলা॥

সবার চেয়ে ভালোবাস আঘাত যারে হানো,
স্মরণ যারে করো, তারে মরণ-টানে টানো।

ঠাঁই যারে দাও চরণ-তলে
ভোলাওনা তায় সুখের ছলে,
মালার নামে দাওনা গলে
তোমার অবহেলা॥

for Belarani Dey

৪০

আমার কাছে এই কখানি গান।
তা দিয়ে কি ভরবে তোমার প্রাণ॥

অনেক বেশি তোমার দাবি
শূন্য হাতে তাইতো ভাবি
কি দান দিয়ে ভাঙব তোমার
গভীর অভিমান॥

তুমি চাহ গভীর ব্যাকুলতা
আমার আছে বলার দুটী কথা।

যে বাঁশরি গায় অবিরাম
প্রিয়তম তোমারি নাম
যাবার বেলায়
তোমায় দিলাম
সেই বাঁশরি খান॥

for
S. Banarjee
(H.M.V.)

৪১
রসিয়া

খুলেছে আজ রঙের দোকান
বৃন্দাবনে হোরির দিনে।
প্রেম-রঙিলা ব্রজের বালা
যায় গো হেথায় আবির কিনে॥

আজ গোকুলের রং-মহলায়
রামধনু ঐ রং কিনে যায়,
সন্ধ্যা সকাল রাঙতনা গো
এই হোরির কুঙ্কম বিনে॥

রং কিনিতে আসে হেথায়
রবি শশী আকাশ ভেঙে,
এই ফাগুনী ফাগের রাগে
অশোক শিমুল ওঠে রেঙে।
আসে হেথায় রাঙা-বাধব
এই রঙেরই পথ চিনে॥

for
Dhiren Das

৪২
বাউল

ভবের এই পাশা খেলায়
খেলতি এলি হায় আনাড়ি
হাতে তোর দান পড়ে না
হাত খোলেনা তাড়াতাড়ি॥

সংসার-ছক পেতে হায়
বসে রোস মোহের নেশায়
হেরে যে সব খোয়ালি
যাসনে তবু খেলা ছাড়ি॥

তোরি সে চালের দোষে যায় কেঁটে তোর পাকা গুটি,
ফিরিতে হয় অমনি যেমনি যাস ঘরে উঠি
ও হাতে হর্দম চক ছয়-তিন-নয় পড়চে আড়ি॥

প্রাণ মন দুই গুটিতে যুগ বেঁধে তুই যা এগিয়ে
দেহ তোর একলা গুঠি রাখ আড়িতে মার বাঁচিয়ে।
আড়িতে মার খেলে তুই স্বর্গে যাবি,
জিতবি হারি॥

for
Kumari Renu Bose
(Twin)

৪৩

মডার্ণ

তুমি পালিয়ে যাবে গো
আমি দ্বার খুলে আর রাখবনা।
জানবে সবে গো
নাম ধরে আর ডাকবনা॥

এবার পূজার প্রদীপ হয়ে
জ্বলবে আমার দেবালয়ে,
জ্বালিয়ে যাবে গো
আর আঁচল দিয়ে ঢাকবনা॥

হার মেনেছি গো
হার দিয়ে আর বাঁধবনা।
দান এনেছি গো
প্রাণ চেয়ে আর কাঁদবনা।

পাষাণ তোমায় বন্দী করে
রাখব আমার ঠাকুর-ঘরে,
আমি রইব কাছে গো
আর অন্তরালে থাকবনা॥

৪৪
মডার্ণ

আবার কেন আগের মতো অমন চোখে চাও।
যে বিরহ গেছি ভুলে, ভুলতে তারে দাও॥

শান্ত উদাস আমার আকাশ
নাই সেথা আর মেঘের আভাস
নির্ম্মল সে আকাশ কেন বাদল-মেঘে ছাও॥

বিপুল ধরার দূর নিরালায়
একটুখানি পেয়েছি ঠাঁই
নিঠুর, তুমি আবার আগুন জ্বেলোনা সেথাও॥

for
Kumari Gita Bose

৪৫

তোমায় ফেলে এসেছিলাম
সুদূর ভাটীর দেশে।
কে জানিত, আসবে আবার
উজান স্রোতে ভেসে॥

যে মণিহার অবহেলায়
হারিয়েছিলাম ভুলের খেলায়
সে হার কেন আবার গলায়
জরায় বেলা-শেষে॥

ফেরে না আর শাখায়, যে ফুল
ধূলায় পড়ে খসে।
তবু যেন কিসের আশায়
কূলে ছিলাম বসে।

বহুদিনের ধূলি মেখে
গেছিল যে স্মৃতি ঢেকে,
সেই বেদনা জাগালে কে
আবার ভালোবেসে॥

Tr.
Dastidar

for
Indu Bala
(H.M.V.)

৪৬

তুমি যখন এসেছিলে
তখন আমার ঘুম ভাঙেনি।
মালা যখন চেয়েছিলে
বনে তখন ফুল জাগেনি॥

আমার আকাশ আঁধার কালো
তোমার তখন রাত পোহালো
তুমি এলে তরুণ আলো
তখন আমার মন রাঙেনি॥

রুদ্ধ ছিল মোর বাতায়ন
পূর্ণশশী এলে যবে
আঁধার রাতে একলা জাগি
হে চাঁদ, আবার আসবে কবে!

আজকে আমার ঘুম টুটেছে
বনে আমার ফুল ফুটেছে,
ফেলে-যাওয়া তোমার মালায়
বেঁধেছি মোর বিনোদ বেণি॥

for
Kumari
Kalayani Chatterjee

৪৭

কে বলে গো তুমি আমার নাই।
তোমার গানে পরশ তব পাই॥

তোমায় আমায় এই নীরবে
জানাজানি অনুভবে,
তোমার সুরের গভীর স্তবে
আমারি কথাই॥

হে বিরহী ! আমায় বারেবারে
স্মরণ করো সুরের সিন্ধু-পারে।

ওগো গুণী ! পেয়ে আমায়
যদি তোমার গান থেমে যায়
উঠবে কাঁদন সুরের সভায়
চাইনা কাছে তাই॥

৪৮

আমার আছে অসীম আকাশ
তোমার আছে ঘর।
তোমার আছে পারের তরী
আমার বালুচর॥

তোমার আছে কূলের আশা
আমার অকূল স্রোতে ভাসা,
আমায় ডাকে দূর আলেয়া
তোমায় প্রদীপ-কর॥

থাকুক তোমার দখিণ হাওয়া
আমার থাকুক ঝড়,
তোমার তরে তরুর ছায়া
আমার তেপান্তর।

তুমি ঘুমাও সুখের কোলে ;
আমি ভুলে-যাওয়ার দলে,
হারিয়ে তোমায় মোর ধরণি
হলো বিপুলতর॥

for
Dhiren das

৪৯

শ্রান্ত-ধারা বালুতটে শীর্ণা নদীর গান।
সেই সুরে গো বাজে আমার করুণ বাঁশির তান॥

সাথি-হারা একলা পাখি
যে সুরে যায় বনে ডাকি
সেই কাঁদনের বেদন মাখি
বিধুর আমার প্রাণ ॥

দিন শেষের ম্লান আলোতে ঘনায় যে বিষাদ,
আমার সুরে জড়িয়ে আছে তারি অবসাদ।

ঝরা পাতার মরমরে
বাদল রাতের ঝরঝরে
বাজে আমার গানের সুরের
গোপন অভিমান ॥

for "Dacca"

৫০

রূপ নয় গো, এযে রূপের শিখা।
কে বিদ্যুল্লতা তুমি, কে গো সাহসিকা ॥

বহ্নি-জায়া স্বাহা সমা
কে গো তুমি তন্বী রমা?
ললাট ঘেরি জ্বলে তোমার
সবিতারই টীকা।
কে গো সাহসিকা ॥

মনের তিমির পলায়, হেরি
তোমার আঁখির জ্যোতি।
নীল গগনের শুকতারা গো
ভোরের জ্যোতির্মতী।

তোমার রূপের মাণিক ঝরে
চাঁদের আলোয় রবির করে,
রাঙা ফুলের লাল আখরে
তোমারি গান লিখা ॥

for Miss Suniti Surkar
(Twin)

৫১
খাম্বাজ-দাদ্‌রা

জ্বালিয়ে আবার দাও
আমার নিভিয়ে দেওয়া দীপ।
পরিয়ে আবার দাও
শুভ সীমন্তে মোর টিপ॥

খোলো খোলো রুদ্ধ দ্বার
আনো গন্ধরাজের হার
আধো অঞ্চলে আমার
বসো হৃদয় অধিপ॥

মোর নিরাভরণ করো
করো কঙ্কন-মুখর
করো উজল, ওগো চাঁদ,
আমার আঁধার নীলাম্বর।

মম অশ্রু-বরষায়
এসো রামধনুরই প্রায়,
প্রেম-কদম্ব-শাখায়
আবার ফুটিয়ে তোলো নীপ॥

for Kumari Gita Bose

৫২

অন্ধকারে এসে তুমি
অন্ধকারে গেছ চলে।
তোমার পায়ের রেখা জাগে
শূন্য গৃহের আঙন কোলে॥

কেন আমায় জাগালেনা
আঘাতে ঘুম ভাঙালেনা,
দলে কেন গেলে না গো
যাবার বেলা চরণ-তলে॥

কৃষ্ণাতিথির চাঁদের মতো
এসেছিলে গভীর রাতে
আলোর পরশ বুলিয়েছিলে
ঘুমন্ত মোর নয়ন-পাতে।

তাই রজনী-গন্ধা সুখে
চেয়ে আছি ঊর্দ্ধমুখে
ফুলগুলিরে জাগিয়ে গেলে
নিঠুর আমার গেলে ছলে॥

Tr.
Dastidar

for Renu Bose

৫৩
(কীর্তন ভাঙা)

(তুমি) আমারে কাঁদাও নিজেরে আড়াল রাখি।
(বঁধু) তুমি চাও আমি নিশিদিন যেন
তব নাম ধরে ডাকি॥

হে লীলা-বিলাসী বঁধু অন্তরতম
অন্তর-মধু চাহ বুঝি মম
গোপনে করিতে পান, ওগো বঁধু
অন্তরালে সে থাকি॥

বিরহ তোমার ছল, কেন নাহি বুঝি
আমাতে রহিয়া কাঁদাও আমারে,
তবু কেন মরি খুঁজে।

ভুলি থাকি সুখের মোহে
তাই বুঝি কাঁদাও বিরহে
(বন্ধু ওগো বন্ধু)
তুমি অন্তরে এলে রাজ-সমারোহে
নয়নেরে দিয়ে ফাঁকি॥

৫৪

কুড়িয়ে কুসুম ছড়িয়ে ফেল অভিমানে।
কিসের তরে, কে জানে তা
কে জানে॥

অন্যমনে অঙ্গুলিতে
জড়াও বেণির জরিন ফিতে,
ঝরলে পাতা চাও চকিতে
পথের পানে॥

ছড়ানো ফুল কুড়িয়ে আবার মালা গাঁথি
কাঁদ বসে তরুতলে আঁচল পাতি।

ঘরে ফেরার পথে যেতে
চমকে দাঁড়াও ধানের ক্ষেতে,
পথিক বঁধু কাঁটার রূপে
আঁচল টানে॥

for Miss Anima
(H.M.V.)

৫৫

মেঘলা-মতীর ধারা-জলে করো স্নান। (হে ধরণী)।
স্নিগ্ধ শীতল মেঘ-চন্দনে জুড়াও তাপিত প্রাণ
(হে ধরণী)

তব বৈশাখী ব্রত শেষে
শ্যাম-সুন্দর বেশে
নব দেবতা এলো হেসে
লহ আশীষ-বারি দান॥ (হে তাপসী)॥

তব ভূষণ-হীন উপবাস-ক্ষীণ কায়
হোক নবতর শ্যাম সমারোহে, পুষ্পিত সুষমায়।

তীর্থ-সলিলে কৃষ্ণা!
দূর করো গো তৃষ্ণা,
শ্যাম দরশ পরশ-ব্যাকুলা
হরষে গাহ গান॥ (হে তপতী)॥

for Montu
(H.M.V.)

৫৬
ভৈরবী

তোমার ফুল–ফোটানো সুর
তোমার মন–কাঁদানো গান।
তোমার বাণী ব্যথাতুর
আমার উদাস করে প্রাণ॥

মৃদু মন্দ–গতি ধীর
তব ছন্দের মঞ্জুরি
মম মরমে জাগায়–
বঁধু যমুনার উজান।

তব আঁখি সকরুণ সদা উদাস ছলছল,
তোমার আনমনা মন আমার চোখে আনে জল।

তুমি চাওনা তবু হায়
হৃদি তোমার পানে ধায়
যদি ঠেলতে মোরে পায়
করো পায়ের পরশ দান॥

for Kumari Parul Sen
(H.M.V.)

৫৭

মালা যদি মোর ধূলায় মলিন হয়।
বসে আছি তাই অঞ্চলে নিয়ে
কুসুমের সঞ্চয়॥

ফুলহার যদি করো অবহেলা,
তাই ভাবি আর বয়ে যায় বেলা

হৃদয়ে থাকুক লুকানো আমার
হৃদয়ের পরিচয় ॥

বিফল যদি গো হয় পূজা নিবেদন
মন্দির-দ্বারে দাঁড়াইয়া তাই,
পাষাণের নারায়ণ !

কেন কাছে আসি, এসে ফিরে যাই
যদি ফেল জেনে, ভয় মানি তাই,
সকলি সহিব সহিতে নারিব
হৃদয়ের পরাজয় ॥

for Indubala
(H.M.V.)

৫৮

কাছে আমার নাই বা এলে
হে বিরহী দূর ভালো।
না-ই কহিলে কথা তুমি,
বলো গানে-সুর ভালো ॥

না-ই দাঁড়ালে কাছে আসি
দূরে থেকেই বাজিয়ো বাঁশি
চরণ তোমার নাইবা পেলাম
চরণের নূপুর ভালো ॥

পথে পাওয়ার চেয়ে, আমায়
চাওয়াও যেন পথ, বঁধু
দুই কূলেতে রইব দুজন, বইবে মাঝে স্রোত বঁধু।

পরশ তোমার চাইনা প্রিয়
তোমার হাতের আঘাত দিও,
মিলন তোমার সইতে নারি,
বেদনা বিধুর ভালো ॥

for Miss Lila
(H.M.V.)

৫৯

ঠুমরী—আদ্ধাকাওয়ালী

শূন্য বাতায়নে একা জাগি
সুদূর অতিথি তোমার লাগি॥

মম জাগার সাথি
একা নিসুতি রাতি,
জ্বলে শিয়রে বাতি
(মম) ব্যথার-ভাগী॥

(মোর) বিফল মালার কুসুমগুলি
ঝরিল ধূলায় (হায়) পড়িল খুলি।

আর কত জনম
কাঁদি হে প্রিয়তম
তব দরশ মাগি॥

for Bhakti
(Twin)

৬০

মনে রাখার দিন গিয়েছে
আজিকে ভোলার বেলা।
আর লাগেনা ভালো আমার
হৃদয় নিয়ে খেলা॥

লগ্ন ছিল, ছিল সময়
পরাণ ভরা ছিল প্রণয়,
সেদিন যদি আসতে মলয়
বসিত ফুলের মেলা॥

সুকুমার সুন্দর যাহা
ছিল গো আমার মাঝে
গেছে মরে নিরাশাতে
ঝরিয়া গেছে লাজে।

আজ উদাসীন শূন্য মনে
ঘুরে বেড়াই অকারণে,
তোমার চেয়েও আমি আমায়
হানি অবহেলা॥

for Kiran Ghose
(H.M.V.)

৬১
যোগিয়া—দাদরা

অশ্রু বদল করেছিনু মোরা
গিয়াছ ভুলে।
স্বপন-মদির ঘুমতী নদীর নিরালা কূলে।
—গিয়াছ ভুলে॥

জানে রবি শশী কোটি গ্রহতারা
বনের বিহগ নদী জলধারা—
পূজেছিলে মোরে দেবতা বলিয়া
কুসুম তুলে।
গিয়াছ ভুলে॥

বিসর্জনের প্রতিমার সম কালের স্রোতে
তোমারে ভাসায়ে ঘুরিয়া বেড়াই বাহির-পথে।

(আজি) নন্দন-লোকে তুমি ইন্দ্রাণী
চিনিতে আমায় পারিবেনা জানি,
শুকায়েছে ফুল পূজার পাষাণ
বেদী মূলে॥

for Gopal Sen
(H.M.V.)

৬২

এসো তুমি একেবারে প্রাণের পাশে।
যাও মিশে গো আমার প্রাণে, আমার শ্বাসে॥

লতা যেমন জড়িয়ে ধরে তরুর শাখা,
কমল যেমন দীঘির জলে রয় গো ঢাকা,
মলয় যেমন মিলিয়ে থাকে ফাগুন–মাসে॥
তেমনি তুমি এসো আমার প্রাণের পাশে

নদী যেমন যায় হারিয়ে নীল সাগরে
আমরা যেন এক হয়ে যাই তেমনি করে।

বাদ
যেমন কাছে চাহে কপোত কপোতীরে
সুবাস পরাগ থাকে যেমন কুসুম ঘিরে
আলো যেমন মিশে থাকে নীল আকাশে॥
তেমনি তুমি এসো আমার প্রাণের পাশে

৬৩

আমি উদাসীন, আমি ভুলেছি সবায়।
(হায়) ডেকোনা আমায় আর প্রাণের সভায়॥

কভু ছিলাম সাগর,
আজি মরু বালুচর,
ওগো তৃষ্ণা–কাতর !
জল চেয়োনা হেথায়॥

কভু শ্যামল ছিল এ ধূসর প্রান্তর,
মোর প্রাণে ছিল প্রেম, ধ্যানে চির–সুন্দর !

আজ হারায়েছি সব
তাই লুকায়ে নীরব
শুনি দূর কলরব
আর কাঁদি বেদনায়॥

for Gopal Sen
(H.M.V.)

৬৪

একলা জাগি তোমার বিদায়-বেলার ব্যথা লয়ে।
যাওয়ার বাণী কাঁদে বুকে ফিরে-আসা হয়ে॥

কে জানিত তোমার তরে
কাঁদবে পরাণ এমন করে,
রইব পড়ে ধুলার পরে
বিপুল পরাজয়ে॥

ভালোবাসায় ভালোবেসে রাখতে যে হয় বেঁধে
তুমি চলে যাওয়ার পরে শিখেছি তাই কেঁদে।

না চাহিতে পেয়ে তোমায়
অবহেলা করেছি হায়,
ফিরে এসো, বাঁধব এবার
নতুন পরিচয়ে॥

for
ছায়া চট্টোপাধ্যায়

৬৫
ভাটিয়ালী—কার্ফা

গানের সাথি আছে আমার
সুরের সেতু-পারে।
তারি আশায় গানের ভেলা
ভাসাই পারাবারে॥

জানি জানি আমার এ সুর
পাবেই পাবে চরণ বঁধুর,
ঐ ভেলাতে আসবে বঁধু
গভীর অন্ধকারে॥

ঘুমে যখন মগ্ন সবাই
বন্ধু আমার আসে,
ফুলের মতো সুরগুলি (মোর সুরগুলি) তার
মুখে চেয়ে হাসে।

উদ্দেশ্যে তার গানগুলি মোর
যায় গো উড়ে নেশায় বিভোর,
যেমন করে যায় গো চকোর
চাঁদের অভিসারে॥

for Indubala
(H.M.V.)

৬৬
দাদ্‌রা

ওকে উদাসী বেণু বাজায়।
ডাকে করুণ সুরে আয় আয়॥

ওসে বাঁধন-হারা বাহির-বিলাসী
গৃহীরে করে সে পরবাসী
রস-যমুনাতে উজান বহায়॥

মম মনের ব্রজে কে কিশোর রাখাল
যেন বাজায় বাঁশি শুনি অনাদিকাল।

তার সরলবাণী তার তরল তাল
তার কাজল আঁখি তনু তরুণ তমাল
কভু কাঁদায় কভু আনন্দে ভাসায়॥
অন্তরে গরল-সুধা মিশায়

৬৭
"রাস" (চক্রব্যূহ)

রাস-মঞ্চে দোল দোল লাগে রে, লাগে রে
জাগে ঘূর্ণী নৃত্যের দোল।
আজি রাস-নৃত্য-নিরাশ চিত্ত জাগো রে
চল যুগলে বন-ভবনে
আনো নিথর হেমন্ত-হিম পবনে
চঞ্চল হিল্লোল॥

শতরূপে প্রকাশ আজি শ্রীহরি
শতদিকে শত সুরে বাজে বাঁশরি

সকল গোপিনী আজি রাই কিশোরী
যাবে তৃষ্ণা, পাবে কৃষ্ণের কোল॥

তরলতাল-ছন্দ দুলাল
নন্দ-দুলাল নাচে রে,
অপরূপ রঙ্গে নৃত্য-বিভঙ্গে
অঙ্গের পরশ যাচে রে।
মানস-গঙ্গা অধীর তরঙ্গা
প্রেমের যমুনা হলোরে উতরোল॥

৬৮•

কীর্তন

গাও কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম।
গাও দেহমন শুক সারি গাও রে ব্রজের নরনারী
গাহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম॥

গাও তাঁরি নাম যমুনার বারি
গাও কুহু কেকা ধেনু বন-চারী,
গাহ রে শ্রীদাম গাহ সুদাম॥

গাহ রে সজল শ্যামল গগন
কদম্ব-তরু তমাল-কানন
গাহ রে ভ্রমর মাধবী-লতা কৃষ্ণ-কথা
শ্রবণ-অভিরাম॥

গাহ লো বিশাখা, গাহ লো ললিতা
গাহ শ্যাম-দয়িতা চন্দ্রাবলী (শ্যাম নাম)
গাহ লো চন্দ্রাবলী,
ভুবন ছাপিয়া গগন ব্যাপিয়া উঠুক কাঁপিয়া
নাম-কাকলি।
(শ্যাম-নাম কাকলি)।

তোরা গেয়ে যা গেয়ে যা,
হয়ে শ্যাম-নামে বিবাগী পথে পথে ধেয়ে যা।
ঘনশ্যাম পল্লবে মনো-বন ছেয়ে যা।
বহিয়া যাক শ্যাম-নাম সুরধুনী
মধুর হোক মৃত্যু শ্যাম নাম শুনি॥

৬৯
ভজন (চক্রব্যূহ)

নমো শ্রী কৃষ্ণ অনন্ত–রূপ ধারী বিশাল।
কভু প্রশান্ত উদার কভু কৃতান্ত করাল॥

বিরাট বিপুল তব মহাবিশ্বে
অনন্ত প্রকাশ অনন্ত দৃশ্যে,
গদা পদ্মধারী কভু গোলোক–বিহারী
কভু গোপাল ব্রজ–দুলাল কিশোর রাখাল॥

কভু মুরারি কংস–অরি কভু মুরলিধারী
কভু ভূপতি কভু সারথি প্রভু ত্রিলোক–চারী।

কভু দুঃখ–ত্রাতা,
কভু মোক্ষ–দাতা,
সৃষ্টিবিনাশে লীলা–বিলাসে
মগ্ন তুমি আপনভাবে অনাদি কাল॥

৭০
গারা—দাদ্‌রা

ধীর চরণে নীর ভরণে
চলে তন্বী নাগরি।
চরণ–ছন্দে নাচে আনন্দে
বাহুর বন্ধে গাগরি॥

হেরি তাহার অঙ্গ ভঙ্গ
উতল হলো নদী–তরঙ্গ
পাগল বায়ু করিছে রঙ্গ
উড়ায়ে ওড়না ঘাগরি॥

বিজন পথ মুখর করি
যায় কি রাঙা সন্ধ্যা–পরী,
এলো সহসা গগন ভরি
পূর্ণিমা–কোজাগরি॥

for Jotin Dutt

৭১

পরজনম থাকে যদি
সেথায় আবার দেখা দিও।
এ জনমের চাওয়া আমার
আর-জনমে হয়ো প্রিয়॥

এবার পাষাণ-মূরতিরে
চেয়ে গেলাম অশ্রু-নীরে,
পরজনমে এসে ফিরে
আমার বরণ-মালা নিও॥

এ জনমের বিফল আশা ভালোবাসা তোমায় দিয়া
বিদায় নিলাম ওগো আর জনমে হয়ো প্রিয়া।

জানি জানি আমার প্রেমে
বেদী হতে আসবে নেমে,
আমার প্রীতির হিঙুল রঙে
রাঙবে তোমার উত্তরীয়॥

৭২

জাতের জাঁতি-কল।

একে একে সব মেরেছিস জাতটা শুধু ছিল বাকি,
টিকি ধরে টানিস তোরা, তারেও এবার মারবে নাকি॥

রান্না ঘরে কাঁথা চেপে কোনোরূপে শাস্ত্র-বুড়ো
জাত বাঁচিয়ে লুকিয়ে আছে, তারেও বাবা দিসনে হুড়ো।
এক কোণে সে পড়ে আছে ছোঁওয়া ছোঁওয়ির কাঁথা ঢাকি॥

জবুথবু জাতকে নিয়ে এ তো দেখি ভারি ল্যাঠা
পথ চলতে গেলেই দেখি, শূদ্র অজাত বেজাত ঠ্যাঁটা।
মেথর চাঁড়াল ডোম হাড়ি সব মাল নিয়ে যায় কাঁচি পাকি॥

গরুর গাড়ী চড়তে গিয়ে দেখি শূদ্র চালায় গাড়ি
হুঁকোতে টান দিতে গিয়ে জল ফেলে দিই তাড়াতাড়ি।
রেলগাড়ীতে বামুন শূদ্রে মাছে শাকে মাখামাখি॥

মেথররাণীটা বললে, 'বাবু, জাত জান কি তোমার মায়ের?'
পাঁচ ছেলের সে ময়লা ফেলে, আমি ফেলি লক্ষ ছেলের
স্নান করে সে ঠাকুর পূজে আমার বেলা জাতের ফাঁকি॥

ছোঁওয়া ছুঁয়ি বাঁচিয়ে বাঁচি পৃথিবীতে কেমন করে?
অব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছ চাঁড়াল চতুর্দিকে আছে ভরে,
এমন করে কদিন চালাই জাতের ছেঁড়া কাপড় ঢাকি॥

for Dhiren Das
(H.M.V.)

৭৩

ভজন

তুমি দিয়াছ দুঃখ শোক বেদনা,
তোমারি জয়।
তুমি ভালোবাসো যারে কাঁদাও তাহারে
ছলনাময়॥
তোমারি জয়॥

তুমি কাঁদায়েছ বসুদেব দেবকীরে
নন্দ যশোদা ব্রজের গোপীরে
কাঁদাইলে তুমি শত শ্রীমতীরে
হে নিরদয়॥
তোমারি জয়॥

তোমারে চাহিয়া কোটি নয়নের
বিরহ অশ্রু ঝুরে
ধরণি আজ ডুবু ডুবু শ্যাম
সাগর-সলিলে পুরে।

ভক্তে কাঁদাতে হে ব্যথা-বিলাসী
যুগে যুগে আসি বাজাইলে বাঁশি
তবু এ পরাণ তোমারি পিয়াসি
মানেনা ভয়॥
তোমারি জয়॥

for Nitai Ghatak
(Twin)

৭৪
ভজন

কালো কালিন্দী–সলিল–কান্তি চিকন ঘনশ্যাম।
তব শ্যাম রূপে শ্যামল হলো সংসার–ব্রজধাম॥

রৌদ্রে পুড়িয়া তাপিতা ধরণি অবনি
চেয়েছিল শ্যাম–স্নিগ্ধ লাবণি
আসিলে অমনি নবনীতে–তনু ঢলঢল অভিরাম॥

আধেক বিন্দু রূপ তব দুলে ধরায় সিন্ধু–জল
তব ছায়া বুকে ধরিয়া সুনীল হইল গগন–তল।

তব বেণু শুনি ওগো বাঁশুরিয়া
প্রথম গাহিল কোকিল পাপিয়া
হেরি কান্তার–বন–ভুবন ব্যাপিয়া
বিজড়িত তব নাম॥

৭৫
নাচ

কার বাঁশরি বাজে বেণু–কুঞ্জে উদাস সুরে।
সেই সুরে গো মন উড়ে যায় দূর সুদূরে॥

নাচে সে সুরে কুরঙ্গ
হয় ধ্যানীর ধ্যান ভঙ্গ,
চাহে প্রাণ তারি সঙ্গ
হৃদি জড়ায় তারি নূপুরে॥

সেই সুর–অনুরাগে
নভে তরুণ তপন জাগে,
নীপ–শাখে দোলা লাগে
সখি এনে দে সেই বঁধুরে॥

for
Durga Gangulity

৭৬
মড়ার্ণ

একটুখানি দাও অবসর বসতে কাছে।
অনেক যুগের অনেক কথা বলার আছে।

গ্রহ ঘিরে উপগ্রহ
ঘোরে যেমন অহরহ
আমার এ ব্যাকুল বিরহ
তেমনি তোমায় যাচে॥

চিরকালই রইলে তুমি দূরে দূরে
আজকে ক্ষণিক কইব কথা গানের সুরে।

করব পূজা গানে গানে
চাইবনা ও নয়নপানে
আমার চোখের অশ্রু তুমি
দেখা দেয় পাছে॥

for Narayan Bose
(Twin)

৭৭
ভজন

তোমার আঘাত শুধু দেখল ওরা
দেখলনাকো তোমাকে।
দেখলনা হে করুণাময় তোমার
অশেষ ক্ষমাকে॥

ওরা একটু কিছু যদি হারায়
কৃপণ সম কেঁদে ভাসায়
খরচ শুধু দেখল ওরা দেখলনাকো জমাকে॥

মায়ের মারকে ভয় করেনা মাকে ভালোবাস যে
সেই সে মায়ের স্বরূপ চেনে শাসন দেখে হাসে সে।

দুঃখ দেওয়ার দারুণ দুখে
কী যে ব্যথা তোমার বুকে
(ওরা দেখলনা তা দেখলনা)
ওরা দেখলনা ভৈরবের পাশে
সুমঙ্গলা উমাকে॥

Inati Jall Dutt

৭৮

শ্যামা-সঙ্গীত

আমার ঋণের বোঝা শ্যামা
রাখলাম তোর পায়ে
(এবার) তুই দিবি মা ভক্তের তোর
সকল ঋণ মিটায়ে॥

মাগো সমন-হাতে মোর মহাজন
ধরতে যদি আসে এখন
তোরই পায়ে পড়বে বাঁধন
ছেলের ঋণের দায়ে॥

ওমা সুদ আসলে এ সংসারেরই বেড়েই চলে দেনা,
এবার ঋণমুক্তির তুই নে মা ভার, রইব তোরই কেনা।

আমি আমার আর নহি তো
আমি তোর পায়ে যে নিবেদিত
এখন তুই হয়েছিস জামিন আমার
দে ওদের বুঝায়ে॥

for Mrinal Ghose

৭৯

কীর্ত্তনভাঙ্গা

কাঁদবনা আর শচী-দুলাল
তোমায় ডেকে ডেকে।
তুমি গেছ চলে তোমার
প্রেম গিয়াছ রেখে॥

ত্যাগ যেখানে প্রেম যেখানে
তোমার মধুর রূপ সেখানে
জগন্নাথের দেউল তোমায়
রাখবে কোথায় ঢেকে॥

হলো বৈরাগিনী ধরা তোমার চরণ ধূলি মেখে।
তোমার মন্ত্র নিল অসীম আকাশ চাঁদের তিলক এঁকে।

সুন্দর যা কিছু হেরি
রূপ সে শচীনন্দনেরই
(তোমার) ডাক শুনি যে আজও
হৃদয়-পুরীর সাগর থেকে॥

(H.M.V.)

৮০
ভজন

প্রেমের প্রভু ফিরে এসো, শিখাও আবার ক্ষমা।
ধূলির ধরায় আবার বহু পাপ হয়েছে জমা॥

ভোগবতীর ফেনিল জলে
ডুবল ধরা অতল তলে,
ভরল বিশ্ব হলাহলে
ঘিরল নিশীথ অমা॥

শিশুর মতো অবোধ এরা খেলনা নিয়ে তাই
নিত্য করে হানাহানি, ভাইকে মারে ভাই।

তোমার ত্যাগের মন্ত্র দিয়ে
আবার এদের যাও বাঁচিয়ে
ভোগক্লান্ত ধরা (প্রভু, রণক্লান্ত ধরা)
আবার হউক বিশ্বরমা॥

Mati Lall Dutt
(H.M.V.)

৮১
ভজন

আমায় দুঃখ যত দিবি মা গো
ডাকব তত তোরে।
মায়ের ভয়ে শিশু যেমন
লুকায় মায়ের ক্রোড়ে॥

তুই পরখ কত করবি মা আর
চারধারে মোর দুখের পাথার

জানি তবু হবো মা পার
চরণ-তরী ধরে।
তোরই চরণ-তরী ধরে॥

আমি ছাড়বনা তোর নামের ধেয়ান বিশ্বভুবন পেলে
আমায় দুখ দিয়ে তোর নাম ভুলাবি নই মা তেমন ছেলে॥

আমায় দুঃখ দেওয়ার ছলে
তুই স্মরণ করিস পলে পলে
আমি সেই আনন্দে দুখের অসীম
সাগর যাব তরে॥

Ranjit Roy
(H.M.V.)

৮২

হাসির গান

ও তুই উলটো বুঝলি রাম।
আমি আম চাহিতে জাম দিলে আর জাম চাহিতে আম॥

আমি চড়বার ঘোড়া চাইতে শেষে
ঘোড়াই ঘাড়ে চড়ল এসে,
আমি প্রিয়ার চিঠি চাইতে এলো Income tax-এর খাম॥

আমি চেয়েছিলাম কোঠাবাড়ি
ভুলে আমি বলেছিলাম—
'তোমার পায়ে শরণ নিলাম'
তাই পিঠে পড়ল লাঠির বাড়ি
তুমি ভুল বুঝিলে ভিটেবাড়ি
তাই হলো নিলাম॥

আমি চেয়েছিলাম সুবোধ ভাইটি
গোঁয়ার সে ভাই উচাঁয় লাঠি
আমি শ্রীব্রজধাম চাইতে, দিলে
শ্রীঘর হাজত-ধাম॥

for Dhiren

৮৩

ভজন

গঙ্গার বালুতটে খেলেছি কিশোর গোরা।
চরণ-তলে টলে পুলকে বসুন্ধরা॥

পড়িল কি রে খসি
ভূতলে রাকা শশী
ঝরিছে অঝোর ধারায়
রূপের পাগল-ঝোরা॥

শ্রীমতী ও শ্রীহরি খেলিছে এক অঙ্গে
দেব দেবী নর নারী গাহে স্তব এক সঙ্গে।

গঙ্গায় জোয়ার জাগে
তাহারি অনুরাগে
ফিরে এলো কি নদীয়ায় ব্রজের ননী-চোরা॥

Mrinal Ghose

৮৪

ভজন

ঘরে আয় ফিরে, ফিরে আয় পথ-হারা
ওরে ঘর-ছাড়া ফিরে আয়।
ফেলে-যাওয়া তোর বাঁশরি, রে কানাই
কাঁদে লুটায়ে ধুলায়॥

ব্রজে আর ফিরে ওরে ও কিশোর
কাঁদে বৃন্দাবন কাঁদে রাধা তোর
বাঁধিবনা আর ওরে ননীচোর
অভিমানী মোর ফিরে আয়॥

তোর মার মতন লয়ে শূন্য কোল
জাগে শূন্য মাঠ গৃহ শোক-বিভোল
ঝরে যায় যে ফুল মরে যায় ফসল
ওরে শ্যামল তোর বেদনায়॥

আসিলে ফিরে ওরে পথ-বেভুল
আবার উঠবে রোদ
আবার ফুটবে ফুল
ধানে ভরবে মাঠ আবার বসবে হাট
জোয়ার বইবে হৃদ-যমুনায়॥

for Indu Sen and Satyabala
(Twin)

৮৫

ভজন

লহ প্রণাম শ্রীরঘুপতি-রাম
নব দুর্ব্বাদল শ্যাম অভিরাম॥

কোরাস—সুরাসুর কিন্নর যোগী ঋষি নর
চরাচর যে নাম জপে অবিরাম॥

সরযূ-নদীর জল-ছলছল-কান্তি
ঢলঢল অঙ্গ, ললাটে প্রশান্তি
নাম শরণে টুটে শোক তাপ ভ্রান্তি
পদারবিন্দে মূরছিত কোটি কাম॥

বঙ্কিম সুঠাম ত্রিভঙ্গি অঙ্গ
পরশে নিমেষে হয় হরধনু ভঙ্গ
বারণ ভয় হরে যাহার নাম॥

পিতৃসত্য-ব্রত-পালনকারী
চীর বল্কলধারী কানন-চারী,
প্রজারঞ্জন লাগি সর্ব সুখত্যাগী
যে নামে ধরা হলো আনন্দ-ধাম॥

for Indu Sen
(Twin)

৮৬

ভজন

বাঁশির কিশোর ! ব্রজ–গোপী চিরচোর এসো গোকুলে ফিরে।
তোমা বিনে গোপী–সখা
ঘিরিল গোকুল ঘোর ঘন তিমিরে॥

ধেনু নাহি গোঠে যায়
শুক সারি নাহি গায়
শিরে করো হানি হায়
গোপ–বালিকা কাঁদে যমুনা–তীরে॥

আঁধার আনন্দ–ধাম
আছে রাধা নাহি শ্যাম
শুনিনা আর কৃষ্ণ নাম
ভাসিল ব্রজের খেলা নয়ন–নীরে॥

৮৭

স্বপন যখন ভাঙবে তোমার
দেখবে আমি নাই।
(মোরে) শূন্য তোমার বুকের কাছে খুঁজবে গো বৃথাই
দেখতে আমি নাই॥

দেখবে জেগে বাহুর পরে
নীরব আমার অশ্রু ঝরে
কাছে থেকেও ছিলাম দূরে
যাইগো চলে তাই॥

ব্যথার মতো ছিলাম বিঁধে
আমি তোমার বুকে
আজকে রাহুমুক্ত তুমি
ঘুমাও ঘুমাও সুখে।

৮৮

এত্‌না তো কর্‌না স্বামী যব্‌ তন্‌ সে নিক্‌লে।
গোবিন্দ নাম কহ্‌কে তব্‌ প্রাণ তন্‌ সে নিক্‌লে॥

গঙ্গা জিকে তট হো য়্যা যমুনা জিকে বট্‌ হো
মেরা শ্যামলা নিকট হো তব্‌ প্রাণ তন্‌ সে নিক্‌লে॥

শ্রী বৃন্দাবন কি খল হো, মেরে ঝুমে তুলসি দল হো
লিয়ে বিষ্ণুপদ জল হো তব্‌ প্রাণ তন সে নিক্‌লে॥

উস্‌ ভক্ত জল্‌দি আয়া মুঝ্‌কো না ভুল জানা
নূপুর কি ধুন্‌ শুনানা তব্‌ প্রাণ তন্‌ সে নিক্‌লে॥

৮৯

চাঁদের দেশের পথ ভোলা পরী
স্রোতে ভেসে আসা প্রবাল মঞ্জরী
পাষাণ নদী তলে
আকূল অঞ্চলে
কিশোরী উপাসিকা
কাঁদিছ কে তুমি

৯০

মোতিলাল নিয়া
অভিমানী প্রিয়া—
বরজুবন পর উতরে কা হুয়ে না দেতে
হরতায় গুঁথলারি মন বস করবে কো
নয়নন মে হার যেতে
কেন ফিরায়ে আঁখি
আনন আঁচলে ঢাকিয়া॥

লুটায় বরণ-ডালা
ছড়ানো কুসুম মালা
সঘন কাঁপিছে হিয়া॥

৯১

সংগীত

মুরশিদ পীর বলো, বলো,
(ওগো) রসূল কোথায় থাকে
কেমন করে কোথায় গেলে
(ওগো) দেখতে পাব তাকে॥

বেহেশতের পারে দূর আকাশে
তাহার আসন খোদার পাশে
এতই প্রিয় আপনি খোদা
(ওগো) লুকিয়ে তারে রাখে॥

কোরান পড়ি, হাদিস শুনি
সাধ মেটে না তাহে
আতর পেয়ে মন যে আমার
ফুল দেখতে চাহে।

সবাই খুশি ঈদের চাঁদে
কেন আমার পরান কাঁদে
দেখব কখন ঈদের চাঁদ
(ওগো) আমার মোস্তফাকে॥

৯২

বনস্পতির গান

ঝড় এসেছে ঝড় এসেছে
কারা যেন ডাকে
বেরিয়ে এলো তরুণ পাতা
পল্লবহীন শাখে॥

ক্ষুদ্র আমার রুদ্র তালে
কচি পাতার লাগল নাচন
ভীষণ ঘূর্ণিপাকে॥

স্থবির আমার ভয় টুটেছে
গভীর শঙ্খ-রবে,
মন মেতেছে আজ নূতনের
ঝড়ের মহোৎসবে ॥

কিশলয়ের জয়-পতাকা
অম্বরে আজ মেললো পাখা
প্রণাম জানাই ভয়-ভাঙানো
অভয় মহাত্মাকে ॥

৯৩
ভজন

অহঙ্কারের মূল কেটে দাও
অহম তরুর মূল কেটে দাও হরি !
আমার মূল আছে, তাই শত রিপুর জ্বালায় জ্বলে মরি।
রোদে পুড়ে জলে ভিজে দিয়েছি ফুল ফল
শাখায় আমার নীড় বেঁধেছে কাক শকুনের দল
(মায়ার) জট পাকিয়ে বট সেজেছি, সাধ্য নাই যে নড়ি।
রাসনারই কাল-নাগিনী

আমার অহঙ্কারের মূল কেটে দাও
(অহং তরুর মূল কেটে দাও)
জিঠুর কাঠুরিয়া।
কত তরু হলো পায়ের তরী
তোমার শরণ মিয়া ॥

বিবিধ

আগুন

পেটে জ্বলে তোর ক্ষুধার আগুন
আগুন জ্বলিছে চোখে,
মনে জ্বলে তোর ক্রোধের আগুন
বুক জ্বলে দুখে শোকে।

ঘরে জ্বলে কেরোসিনের আগুন,
প্রাণে লাগে তার ধোঁওয়া।
মাঠের ফসল পুড়ে যায়
লেগে কাহার তপ্ত ছোঁওয়া?

তোর চারিদিকে আগুন,
তবুও আগুন লাগেনা কেন,
তার বুকে—যে উৎপীড়ক
এ বহ্নি লাগাল হেন?

[কৃষক, ঈদুলফেতর ১৩৪৮, অধ্যাপক ভূঁইয়া ইকবালের সৌজন্যে প্রাপ্ত]

মৃত্যুহীন রবীন্দ্র

রবীন্দ্রনাথ তোমাদের তরে নিত্য আছেন জাগি,
তরুণ, কিশোর, শিশুরা দুঃখ করোনা তাহার লাগি।
দেহ শুধু তার গিয়াছে, যায়নি তার স্নেহ ভালোবাসা,
যখনি পড়িবে ভাষা তার, প্রাণে জাগিবে বিপুল আশা।
নীরস জীবন রসায়িত হবে তার কবিতায় সুরে
তাহার অভয়বাণীতে সর্ব ভয় চলে যাবে দূরে।
যখনি শক্তি পাবে না, নিজেরে দুর্বল মনে হবে,
তার লেখা পড়ে, শক্তি সাহসে নূতন জন্ম লবে।

যখনি পৃথিবী ভালো লাগিবে না দারিদ্র্য ব্যাধি দুখে
পড়িও রবির 'গীতালী' 'গীতাঞ্জলি', বল পাবে বুকে।
রবির বিপুল যশ শুনে শুধু শ্রদ্ধা করো না তাঁরে,
হবে যশস্বী বিদ্বান তাঁর লেখা পড়ো বারেবারে।
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তাঁর লেখায়, কিশোর, শোনো,
—সেই থাকে ছোট, বড় হইবার তৃষা নাই যার কোনো।
নিত্য ভাবিও শয়নে স্বপনে, ক্ষুদ্র হব না আমি,
মোর স্রষ্টা যে নিত্য পূর্ণ সর্বজগত স্বামী।
তারই বরে কোনো অভাব রবে না, আমি পূর্ণতা পাব,
পূর্ণজ্ঞান ও শক্তি লভিব, ধ্যানে তার কাছে যাব।
এই বৃহতের স্বপ্ন যে দেখে, তাহারি কল্পনাতে
রূপ ধরে আসে ভগবৎ-কৃপা, থাকে তার সাথে সাথে।
সেই হয় এই জগতে ধন্য, মহামানব ও বীর
মরিয়াও সে-ই নিত্য অমর, পূজ্য সব জাতির।
বড় হইবার তৃষ্ণা রাখিও, নিশ্চয় বড় হবে,
রবীন্দ্রনাথ না-ই হলে, আরো কত দিকে নাম রবে।
হবে নেপোলিয়াঁ, হিটলার, মবে গান্ধী ভারত-নেতা,
তুমিই জান না, হয়ত তোমাতে আছে বিশ্ব-বিজেতা।
'দাস হব নাক, হইব স্বাধীন অমৃতের সন্তান'
প্রার্থনা করো, আমি বলিতেছি, শুনিবেন ভগবান !
পেয়ে ভগবৎ-শক্তি নামিবে কর্মক্ষেত্রে সবে,
কখনো ভেবো না স্বপ্নেও যেন, কখন চাকরি হবে !
এই ছিল কবি-গুরুর মন্ত্র, সে মন্ত্র যদি লহ,
ঊর্দ্ধ হইতে তাঁহার আশীর্বাদ পাবে অহরহ।

[কিশোরদের জন্য লিখিত]

[রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ, ভূঁইয়া ইকবাল]

অভিনন্দন-পত্র

কবি নজরুল ইসলাম করকমলেষু

কবি,

তোমার অসাধারণ প্রতিভার অপূর্ব অবদানে বাঙালিকে চিরঋণী করিয়াছ তুমি। আজ তাহাদের কৃতজ্ঞতাসিক্ত সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ করো।

তোমার কবিতা বিচার-বিস্ময়ের ঊর্ধ্বে—সে আপনার পথ রচনা করিয়া চলিয়াছে পাগলা-ঝোরার জলধারার মতো। সে স্রোতোধারায় বাঙালি যুগসম্ভাবনার বিচিত্র লীলাবিম্ব দেখিয়াছে। আজ তুমি তাহাদের বিস্ময়মুগ্ধ কণ্ঠের অভিনন্দন লও!

বাংলার সরস কাব্যকুঞ্জ তোমার প্রাণের রঙে সবুজ মহিমায় রাঙিয়া উঠিয়াছে। তাহার ছায়া বাঙালির পলকহারা নীল নয়নে নিবিড় স্নেহঅঞ্জন মাখাইয়া দিয়াছে। আজ তুমি তাহাদের মুগ্ধ নয়নের নির্বাক বন্দনা গ্রহণ করো!

তুমি বাঙালির ক্ষীণ কণ্ঠে তেজ দিয়াছ; মূর্চ্ছাতুর প্রাণে অমৃতধারা সিঞ্চন করিয়াছ। আজ অরুণ উষার তোরণ-দ্বারে দাঁড়াইয়া তাহারা তোমার মরণ-জিগীষু কণ্ঠের জয়-ইঙ্গিত নত মস্তকে বরণ করিতেছে; —তাহাদের হাতের পতাকা তোমার মহিমার উদ্দেশে অবনমিত হইয়াছে। জাতির এ অভিবাদনে তুমি নয়নপাত করো!

তুমি বাংলার মধুবনের শ্যামা-কোয়েলার কণ্ঠে ইরানের গুলবাগিচার বুলবুলের বুলি দিয়াছ; রসালের কণ্ঠে সহকার-শাখে আঙুর-লতিকার বাহু-বন্ধন রচনা করিয়াছ। তুমি বাঙালির শ্যাম শান্ত কণ্ঠে ইরানি সাকির লাল শিরাজির আবেশ-বিহ্বলতা দান করিয়াছ। আজ তোমার আসনপ্রান্তে হাতের বাঁশি রাখিয়া তাহারা তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। তুমি তাহাদের শ্রদ্ধাসুন্দর চিত্তনিবেদন গ্রহণ করো!

ধূলার আসনে বসিয়া মাটির মানুষের গান গাহিয়াছ তুমি। সে গান অনাগত ভবিষ্যতের। তোমার নয়ন-সায়রে তাহার ছায়াপাত হইয়াছে। মানুষের ব্যথাবিষে নীল হইয়া সে তোমার কণ্ঠে দেখা দিয়াছে। ভবিষ্যতের ঋষি তুমি, চিরঞ্জীব মনীষী তুমি, তোমাকে আজ আমাদের সবাকার—মানুষের নমস্কার!

গুণমুগ্ধ বাঙালির পক্ষে
নজরুল-সংবর্ধনা-সমিতির সভ্যবৃন্দ
কলিকাতা, ১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ : ১৫ই ডিসেম্বর ১৯২৯

কবি নজরুল ইসলাম

সিরাজ স্মৃতি উদযাপনের আবেদন

'বীর শহীদের জীবনস্মৃতি হইতে প্রেরণা লাভ করুন'

আগামী ৩রা জুলাই সিরাজউদ্দৌলা স্মৃতি দিবস পালনের জন্য যে আয়োজন হইতেছে, সে সম্পর্কে বাংলার বুলবুল কবি কাজী নজরুল ইসলাম নিম্নরূপ আবেদন প্রচার করিয়াছেন :

আমি জানিতে পারিলাম যে, আগামী ৩রা জুলাই সিরাজউদ্দৌলা দিবস পালনের আয়োজন চলিতেছে। একথা আজ সর্বজনসম্মত যে বাংলার শহীদ বীর ও শেষ স্বাধীন নৃপতি নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা রাজনৈতিক কোলাহলের ঊর্ধ্বে। হিন্দু মুসলমানের প্রিয় মাতৃভূমির জন্য নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। সর্বোপরি বাংলার মর্যাদাকে তিনি ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়াছেন এবং বিদেশি শোষণের কবল হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য আপনার জীবন যৌবনকে কোরবানি করিয়া গিয়াছেন।

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ-র নেতৃত্বে কলিকাতার সিরাজউদ্দৌলা স্মৃতি কমিটি উক্ত অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। কলিকাতা কমিটিকে সর্বপ্রকারে সাহায্য প্রদান করিয়া আমাদের জাতীয় বীরের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিবার জন্য আমি জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের নিকট আবেদন জানাইতেছি। বিদেশির বন্ধন-শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভের জন্য আজ আমরা সংগ্রামে রত। সিরাজউদ্দৌলার জীবনস্মৃতি হইতে যেন আজ আমরা অনুপ্রাণিত হই—ইহাই আমার প্রার্থনা।

[দৈনিক আজাদ, ২৯ জুন ১৯৩৯]

৫ : মুড়ো খ্যাংড়া

এ কালপ্যাচাঁকে আর কত প্যাঁচাখ্যাঁচ্‌রা করবো? বেহায়ার পেছনদিকে গাছ গজালে, বলে ছায়া হচ্ছে। বুড়ো বামুন যে এত বেহায়া বেল্লিক হয়, তা আমাদের ধারণার অতীত ছিল। আর নাম করবো না তার। কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি গঙ্গাযাত্রীর মড়া। এখনো যদি এমন করে জাতি বিদ্বেষ প্রচার করো, পাঁচটা কড়ির লোভে পাঁচ কোটি লোকের সর্বনাশ করো, তবে শঙ্কর মাছের কাঁটার চাবুক দিয়ে তোমার ছাল তুলে নেবো। ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি। এবার তাই দেখবে। এ তোমার বৈষ্ণব–বাঘের দল নয়। এখনো তোমার মাথায়–ঢালা গুয়ের গন্ধ যায়নি, এখনো তোমার মাথার ডাণ্ডার ঘা শুকোয়নি।

সেদিন নাকি এই 'বায়াত্তুরে' বুড়ো বলেছে যে, তার পিতামহ বিশালকায় পুরুষ ছিলেন এবং বোধ হয় পাঠান–রমণী না হলে তাঁর চলতো না। যার পিতামহ বিশালকায় পুরুষ ছিলেন, তার বংশে যদি এইরকম কাপুরুষ দর্শকের পুণ্যস্বরূপ বুঝি তোমা হেন রগচিলে ক্যাকলেসকে বংশাবতংসরূপে প্রাপ্ত হয়েছেন! তাই বিভীষণ সেজে মায়ের মুখে আমার কাদা ছিটোচ্ছ? এই নিরিমিষ্যির দেশেই এমন করে দেশের শত্রুতা সাধন সম্ভব। পড়তে আয়ার্ল্যান্ডে, তাহলে এতদিন তোমায় কচু কাটা করে ছেড়ে দিত। তোমার এই চেহারা আর প্রবৃত্তি দেখেই বোঝা যায় তোমার পিতামহের পাঠানরমণী না হলে চলতো না, না তাঁর নিজের ঘর সামলানোই দায় হতো।

এই মাজা–ভাঙা বুড়ো আবার বলেছেন, 'পাঠান–রমণী পেলে আমিই কোন্ ছাড়ি?' ভ্যালারে ভ্যালা মোদ্দ! সিম–টুনটুনির আবার সাধ যায় ডুমুর গিলতে! গঙ্গাঘাটে তো এগিয়ে আছে, অথচ তরুণী ভার্যা, কাজেই সারারাত জেগে শুধু গরু খেদাও। তোমার 'চামড়া গেছে ঝুলে, চক্ষু গেছে কোটরে, আর কোমর গেছে বেঁকে, বেড়াও লাঠি ধরে', এ বয়সে ফ্যাঁচকামাতু তোমার ফোকলা দাঁতের পাটি বের করে এমন ফ্যাচফ্যাচ করতে তোমার শরম হয় না? কিছু শৃঙ্গার তিলক করে নাও আগে, গোটা কতক বম্বু খুঁটো–টুঁটো দিয়ে মাজাকে আগে সোজা করো, তারপর পাঠান–রমণীকে ঘরে আনবে এবং তার দ্বারের খোদা গোলাম হবে। কুঁজোকে সাধ যায় চিৎ হয়ে শুতে।

শেষবার বলে রাখি, এমন করে বুড়ো কালে 'ইয়ে' চুলকিয়ে আর কালকুলি নিয়ো না। মোহররমের দিন, খামখা একটা দুপুরে মাতন কাণ্ড বেধে যাবে। আমরা শুধু ইংরেজদের চুটিয়ে গাল দিতে ওস্তাদ, কিন্তু এমন দেশদ্রোহীকেও লোকে ক্ষমা করে। হিন্দু–মুসলমান মিলের অন্তরায় যদি কেউ থাকে তবে সে এই ল্যাবেন্ডিস বৃদ্ধ।

['ধূমকেতু', সপ্তম সংখ্যা, শনিবার, ১৬ই ভাদ্র ১৩২৯]

পত্র : ১

[মোহাম্মদ আফজাল-উল হক-কে]

কুমিল্লা

[তারিখবিহীন][1]

ভাই আফজল[2] !

পৌষেল মোঃ ভারত[3] পেলুম। মার লেখাটা[4] যায়নি কেন? যদি মনোনীত না হয়, 'উপাসনা'র ধীরেন বাবুকে দিয়ে দেবেন। যদি মনোনীত হয়ে থাকে, তবে পরের সংখ্যায় যেন যায়। 'রবির ভ্রমর'[5] নামে একটা কবিতা পাঠালুম। পরে আরো পাঠাব। কলকাতা ফিরবার খুব ইচ্ছে করছে, কিন্তু ফিরেই বা কি করব গিয়ে তাই ভাবছি। আমায় গোটা পনের টাকা পাঠাতে যদি পারতেন, তা হলে টাকা পাওয়া মাত্র যেতে পারতুম। মার কাছ থেকে টাকা নিতে লজ্জা করে। আমি গিয়ে আপনার ঋণ শোধ দেবার চেষ্টা করব। আর খবর জানবার তেমন কিছু ইচ্ছা নেই। এখন নির্বিকার। বোম কেদারনাথ। অন্তত ২/৩ খানা 'ব্যথার দান'[6] পাঠাবেন অবশ্য।

সর্বহারা

নজরুল

পত্র : ২

[জসীম উদ্‌দীন-কে]

[কলকাতা?]

ভাই শিশু কবি[1],

তোমার কবিতা পেয়ে সুখী হলুম। আমি দখিন হাওয়া। ফুল ফুটিয়ে যাওয়া আমার কাজ। তোমাদের মত শিশু কুসুমগুলিকে যদি আমি উৎসাহ দিয়ে, আদর দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারি, সেই হবে আমার বড় কাজ। তারপর আমি বিদায় নিয়ে চলে যাব আমার হিমগিরির গহন বিবরে।

[কাজী নজরুল ইসলাম]

পত্র : ৩
[মতিলাল রায়-কে]

মতিলাল দা[১] !

এরা তিনজন[২] উত্তরবঙ্গ থেকে আসছেন দেশভ্রমণে। এরা সকলেই ছাত্র, খুব ভাল ছেলে। প্রবর্তক সংঘের[৩] দেখবার মত বস্তুগুলি এদেরকে দেখিয়ে দেবেন। এরা আমার সহোদরপ্রতিম।

হুগলী
২১/৫/২৫

ইতি—
নজরুল

পত্র : ৪
[কবিশেখর কালিদাস রায়-কে]

কৃষ্ণনগর
[তারিখবিহীন][১]

কালীদা[২],

এইমাত্র সুবোধের[৩] কাছে শুনলাম আমার ওপর রাগ করেছেন। আমায় নাকি বই এবং পত্রও দিয়েছেন। অবশ্য কোন ঠিকানায় দিয়েছেন তা আপনিই জানেন। কৃষ্ণনগরের ঠিকানায়[৪] নিশ্চয়ই দেননি, তা হলে নিশ্চয়ই পেতুম। সবারই সঙ্গে দেখা হয় কোথাও না কোথাও—শুধু আপনারই দেখা পাওয়া যায় না। আগামী রবিবার সন্ধ্যায় যাচ্ছি। থাকবেন যেন, নইলে বাড়ীতে লঙ্কাকাণ্ড করে আসব। আপনার সীতারাম কুটীর[৫] রাবণের লঙ্কা হয়ে উঠবে। আমার গজলের লেজ নিয়ে খুব বড় একটা Leap দিয়েছি। গেলেই দেখতে পাবেন। ইতি—

প্রণত
নজরুল

পত্র : ৫
[সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ও কিরণকুমার রায়-কে]

ভাই সাবিত্রী[১] ও কিরণ[২],

তোমাদের 'উপাসনা'য় মুদ্রিত আমার একটি গান (প্রিয় তুমি কোথায়) 'জয়তী'[৩]তে বেরিয়েছে শুনলাম। 'জয়তী'-সম্পাদককে আমি যে গানটি দিয়েছিলাম—তা' আমার একেবারে মনে ছিল না ; কেননা 'জয়তী' বোধহয় তিনচার মাস অন্তর একবার করে প্রকাশিত হয়। অন্ততঃ তিন মাসের মধ্যে বোধহয় ওর দেখা পাইনি।

এর অপরাধ একা আমার। তোমাদের এবং পাঠকবর্গের কাছে এর জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

ইতি—

নজরুল

পত্র : ৬

[মোহাম্মদ আফজাল-উল হক-কে]

39 Sytanath R.
21-7-34

ভাই আফজল সাহেব[১],

এই পত্র-বাহক একজন দুঃস্থ মুসলিম ছাত্র। আমায় ধরেছেন জায়গীরের জন্য। আমার অবস্থা ত জানেন। যদি মিনিস্টার সাহেবকে বলে কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন, দেখবেন।

আমার নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর নেই।[৩] দেখা করে সব বলব। সেদিন যেতে না পারার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি—বলবেন।

আপনার—

নজরুল ইসলাম

To Afzalul Haq Esq.
Muslim Publishing House
College Sq. East.

পত্র : ৭

[মিঃ রায়-কে]

39, Sitanath Road
10-10-34

প্রিয় মিঃ রায়[১]

আমার অনুজপ্রতিম শ্রীমান কবি আবদুল কাদির[২] যাচ্ছেন আপনার দোকানে একটা আংটি কিনতে। আপনি নিজে দেখে একটা ভাল আংটি দেবেন। যেন সত্যকার সোনা হয়। ইতি।

গুণমুগ্ধ

কাজী নজরুল ইসলাম

J. M. Roy Jwellers
Cornwallis St.
Menetola Spur & Cornwallis St. Crossing

পত্র : ৮

[শ্যামলাল সরকার-কে]

The Navajug
(The united voice of progressive Bengal)
Founded by Hon'ble Mr. A. K. Fazlul Hoq.
Chief Editor
Kazi Nazrul Islam

123, Lower Circular Road
Calcutta
26.2.42

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

সবিনয় নিবেদন, আমি আপনার ১৪/৫ শ্যামবাজার স্ট্রীটস্থ বাড়ির ভাড়াটিয়া। এ বাড়ির আমি মাসিক ষাট টাকা (৬০) ভাড়া দিই। বর্তমান দুরবস্থায় যুদ্ধের জন্য সকলেরই আয় কমে গিয়েছে। কাজেই সকল বাড়ির ভাড়া কমিতেছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই বাড়ির ভাড়া কমাইয়া বাধিত করিবেন। এই দুর্দিনে এত টাকা ভাড়া দিয়া থাকিতে পারিব না। আমার শ্রদ্ধা ও নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—

বিনীত
কাজী নজরুল ইসলাম

To
Sj. Syamlal Sarker
Land Lord
15/4, Syambazar Street, Calcutta.

এখন মহাযুদ্ধের যে অবস্থা তাহাতে বলা দুষ্কর কতদিন এ বাড়িতে থাকিব। যদি বোমার উপদ্রবে পলাইতে না হয়, তাহা হইলে এই বাড়িতেই থাকিব।

ইতি—
কাজী নজরুল ইসলাম

পত্র-পরিচিতি

পত্র : ১

পত্রের প্রাপ্তি-সূত্র : নজরুল জন্ম-জয়ন্তী স্মরণিকা-১৪০০, নজরুল একাডেমী, কুষ্টিয়া। মূলপত্র শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩)-এর পুত্র প্রয়াত এম. আশরাফ-উল হক (১৯০৯-১৯৯৩)-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

১. '[তারিখবিহীন]'—পত্রটিতে নজরুল কোনো তারিখ দেননি। তবে প্রেরক-ডাকঘরের পোস্টমার্ক থেকে তারিখ পাওয়া যায়—২৫ মে ১৯২২। অনুমান করা চলে, এই তারিখে অথবা তার দু-একদিন আগে চিঠিটি লিখিত হতে পারে।

২ 'ডাবজল'—শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হকের পুত্র মোহাম্মদ আফজাল-উল হক (১৮৯১-১৯৭০)। সাময়িকপত্র সম্পাদক, সমাজসেবী, গ্রন্থ-প্রকাশক। কলকাতার বিশিষ্ট গ্রন্থ-বিপণি ও প্রকাশন-সংস্থা মোসলেম পাবলিশিং হাউস-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। 'নওরোজ' (মাসিক) ও 'শিশু-মহল' (মাসিক)-এর সম্পাদক এবং 'মোসলেম ভারত' মাসিকপত্রের প্রকৃত পরিচালক। নজরুলের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক। নজরুল-সম্পাদিত 'ধূমকেতু' (অর্ধ-সাপ্তাহিক) পত্রিকার প্রকাশক ও মুদ্রাকর। আফজাল-উল হকের উদযোগে 'মোসলেম পাবলিশিং হাউস' থেকে নজরুলের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'ব্যথার দান' (১৯২২) প্রকাশিত হয় এবং তাঁর সম্পাদিত-পরিচালিত পত্র-পত্রিকায় নজরুলই ছিলেন প্রধান লেখক। নজরুল তাঁর এই ঘনিষ্ঠ সুহৃদকে রঙ্গ করে 'ডাবজল' বলে সম্বোধন করতেন। অন্য বন্ধুদেরও নজরুল এই ধরনের রসাত্মক নামে সম্ভাষণ করতেন, যেমন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে 'ভো ভো লিভ মশিয়েঁ' এবং কাজী মোতাহার হোসেনকে 'মোতিহার' বলে।

৩. 'মোঃ ভারত'—সাহিত্য-মাসিক 'মোসলেম ভারত'। সম্পাদক হিসেবে শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হকের নাম মুদ্রিত হলেও, এর মূল পরিচালক ছিলেন কবি-পুত্র মোহাম্মদ আফজাল-উল হক। বৈশাখ ১৩২৭ প্রকাশিত এই পত্রিকাটি, 'আঠার মাস' চলেছিল বলে জানা যায় (আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র', ঢাকা, কার্তিক ১৩৭৬ ; পৃ. ২৯২)।

৪. 'মা'র লেখাটা'—প্রমীলা নজরুলের (১৯০৮-১৯৬২) পিতৃব্য-পত্নী বিরজাসুন্দরী দেবীর রচনা-প্রসঙ্গ। নজরুল এঁকে ও মিসেস এম. রহমানকে মাতৃ-সম্বোধন করতেন। হুগলী জেলে এঁর অনুরোধেই অনশন ভঙ্গ করেন নজরুল। 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থটি এঁকে উৎসর্গিত এবং 'ধূমকেতু' পত্রিকার স্বত্বও নজরুল এঁকে লিখে দেন। মূলত নজরুলের উৎসাহ ও আগ্রহে বিরজাসুন্দরীর গদ্য-পদ্য কিছু লেখা 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য পত্রিকা', 'সহচর', 'ধূমকেতু' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়। 'ধূমকেতু' পত্রিকায় 'মায়ের আশীষ'-রূপে

'শ্রীমান কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি' শিরোনামে কবিতায় কবির প্রতি তাঁর স্নেহের পরিচয় মেলে (রফিকুল ইসলাম, 'নজরুল-জীবনী', ঢাকা, মে ১৯৭২ ; পৃ. ১৪৮, ১৬৬, ২৩১, ২৮৮)।

৫. 'রবির ভ্রমর'—নজরুলের কবিতা, 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে কুমিল্লা থেকে প্রেরিত। সম্ভবত প্রকাশনা বন্ধের ফলে এই পত্রিকায় কবিতাটি ছাপা হয়নি। অন্য কোনো পত্রিকায় কিংবা নজরুলের কোনো কাব্যগ্রন্থেও এর প্রকাশের তথ্য মেলে না। আরো বিস্ময়ের কথা, এই নামে নজরুলের কোনো কবিতারই সন্ধান পাওয়া যায়নি। কবিতাটি পরিবর্তিত নামে প্রকাশিত হয়েছে, না হারিয়ে গেছে সে রহস্যও অনুদঘাটিত।

৬. 'ব্যথার দান'—মোসলেম পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত নজরুলের প্রথম গল্পগ্রন্থ (১৯২২)।

পত্র : ২

পত্রের প্রাপ্তি-সূত্র : জসীম উদ্‌দীন, 'ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়', ঢাকা, চ-স, জুলাই ১৯৬৩ ; পৃ. ১২৭। জসীম উদ্‌দীনের স্মৃতিচর্চা থেকে অনুমান করা চলে পত্রটি তাঁর কৈশোর অথবা যৌবনের উন্মেষপর্বে নজরুল তাঁকে উৎসাহদানের জন্যে লেখেন।

১. 'ভাই শিশু কবি'—কবি জসীম উদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬)-কে নজরুলের স্নেহ-সম্ভাষণ।

পত্র : ৩

পত্রের প্রাপ্তি-সূত্র : রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত 'নজরুল-স্মৃতিচারণ' (ঢাকা, জ্যৈষ্ঠ ১৪০২) গ্রন্থে সংকলিত মাহফুজুর রহমান খান-এর কুড়িগ্রামে কবি নজরুল ও নজরুলের সন্নিধানে' শীর্ষক রচনায় পত্রটি উদ্ধৃত (পৃ. ১৮৮)।

১. 'মতিলালদা'—চন্দননগর প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান কর্মাধ্যক্ষ মতিলাল রায় (১৮৮২-১৯৫৯)। বিপ্লবী, সমাজকর্মী, শিক্ষাব্রতী। তাঁর নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক তৎপরতায় প্রবর্তক সঙ্ঘের ব্যাপক প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে। ১৯২৫ সালে সঙ্ঘ-গুরু পদে অধিষ্ঠিত হন। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী প্রমুখের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন। নজরুলের শ্রদ্ধেয় ঘনিষ্ঠজন।

২ 'এরা তিনজন'—মাহফুজুর রহমান খান ও তাঁর দুই সহপাঠী বন্ধু 'আনিস' ও 'কামিনী'।

৩. 'প্রবর্তক সঙ্ঘ'—১৯১৪ সালে মতিলাল রায়ের উদ্যোগে চন্দননগরে প্রতিষ্ঠিত সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। ১৯১৫ সালে সঙ্ঘের মুখপত্র 'প্রবর্তক' পত্রিকার প্রকাশ। বাহ্যত সমাজসেবামূলক ও প্রচ্ছন্নভাবে স্বদেশী ও বিপ্লবী আন্দোলনের সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে অবিভক্ত বাংলায় বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন।

পত্র : ৪

পত্রের প্রাপ্তি-সূত্র : কবিশেখর কালিদাস রায়, 'স্মৃতিকথা', কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪০৩ ; পৃ. ২৫১।

১. '[তারিখবিহীন]'—উদ্ধৃত চিঠিতে তারিখের উল্লেখ নেই। তবে নজরুল 'কৃষ্ণনগরের ঠিকানা' উল্লেখ করায় বলা যায় চিঠিটি ১৯২৬-২৮ সালের মধ্যে লিখিত, কেননা নজরুল এই সময়কালে সপরিবারে কৃষ্ণনগরে ছিলেন।

২. 'কালীদা'—কবিশেখর কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫)। কবি, সমালোচক, শিক্ষাবিদ।

৩. 'সুবোধের'—নজরুলের বন্ধু কবি-সাংবাদিক সুবোধ রায়ের (১৮৯৯-১৯৭১) প্রসঙ্গ।

৪. 'কৃষ্ণনগরের ঠিকানায়'—এই সময়ে নজরুল কৃষ্ণনগরে (১৯২৬-২৮) সপরিবারে বাস করেছিলেন।

৫. 'সীতারাম কুটীর'—কবিশেখর কালিদাস রায়ের কলকাতার ভাড়াটে বাড়ির নাম। ১৯২৫ সাল থেকে তিনি এই গৃহের বাসিন্দা। তাঁর জীবন ও সাহিত্যে বাড়িটির একটি বিশেষ গুরুত্ব ও মূল্য আছে।

পত্র : ৫

পত্রের প্রাপ্তি-সূত্র : 'উপাসনা' (মাসিক), ভাদ্র ১৩৩৮, পৃ. ৩১৬। 'উপাসনা'র এই সংখ্যাতেই 'গান' শিরোনামে নজরুলের দুটি গান ছাপা হয়। তার একটি : 'প্রিয় তুমি কোথায় আজি' (পৃ. ২৬৫-৬৬) এবং অপরটি : 'বিদায় সন্ধ্যা আসিল ঐ' (পৃ. ২৬৬)। সংশ্লিষ্ট ফর্মা ছাপা হয়ে যাওয়ার পর দেখা যায়, 'জয়তী'র সদ্যপ্রকাশিত সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩৩৮) প্রথম গানটি ছাপা হয়েছে। এ বিষয়ে 'উপাসনা'-সম্পাদক নজরুলের কৈফিয়ৎ তলব করায় এই চিঠি। 'সম্পাদকীয়' শিরোনামে মুদ্রিত পত্র সম্পর্কে 'উপাসনা'-সম্পাদকের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য—'বন্ধুবর নজরুল ইসলামের পত্র নিম্নে মুদ্রিত হইল। এ সম্বন্ধে কোনও প্রকার সম্পাদকীয় মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।'

১. 'সাবিত্রী'-সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬৫)। কবি, শিক্ষাবিদ ও সাময়িকপত্রসেবী। 'বিজলী, 'অভ্যুদয়' ও 'উপাসনা' (১৩৩১-৩৯) পত্রিকার সম্পাদক। নজরুলের বিশিষ্ট বন্ধু।

২. 'কিরণ'-কিরণকুমার রায়, 'উপাসনা'র সহ-সম্পাদক।

৩. 'জয়তী'-কবি আবদুল কাদির-সম্পাদিত মাসিক সাহিত্য-পত্রিকা। প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৩৭।

পত্র : ৬

পত্রের প্রাপ্তি-সূত্র : আবুল আহসান চৌধুরী সংকলিত 'নজরুল-এর একটি অপ্রকাশিত চিঠি'। 'শিল্পতরু' (মাসিক), চৈত্র ১৩৯৬/মার্চ ১৯৯০ ; পৃ. ৫৪-৫৮।

১ 'আফজল সাহেব'—মোহাম্মদ আফজাল-উল হক। ১ সংখ্যক পত্রের পরিচিতি দ্রষ্টব্য। লক্ষণীয় যে, অন্য সব চিঠিতে নজরুল আফজাল-উল হককে 'ডারজল' নামে সম্বোধন করলেও এখানে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। উপকার প্রত্যাশী ছাত্রটির হাতেই নজরুল পত্রটি পাঠিয়েছিলেন বলে সম্বোধনে সম্ভ্রম রক্ষা করেছেন। রসিক নজরুলের প্রবল কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় মেলে এখানে।

২ 'মিনিস্টার সাহেব'—আফজাল-উল হকের পিতৃব্য-পুত্র স্যার মোহাম্মদ আজিজুল হক (১৮৯২-১৯৪৭)। প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী ও লেখক ইনি সেই সময়ে বাংলা সরকারের শিক্ষামন্ত্রী (১৯৩৪-৩৭) ছিলেন। নজরুল একেই অনুরোধ করার জন্যে বলেছেন।

৩ ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের ইঙ্গিত। নজরুল-জীবনপঞ্জি থেকে জানা যায়, এই বছরেই (১৯৩৪) তিনি গ্রামোফোন যন্ত্র ও রেকর্ড বিক্রির দোকান 'কলগীতি' স্থাপন করেন। এই সময়ে গ্রামোফোন কোম্পানিতেও প্রশিক্ষকের কাজ করছেন, দিনরাত চলছে গান রচনা, সুরারোপ, শিল্পীকে গান শিখিয়ে দেয়া ও রেকর্ডে গান ধারণ করা। এ-সব কারণেই মূলত নজরুলের ব্যস্ততা, নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর নেই তাঁর—প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে না পারার জন্যে তাই মার্জনা চাইতে হয় তাঁকে।

পত্র : ৭

পত্রের প্রাপ্তি-সূত্র : অপ্রকাশিত পত্র। অনুলিপি কবি আবদুল কাদিরের পুত্র অধ্যাপক সিকান্দার দারা শিকোহ্-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

১ মিঃ রায়—কলকাতার ঐতিহ্যবাহী স্বর্ণালঙ্কারের প্রতিষ্ঠান জে. এম. রায় জুয়েলার্স-এর স্বত্বাধিকারী।

২ 'কবি আবদুল কাদির' (১৯০৬-১৯৮৪)-কবি, ছান্দসিক, প্রাবন্ধিক, গবেষক, সাময়িকপত্র-সম্পাদক। 'জয়তী' (১৩৩৭) ও 'মাহেনও' (১৯৫২-৬৪) পত্রিকার সম্পাদক। নজরুলের বিশেষ স্নেহভাজন ও অনুরাগী ঘনিষ্ঠজন। উত্তরকালে নজরুল-রচনা সংকলন-সম্পাদনা ও নজরুলচর্চায় পথিকৃতের ভূমিকা পালন।

পত্র : ৮

পত্রের প্রাপ্তি-সূত্র : কল্পতরু সেনগুপ্ত, 'জনগণের কবি কাজী নজরুল ইসলাম', কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯২ ; পৃ. ১৮৩-৮৪।

১ 'এখন মহাযুদ্ধের যে অবস্থা'—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) মধ্য-পর্বে কলকাতায় জাপানি বোমা হামলার ফলে নগরবাসীর আতঙ্ক ও কলকাতা-ত্যাগের প্রসঙ্গ এখানে বর্ণিত হয়েছে।

২ 'এই বাড়িতেই থাকব'—নজরুলের এই অনুরোধ উপেক্ষিত হয়। এ-প্রসঙ্গে কল্পতরু সেনগুপ্ত মন্তব্য করেছেন, 'বাড়িওয়ালা কবির চিঠির মর্যাদা দেননি, তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেননি। উপরন্তু কবি অসুস্থ হবার পর ভাড়া বাকি পড়ে গেলে বাকি ভাড়ার দায়ে মামলা করে কবি-পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল।' (ঐ ; পৃ. ১৮৪)।

[ডঃ আবুল আহসান চৌধুরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

সংযোজন

নওরোজ পত্রিকার সম্পাদককে লেখা নজরুলের চিঠি

আপনাদের নওরোজের আনন্দ উৎসবে আমার আমন্ত্রণ আমি সাদরে গ্রহণ করিলাম। এই নওরোজের চাঁদের হাটে বিকিকিনি করিবার মত সম্বল সম্পদ হয়তো আমার নাই। আমি শুধু দিবা রাত্রি ধরিয়া আপনাদের তোরণদ্বারে বাঁশী বাজাইতে পারি, গানে গানে প্রাণের কান্না হাসি গাঁথিয়া যাইতে পারি, আমায় শুধু এই সহজ ভারটুকু দিন। ঘা দিয়া দ্বার খুলিতে যদি নাই পারি, গান দিয়া দ্বার খুলিবার সুন্দর সাধনা আমার হউক। আমায় আপনারা বাঁধিতে চাহিয়াছেন আপনাদের আনন্দ রাখী দিয়া। আপনাদের বন্ধন স্বীকার করিলাম। আপনাদের গ্রহণ করিলাম। আমার সকল শক্তি, সাধনা সঙ্গীত আপনাদের হউক। এর অধিক বোধ হয় বলিবার দরকার হইবে না।

আমার সহযাত্রী তরুণ যাত্রিকদল আপনাদের যাত্রা পথের সহায় হইবে ; আপনাদের অভিনব উৎসব মহফিল মাতাইয়া তুলিবে। আমি তাহাদের আহ্বান করিতেছি। আপনারা জয়যুক্ত হউন।

['*গণবাণী*', ২৭শে মে ১৯২৭]

বিবৃতি

'নিখিল বঙ্গীয় তরুণ মুসলিম সমিতি'র (All Bengal Muslim Youngmen's Association) কার্য্যকরী সভা আমায় উক্ত সভার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ইহাও শুনিতেছি যে, কোন কোন যুবক নাকি আমার ও সমিতির নাম করিয়া চাঁদাও আদায় করিতেছেন। আমি এ সম্পর্কে কিছু জানিনা কাহাকেও অর্থ সংগ্রহের আদেশ বা উপদেশ দিই নাই। আমি সম্পাদকের পদও গ্রহণ করি নাই। নানান কারণে বর্তমানে উক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে আমি অক্ষম। ইতি—

নজরুল ইসলাম

['*সত্যগ্রহী*, ৯ চৈত্র ১৩৩৩, পৃ. ৫৫০]

['নজরুলের অগ্রথিত রচনা ও অন্যান্য', লায়লা জামান, অধ্যাপক ভূঁইয়া ইকবালের সৌজন্যে প্রাপ্ত]

কানার বোঝা কুঁজোর ঘাড়ে

যে কাপুরুষ সেই শুধু নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপায়। নিজের দুর্বলতার দরুন সবলের জবরদস্তিকে 'অন্যায় অন্যায়' বলে কান্নাকাটি করা একটা 'ট্রেডমার্কা' মেয়েলি ঢং। যাকে অন্যায় বলে মনে করো, বুক ফুলিয়ে তাকে অন্যায় বলো, দেখবে—অন্যায়ের মুখ কালো হয়ে যাবে। যাকে অন্যায় মনে করো, তাকে বিনাশের জন্যে তোমার বজ্র-আঘাত অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করো, দেখবে—অন্যায় আপনি 'গায়েব' হয়ে গেছে। অন্যায় যদি তোমার বিষম আপত্তি সত্ত্বেও তোমার নাকের ডগায় ধেই ধেই করে নাচে আর কলা দেখায়, তাহলে বুঝতে হবে যে অন্যায়-বাঁদর তোমার 'মুরোদ' যে কতটুকু তা বেশ জেনে নিয়েছে। তুমি যে তার কচুও করতে পারবে না, তা জেনেই সে তোমার মুখের সামনে অমন করে 'চাটু' নাড়ছে। মাজা-ভাঙা রগ-ঢিলে তুমি একজন ডাকাত-বুকোদের হাত থেকে তোমার চোরাই মাল ফিরিয়ে পেতে চাইলে আগে তাকে ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করবার পাঁয়তারা ভাঁজা আর কায়দা-কানুন শিখতে হবে। তা নাহলে দাদা ও-কান্নাকাটিতে ব্যাটাছেলের মন ভিজবে না। দাঁও কসো, প্যাঁচের মতো প্যাঁচ দিয়ে ডাকাত বাছাধনকে যদি একবার ধরা-সই করতে পার, তাহলে সে বাপ বাপ বলে তোমার চিজ তোমায় ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু ওই পিলু বারোয়াঁয় 'প্রাণ আর বাঁচে কেমনে' করে কাঁদলে আরও তাল-ধুমাধুম পড়বে তোমার জুতোর আলপনা-আঁকা পিঠে মুখে।

তোমরা চাচ্ছ স্বরাজ, অর্থাৎ স্বাধীনতা। অর্থাৎ কিনা বাংলা করে বলতে গেলে বোঝায়, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুদের ও-ই সাত-সমুদ্দুর তেরো নদী পার করে তেপান্তরের মাঠে খেদিয়ে থুয়ে আসা ! কথাটা শুনতে খুব মিষ্টি—এতই মিষ্টি যে, ও-কথাটা কেউ পাকে-প্রকারে বললেও অমনি খুশিতে বাগেবাগ হয়ে 'কাছা খুলে বাহু তুলে' উতরিঙ্গে-নাচ শুরু করে দিই, আর যে-সে কথা বলে তাকে তো ড্যাং-তুলো করে কাঁধে না তুলে ছেড়েং-ডেড়েং ডেড়েং-ডেড়েং করে বোধনের বাজনা বাজিয়ে দিই যে, ভগবান এসেছেন। কিন্তু সেই ভগবান যখন বলেন যে, দেশের পায়ে তোমাদের স্বার্থকে বলিদান দাও, অমনি তোমাদের বলকে-ওঠা ভক্তি-দুগ্ধ ছিঁড়ে এমনই টকো দই হয়ে ওঠে যে, কার বাবার সাধ্যি তা জিভে ঠেকায় ! এই ভাবের কুলকুচি দিয়ে ভূত ভাগাবে মনে করছ, কিন্তু যেই ভূত দাঁত খিঁচিয়ে নখ উঁচিয়ে একটু আঁচড়-কামড় বা গতিক বুঝে গোটা দুচ্চার কিল কসিয়ে দেবে, অমনি তোমরা মায়ের আঁচল-ঝাঁপা ছেলে মায়ের আঁচল আড়ে লম্বা দেবে আর বলবে, ভয়ানক অন্যায় ! এমন করে পরের তাতে বেগুন পোড়ানোটা ধর্মে সইবে না। কিন্তু ধর্মে যখন সইছেই, তখন বলতে হবে বইকী, যে, জবরদস্তির ধর্মের এমন একটা আবরণ আছে যা কোনো দেবতার অভিশাপই ভেদ করতে পারে না।

এর মানে কী, জানো? যে ধর্ম মানুষকে এত অধার্মিক করে, এত পায়ের তলায় এনে ফেলে, সে ধর্ম–বালখিল্যের ভিতর অনেক কিছু গলদ আছে। সিংহের চামড়ার ভিতরে গাধা লুকিয়ে আছে। দোষ আমাদের। আমরা ধর্ম ধর্ম যতই করি, ধর্ম আমাদের নেই। ধর্ম–পূজারি হচ্ছে সত্যের পূজারি, সত্যের পূজারি কখনো কাপুরুষ হয় না। অন্তরে এত অধর্মের আখড়াই আর বাইরে ধর্মের ফুটো ডুগডুগি পিটুলে কি কেউ ভয় পায় দাদা? 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' কথাটা মান্ধাতার আমলের পুরোনো হলেও বেজায় সত্যি। ইংরেজ এদেশ অধিকার করে আছে কেন, ছেড়ে চলে যাচ্ছে না কেন বলে মাথা খুঁড়লে চুল ছিঁড়লে ইংরাজ–রাজ অনুতপ্ত হয়ে তোমাদের হাতে ভারত ছেড়ে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করবে না। ওরা বীরের জাত, ওদের কাজ–কর্ম সব মর্দা রকমের। তোমাদের এই চিঁচিঁ শব্দের কাতুকুতু–খোঁচানিতে তারা তোমাদের আরও কষে দাববে। তেরিয়া হয়েছ কি সোজা প্রক্রিয়া – 'দে ধনাধ্বন মার ধনাধ্বন।' এই ধনঞ্জয়ের জোরেই ব্যাটা ছেলে তারা তোমাদের তুলোধুনো করে ছেড়ে দিচ্ছে। ওদের দোষ দিচ্ছি, কিন্তু আমরাই যদি ওদের বিলেতে গিয়ে রাজা হয়ে বসতুম, আর বিলিতি লোকগুলো আমাদের কাছে এইরকম আবদার করত, তাহলে আমরা তাদের প্রত্যেককে ধরে ধরে দুগ্গা বলে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিতুম। আণ্ডা বাচ্চা কাউকে ছাড়তাম না। তা তোমরা যতই কেন প্রেমের পাগল–ঝোরার দেশের লোক হও। তোমরা যে কত বড়ো কসাই–এর জাত, তা তোমাদের জমিদার আর বড়োলোকদের দিকে চেয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে। তোমাদের যদি সত্যিই কিছু করবার শক্তি থাকত, তাহলে কাঁদুনি না গেয়ে যা করবার তা সোজা করে যেতে। একটি কথাও কইতে না। ব্যাটাছেলেকে ব্যাটাছেলের মতো বুক ঠুকে যদি 'চ্যালেঞ্জ' করতে, তাহলে তোমাদের স্বরাজলাভের আশা থাকলেও থাকতে পারত। আর এতে হারলেও তোমাদের অপমান হতো না। বীরের কাছে বীরের পরাজয় সম্মানের। আলেকজান্ডার আর পুরু রাজার কথাটা মনে করে দেখো। তারা দেশ জয় করেছে, তা যে করেই হোক। এত বড়ো পৃথিবীর সেরা দেশ, তা কিনা চোখ–রাঙানি দেখে ছেড়ে দেবে! এ কি ছেলের হাতে মোয়া পেয়েছে? সকলের আগে এইবার মেয়েলি ঢং মাদিপনা ছেড়ে ব্যাটাছেলে হও, – আসে অহংকার আসুক, আসুক দম্ভ, আসুক গর্ব, তবু আর এসব কাতুকুতুভাব সহ্য হয় না। চুলোয় যাক তোমার বিনয়, পায়ে মাড়িয়ে যাও লোক–দেখানো ভদ্রতা, আমার ঝ্যাঁটা তোমার ওই সখি–ধরো–ধরো ভাবের ওপর, তুমি ব্যাটাছেলে হও, মর্দ–পুরুষ হও।

'গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা পুরুষ হ!'

এমন করে নিজের ক্লীবতার জন্যে অন্যকে দোষ দিয়ো না। ভগবান আমাদের দেশকে এই মেয়েলি মায়ার জাদু হতে মুক্ত করুন।

[‘ধূমকেতু’, ১ম, ২য় সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৩০শে শ্রাবণ ১৩২৯]

দেয়ালি-উৎসব

আজ বাঙালির ঘরে ঘরে দেয়ালি উৎসবের আগুন লেগেছে, শব্দ-বিদারণের ধুম পড়ে গেছে। বুঝি মরা গাঙে জোয়ার এসেছে, মরা বাঙালির বুকে আগুন-খেলার পুলক ঝলক দিয়ে উঠেছে। কিন্তু হায়, এ দেখে আনন্দ যত না হচ্ছে তার চেয়ে কষ্টই হচ্ছে বেশি।

মুসলমানের মোহররমের লাঠি খেলার মতোই এ দেয়ালি উৎসবেরও আগুন আর বোমাও আজ শুধু অভিনয় মাত্র। আজ যারা আগুন নিয়ে খেলার অভিনয় করছে, কাল তারা সত্য আগুন দেখে আর্তনাদ করে উঠবে, আজ যারা বোমার নিষ্ফল শব্দ করে আস্ফালন করছে, কাল সত্যকার বোমার বিদারণ দেখে তারা মূর্ছিত হয়ে পড়বে। আজ দেশের বাইরে ভিতরে চলেছে এই অভিনয়—শুধু অভিনয়, শুধু কৃত্রিমতা, শুধু মিথ্যা। তারা মিথ্যা নিয়ে আস্ফালন আনন্দ করতে চায়। সত্যে আঘাত আছে, সত্য খেলায় হাত পা ভাঙবার ভয় আছে, সত্যকে জানতে হলে, জাগাতে হলে বিদ্রোহ করতে হবে। অতএব তারা ওপথে যাবে না।

এ তোমার শক্তিপূজা নয় বাঙালি, এ তোমার মিথ্যাপূজা, শক্তির অপমান। যে দেবীর পূজায় আজ এই দেয়ালি উৎসব করছ, সে বেটি সত্য আগুন জ্বালিয়েছিল অত্যাচারী অসুরের রাজ্যে। তার ভূত-প্রেত-বিক্ষিপ্ত অগ্নি-গোলায় উৎপীড়কের প্রাসাদ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

পারো তো তেমনি করে এসো বাঙালি ওই করালি কালি বেটির মতো অন্ধকারের চেয়েও ভীষণ কালো রূপ নিয়ে, যেন সে কালরূপ দেখে মহাকালও ভয় পায়। পারো তো সেই অগ্নি-গোলা আনো যা অত্যাচারীর অর্থ পিশাচের প্রাসাদ-শিলে বাজের মতো গিয়ে পড়ে তা চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে, পারো তো সেই বোমা-বিদারণ আনো, যার শব্দে শ্মশান ছেড়ে শ্মশানচারিণী বেটি তোদের ঘরে ঘরে এসে ধ্বংস-নৃত্য নাচবে, মা-রা আর্তনাদ করে উঠবে, বীরজায়াদের নয়ন দিয়ে অগ্নি-অশ্রুর পুলক-বিভা বিচ্ছুরিত হবে, বোনেদের বুকে ব্যথা-গরবের তুফান তুলবে।

কবে সে-দেয়ালি-উৎসব লাগবে বাঙালি, কবে তোমার ঘরে সে-আগুন লাগবে, যখন কোটি ফায়ার ব্রিগেড ভয়ে বিস্ময়ে মূক স্তব্ধ হয়ে যাবে। সূর্যের আলো সে অগ্নি-শিখায় পুড়ে তাম্রবর্ণ হয়ে উঠবে। সে-আগুনে পুড়ে মরবার ভয়ে অত্যাচারীর দল মহাসিন্ধুর জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে ! জন্ম জন্ম ধরে এই ভণ্ডামি করে আসছ তাই শক্তি বেটিও এল না ঘরে। তোমাদের ফাঁকির পূজা তোমরাই যে মনে মনে বোঝো, আর ও দেবী বেটি বোঝে না মনে করো?

দেয়ালি-উৎসব একবার করেছিল বাঙালি ১৯০৫ সালে। সেইদিন তোমার আলো-জ্বালা বোমা-বিদারণ সার্থক হয়েছিল। চণ্ডী বেটিও আসবার জোগাড় করেছিল। কিন্তু ভালো করে আগুন জ্বালাতে পারলে না, অসুর এসে সে-অগ্নি গ্রাস করে ফেললে।

পার তো তেমনি করে আর একবার দেয়ালি-উৎসব করো। সে-উৎসব যারা করে তারাও অমর হয়, যারা দেখে তারাও বড়ো হয়।

ওগো বাঙালি! ওগো ভারতের আগুনের দেবতা! ওগো বিদারণের মহাপ্রলয়! তোমরা তোমাদের বিস্মৃত মূর্তিকে আজ মনে করো, এই দেয়ালির রক্ত-আলো আর বোমা-বিদারণের মধ্যে।

[‘ধূমকেতু’, প্রথম বর্ষ, ১৫শ সংখ্যা, শুক্রবার, ৩রা কার্তিক ১৩২৯]

ভাইয়ের ডাক

এসো অমৃতের নন্দন ও নন্দিনীগণ, তোমাদের নিষ্পাপ দেহ-মন লয়ে। এসো বেহেস্তের ফেরিস্তা, এসো নিষ্কলঙ্ক নিখুঁত মানুষ ; এসো চিরসন্তুষ্ট নবীন সন্ন্যাসী, ফকিরদের দল। এসো সত্যাশ্রয়ী অজেয় বীরবালক ও বীরবালাগণ, দেশ-মায়ের প্রাসাদ রচনায় চলে এসো। এসো চির-নির্যাতিত, চির-অবজ্ঞাত, এসো বীর, এসো ধীর, উন্নত মস্তকে এসো। এসো পুরোহিত সত্যের জয়মন্ত্র পড়তে পড়তে, এসো ব্রাহ্মণ নতুন করে—ব্যক্তিগত বর্ণাশ্রমের অধিকার ব্যবস্থা নিয়ে। এসো ক্ষত্রিয়, এ দারুণ বন্ধন ক্ষতি ছিঁড়ে দিতে। এসো ভাই মুসলমান তোমার সাদি হাফেজের প্রেম ও মোগল পাঠানের বীরত্ব নিয়ে। এসো কর্মকার, সূত্রধর, নবশাখার তোমাদের নব নব শাখার শিল্পসম্ভারে দীনা জননীকে সাজাতে। এসো মালি মায়ের পুষ্পবাটিকায়, এসো কুম্ভকার মঙ্গলঘট হাতে। এসো হিন্দু মোসলমান তন্তুবায় হস্তনির্মিত বিশুদ্ধ পট্টবস্ত্রে দেশজননির বরাঙ্গ সাজাতে। এসো প্রামাণিক জননীর অঙ্গ সেবায়, এসো নমঃশূদ্র কাপালিক তোমার লোহার মতো হাতের গুলের জোরে ধানের মাড়াই মাথায় করে, এসো চর্মকার তোমার শিল্পসম্ভার নিয়ে, এসো পারিয়া, পিয়ারা ভাই আমার। এসো মেহতর ঝাড়ু হাতে মায়ের অঙ্গন পবিত্র করতে আর কেমন করে দীন হলে সেবাধিকার পাওয়া যায় তা শিক্ষা দিতে। এসো তরুণ, প্রেমারুণ আঁখি নিয়ে আলগা বুকে দুবাহু বিস্তৃত করে। এসো বিশ্ব মায়ের নন্দন শক্তিশালী শাক্ত, এসো খ্রিস্টান মেরি খ্রিস্টের ভক্ত। এসো সৈয়দ, পাঠান, মোগল ; এসো বৈষ্ণব, কৃষ্ণ প্রেমে পাগল। এসো শেঠ নিয়ে মায়ের ভেট। এসো জমিদার মহাপ্রাণ উদার, হাজার তোমার প্রজার ভক্তি অর্ঘ্য নিতে, এসো আইনজীবী দাসত্বের আইন ব্যবসার বদলে দেশ সংগঠনের পুথিপত্র নিয়ে, এসো শিক্ষক মুক্ত মানুষ গড়তে, এসো ছাত্র বাপ-মায়ের আশীর্বাদ বিজয়তিলক ধারণ করে। এসো ব্রহ্মচর্যদীপ্তিমণ্ডিত মুখমণ্ডল অনাঘ্রাত প্রফুল্লকমল ভাই সব আমার, হাতুড়ি বাটাল, কুড়ুল কোদাল, কাস্তে বইঠে হাল দাঁড় ঘাড়ে, কাঁটা কম্পাস যন্ত্রপাতি হাতে। এসো নন্দিনী সুরবন্দিনী ভগিনীকুল, এসো জননী জগবন্দিনী স্নেহে অতুল।

সব শেষে আয় কে কোথা আছিস মুক্ত খ্যাপা মেয়ের দল, আর আয়রে আমার হতভাগা, গেহহীন, স্নেহহীন, বাজের দেহে আগুনের চোখ জ্বালিয়ে শত স্নেহের আঙুরের বাক্স থেকে হেঁটে তুলো উপরে তুলো ঝেড়ে ফেলে ছেঁড়া ন্যাকড়ায় কৌপীন এঁটে শত অপরাধ, হাজার রোষ, লক্ষ গাল, কোটি প্রহার, অর্বুদ অপমান খেতে, পথহারা,

গতিহারা, আপনজনহারা, দুনিয়া আপনকরা মুক্ত খ্যাপার দল আয়। তোদের কী কী দেবো জানিস—অনাহার, অনিদ্রা, নিরন্তর পরিশ্রম, দীর্ঘ পর্যটন, গালি, অপমান, মিথ্যা কলঙ্ক, মনোভঙ্গ ও মৃত্যু। আর সর্বশেষে কী দেবো তাও শুনিসনি হতভাগার দল! দেশসেবার গৌরবজনক অধিকার।

তোদের পাঁজরের উপর ভবিষ্যৎ ভারতের, শুধু ভারতের কেন, সারা বিশ্বের মুক্তিসৌধ গড়তে হবে। আয় দধীচির মতো কে আগে আপন হাড় কখানা দান করবি। আয় চতুঃসীমার গণ্ডিদেওয়া মাটি পাথরের দেয়ালের বাইরে, মুক্তির পবন-হিল্লোল মাঝে ঘাসের গালচের উপর অশ্বত্থাবাসে। আয় বিসূচিকা, বসন্তপীড়িতের পাশে। আয় বলদেব সুবিশাল হলস্কন্ধে, আয়রে মরণ বরণ করে নিত্যি নবীন ছন্দে। তোদের নাম সকলেই ভুলে যাবে। তোদের বাপ-মা, ভাই-বন্ধু, ছেলে-মেয়ে, গুরু-শিষ্য, ইটে-ভিটে, চাল-চুলো, ঢেঁকি-কুলো কিছু নেই; তোদের আদি নেই, অন্ত নেই। আর ছন্দছাড়া, লক্ষ্মীছাড়ার দল, লাগারে চাঁদের বাজার তোরা একাই হাজার। সকল চিন্তা সকল আশা-ভরসাহীন, পাগল হয়ে দুনিয়া ভুলে কে আসবি মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়।

ওরে মায়ের ভায়ের এ ডাক শুনে বধির থাকিসনে। এ কাঁদা-চোখের ওপর থেকে শুকনো চোখ ফিরিয়ে নিয়ে যাসনে, যতদিন তোরা সকলে এসে মায়ের দোরে না দাঁড়াবি ততদিন ধরে এক একটা করে গোনা যে কটা আছে, নিরাশা, অনাহার অনিদ্রায় মরণ বরণ করতে হবে। তাতে যে তোদেরই বুক ভেঙে যাবে ভাই! এ ক্ষীণ কণ্ঠে এত শক্তি নেই যে ডাকার মতো করে ডাকি। তোরা, ওরে তোরা, শুধু একবার শোনবার মতো করে কান পেতে শোন। আর দুর্বল ভাইদের বল দেবার জন্যে এগিয়ে আয়, ওরে আয়, ওরে আয়।

['ধূমকেতু', ১ম বর্ষ, ২২শ সংখ্যা, শুক্রবার, ১লা অগ্রহায়ণ ১৩২৯]

বঙ্কিমচন্দ্র

রবীন্দ্রনাথ যদি আমাদের ভারতের দুর্ভাগ্য তিমির-ঘেরা গগনের রবি হন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহলে সেই তিমির রাত্রি প্রভাতের পূর্বাশা, সেই রবির অগ্রগামী উদয় তারা। আজ বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি যেসব প্রতিভার বর-পুত্রের আবির্ভাব হয়েছে—বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের আদি স্রষ্টা বললে অত্যুক্তি হবে না—এইসব জ্যোতিষ্কের সৃষ্টির বীজ তাতেই লুকিয়ে ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পরবর্তী সমস্ত কবি-সাহিত্যিকের পিতামহ-ব্রহ্মা।

কেরোসিনের ডিবের আলোকে যারা মানুষ, বিজলিবাতির অতি দীপ্তি যেমন তাদের চক্ষুপীড়ার কারণ হয়, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যোতির্ময় প্রতিভা তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যিকদের চোখ ঝলসে দিয়েছিল—তাই তারা তাঁকে সসম্মানে গ্রহণ করার বদলে অভিসম্পাত বেশি করেছিলেন। সে সময় বাংলা ভাষাকে সাহিত্যক্ষেত্রে আসতে হলে সংস্কৃতের...টিকি, বিসর্গের চন্দন-ফোঁটা এবং যুক্তাক্ষরের নামাবলি পরে আসতে হতো। সে ভাষার যে রূপ, বাইরে তাকে ব্রাহ্মণ বলে মনে হলেও, সে ছিল রসহীন রূপহীন অসংস্কৃত ... তাকে বাংলা বলে বাঙালির ... বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম বাংলার বাণীমন্দির থেকে এই পাণ্ডাদের বিতাড়িত করেন। খড়্গ-হস্ত গুম্ফ-শ্মশ্রু কর্কশ বাংলা ভাষা এরই প্রসাদে বেণু বীণা ও পূর্ণশ্রীর প্রথম প্রসাদ পেল। ইনিই সংস্কৃত জহ্নুর জঙ্ঘা থেকে বাংলা ভাষার রস-গঙ্গা রূপকে উদ্ধার করেন। বাংলা তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। শ্রীসরস্বতীর অধিপতি এঁরই সাধনার ঠুঁঠা জগন্নাথ রূপের মুখোশ খুলে পূর্ণ সুন্দর প্রেম-ঘন রস-ঘন আনন্দ-ঘন পূর্ণ রূপশ্রী লাবণ্য মাধুরী নিয়ে ষড়ৈশ্বর্য-বিভূষিত শ্রীনারায়ণ রূপে দেখা দেন।

অবশ্য, এর আগে যে সব বৈষ্ণব কবি পদাবলি রচনা করে গিয়েছিলেন তা আনন্দ বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত নবীন মদন চির-কিশোর পূর্ণ প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের রূপই প্রকাশ করেছে। এর অধিকারী ছিলেন কেবল তাঁরা—যাঁরা নিত্যধামের আনন্দ তীর্থ-পথিক। যাঁদের এ পরম তৃষ্ণা আসেনি, তাঁরা এই অমৃতকে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁরা চেয়েছিলেন, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারে সে সত্য-মিথ্যা আলো অন্ধকারের খেলা এই জীবজগতে তাঁরই রূপ দেখতে। কিশোর হরির সেই সর্বৈশ্বর্যময় রূপকে সাহিত্যে প্রকট করলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমে ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন, বঙ্কিমচন্দ্র বদ্ধ জীবকে তার বন্ধন অবস্থাতেই হাসালেন, কাঁদালেন, তাদের অন্তরের স্বরূপ, বাইরের স্বরূপ নিখুঁত করে এঁকে দেখালেন। বঙ্কিমচন্দ্র এইখানেই মুণি-ঋষি। যে পুকুরের জলের সাগরের দিকে টান

নেই, সেখানে আনন্দের পদ্ম-শালুক ফুটালেন—তার চারধারের বাঁধ ভাঙবার শক্তি ও তৃষ্ণা জাগালেন।

তাঁর এই বিপুল শক্তির প্রাচুর্যই 'বন্দেমাতরম' গানের বাণীতে প্রকাশ লাভ করল। যে সপ্তকোটি বাঙালিকে মহাভারতের অগ্রদূত বলে স্বপ্ন দেখেছিলেন এই গানের মন্ত্রশক্তি তা সারা ভারতে প্রাণ সঞ্চার করল। অনেক বিষয়ে তাঁর সাথে অনেকের মতভেদ থাকলেও এ কথা আজ অস্বীকার করতে পারবে না বাঙালির ঘুমন্ত বদ্ধ মনকে তিনি আচমকা ভূমিকম্পের মতো এসে প্রবল বেগে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছিলেন।

আজ ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতাদেরও তিনি গুরু বললে অত্যুক্তি হবে না। নেতারা কর্মী ... কিন্তু হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিল। রসহীন শ্রান্ত জীবনে শিক্ষিত বাঙালি নূতন রস আনন্দ পেয়েছিল। সাহিত্য কাব্য প্রভৃতি সকল সুকুমার শিল্পই বিলাসী মনের খাদ্য, কর্মক্লান্ত মনকে আনন্দ দিয়ে তাজা রাখে এই আনন্দ-রস। জীবনে এর বিশেষ প্রয়োজন আছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই রস-বিলাসেই মত্ত থাকেননি, শক্তিহীন জাতিকে শক্তি দিয়েছিলেন, গুরুর মতো তাদের ত্যাগের পথে বৈরাগ্যের পথে মুক্তির পথে নিয়ে যাওয়ার প্রবল প্রচেষ্টা নিয়ে এসেছিলেন।

তাঁর আশেপাশে তাঁরই আত্মীয় অনাত্মীয় রূপে যারা ঘিরে ছিল তাদের পূর্ণ স্বরূপ তাঁর মনের স্বচ্ছ মুকুরে প্রতিভাত হয়েছিল—তারই রূপ তাঁর উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। শুধু তাদের বাইরের রূপে নয়, মনের আত্মার বেদনা ক্রন্দন তিনি দেখেছিলেন, শুনেছিলেন। তাই তাঁর উপন্যাস কখনো পুরোনো হলো না, হবে না। আজও তাঁর 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'কপালকুণ্ডলা', 'দেবী চৌধুরাণী', 'বিষবৃক্ষ' বাঙালির নিকট পুরোনো হলো না। যত পড়ি, ততই রস পাওয়া যায়।

এইখানে হয়তো তিনি বাংলার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। আধুনিক সাহিত্যিকরা যেখানে কেবল বুদ্ধির চাতুর্য, লিখন-ভঙ্গির অপূর্বতায় কেবল জ্ঞানকে মুগ্ধ করেন, হৃদয় স্পর্শ করতে পারেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় সে জ্ঞানশক্তি নিত্য রসায়িত। তিনি মানুষের সেই অন্তরতম কোণে গিয়ে খেলা করেছেন—সেখানে প্রেম ছাড়া জ্ঞান কখনও যেতে পারে না। জ্ঞানকে মাথায় রাখি, প্রেমিককে রাখি বুকে, তাঁকে বাঙালি মাথায় না রেখে বুকে রেখেছেন—সেইখানে তাঁর আসন নিত্য।

সৈনিকের পথ

লক্ষ লক্ষ বিশৃঙ্খল যোদ্ধার বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সৈন্য অগ্রসর হয়, সংযত এবং শিক্ষিত সৈন্যেরাই যুদ্ধ (জয়) করে আর সংখ্যায় অধিক হলেও (শিক্ষা)বিহীন সৈন্যদল পরাভূত হয়। শিক্ষিত সৈন্যদলের প্রত্যেকেই যে তার কাজটুকু করে মরণ তার (...) এবং সেই পর্যন্ত তার স্থানটুকু (...) করাই তার কাজ। তার পরে কী (হবে) সে ভাবনা তার নেই—তার শুধু (ভাবনা), বেঁচেই হোক আর মরেই হোক (...) কাজটুকু করতে হবে।

(...) সমাজ কিন্তু আমরা অনেকই স্থান (...) দিয়েছি—আমরা একটু যেতে না (যেতেই) পথের দূরত্বের কথা ভাবতে শুরু (করেছি)। আমরা একটু না এগুতেই (জিজ্ঞেস) কচ্ছি 'পথ কোথায়'?

তারা তো তা করেনি, তারা তো কই এত ভাবেনি। দুপুর রাতে বাড়ি ফিরে এলে তাদের বাপ মা ভয়ে শিউরে উঠত, প্রিয়তম বন্ধু তাদের দূর দূর করে দিত। দিন নেই, রাত নেই, তারা তো শুধু চলেই ছিল, দুর্গম পথ অতিক্রম করে ক্রমে চলেই ছিল, দেশের ভয়ে কেউবা দেশ ছাড়া হল—আজও কোন সুদূর প্রান্তরে সঙ্গীহীন হয়ে তারা বুঝি চলেই যাচ্ছে। তোমরা কত সহস্র সহস্র গেলে আর এলে, তারা তো আর এলো না। সেই অন্ধকার ঘরে শত্রুপুরিতে কে না খেয়ে মরে গেল তার খবর তো তোমরা রাখ না। তারা যে যৌবনে জরাগ্রস্ত হয়ে তিল তিল করে মরণের দিকে চলেছে তা তো তোমরা ভাব না। একদিন নয় দুইদিন নয়, বছরের পর বছর তারা ক্ষুদ্র অন্ধকার ঘরে দিনগুলি বুঝি কাটাচ্ছে। কতদিন হাতকড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেও শাস্তার মনে তৃপ্তি হয়নি। তাদের হাত কেটে টপ টপ করে রক্ত বেরিয়ে আসত তবুও তাদের চোখ ফেটে কই জল তো বেরুত না—কেউ আপশোশের শ্বাস শুনতে পেত না। তাদের স্থিরতা দেখে মদমত্ত পশুও স্তম্ভিত হয়ে যেত। ওরে আমার বাংলার ছেলে, পথ চলতে যদি চঞ্চল হয়ে উঠিস, তা হলে একবার তাদের কথা ভেবে নিস, ছিল চারদিকে অন্ধকার সেই অন্ধকারে সঙ্গীহীন হয়ে তারা ধীর চিত্তে মরণের পথে চলত। ওরে পথিক, পথের ভাবনা করা তোর চলবে না। তুই শুধু এগিয়ে চল। সেই গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়াদের মতো এগিয়ে চল। আজ যে ব্যথা-ব্যথী করুণ কণ্ঠে তাঁর দুঃখ জাগিয়ে তোদের প্রাণে অলসতা আর অবসাদ এনে দিচ্ছে, তার দিকে ভাঙা বুকখানি ফিরিয়ে দিয়ে বল, 'ওগো করুণাময়, তুমি তোমার আরামের বোঝা নিয়ে ঘরে ফিরে যাও! আমার ভবিষ্যত নেই—আমার আশা নেই—আমার ভয় নেই। দারিদ্র্য আমার বন্ধু—দীর্ঘশ্বাস আমার পুরস্কার! অন্ধকার আমার পথ, মরণ আমার লক্ষ্য।

জাগো, আমার হৃদয়ের সৈনিক, জাগো। বিশ্বময় রণডঙ্কা বেজে উঠেছে। বিশ্বময় কোটি কোটি প্রাণকে নীচে চেপে রাখবার চেষ্টা চলেছে। দেশে দেশে পীড়িতের ক্রন্দন গুমরে গুমরে উঠছে—কোটি কোটি চোখের জল জমাট হয়ে গেছে। ওঠো, আমার সুপ্ত সেনা, তুমি তোমার তপ্তশ্বাস নিয়ে ওঠো, বুকে বুকে তোমার প্রাণের আগুন জ্বালিয়ে দাও। শোনো, একটু স্থির হয়ে শোনো, অদূরে কাদের রণ-কোলাহল শোনা যাচ্ছে। ওই শোনো কারা যুগযুগান্তরের আচারকে চুরমার করে দিচ্ছে—তারা অত্যাচারী সমাজকে হত্যা করে ফেলেছে। আর তুমি? সমাজ তোমার প্রভু, আচার তোমার কারাগৃহ, কাজি আর ব্রাহ্মণ তোমার প্রহরী। তুমি কি বেঁচে আছ? তোমারই ঘরে এসে তারা তোমাকে বুকে দলিয়ে, তোমার প্রিয়তমগুলির রক্তপাত করে বুক ফুলিয়ে ফিরে যায়, আর তুমি চুপ করে পড়ে থাক! তবুও বল, তুমি মানুষ! তোমার ছোটো ঘরখানি যখন ভেসে গেল, তোমার স্নেহের শিশুটা যখন না খেয়ে খেয়ে মারা গেল, তখনও তারা তোমারই রক্তে তেজীয়ান হয়ে তোমার বুকে চেপে বসে থাকে, তবুও তুমি বেঁচে আছ?

ওগো সৈনিক, তোমার ক্লীবতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে হুঙ্কার করে ওঠো। ঘরে ঘরে তোমার জন্যে তারা বসে আছে। তারা আর তো বসে থাকতে পারে না—তারা আর তো চুপ করে মরতে পারে না। চেয়ে দেখো তাদের চোখে আর জল নেই—আগুন ঠিকরে পড়ছে। তাদের হৃদয়ে আর দীর্ঘশ্বাস নেই। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটে বেরুচ্ছে।

ওগো বীর, তুমি তাদের আগুন বুকে করে নাও, দীপ্ত জীবনের পথে এগিয়ে যাও। পথের কথা তোমার ভাবতে নেই, তুমি শুধু তোমার সহযাত্রীদের নিয়ে ঠিক হয়ে থাকো। যেদিন নেতার আহ্বান কানে আসবে, সেদিন মুহূর্ত-মধ্যে ভেতর-বাইরের সব বাঁধন ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তার পতাকা-তলে গিয়ে হাজির হবে। কোন বীর হেরে গেল, কোন্ বীর আবার তার স্থান অধিকার করল, সে ভাবনা তোমার থাকবে না। নিশান হাতে নিয়ে যে বীর এসে তোমায় আহ্বান করবে, তুমি তোমার সঙ্গীগণ নিয়ে তারই পাশে দাঁড়িয়ে বলবে, 'আমি প্রস্তুত'।

তারা পথ নিয়ে ভেবে মরুক, তোমার পথ-চিহ্ন গৈরিক নিশান, তোমার আনন্দ দুন্দুভিধ্বনিতে, ঘাত-প্রতিঘাত তোমার নিত্য সাথি, মৃত্যু তোমার পুরস্কার।

['ধূমকেতু', বর্ষ ১ সংখ্যা ১২, ২১ নভেম্বর ১৯২২]

আমার বিশ্রাম

এসো কর্মের দুরন্ত উন্মাদনা, আমার প্রতি তন্ত্রী, গ্রন্থি মেদ মজ্জায় আমাকে খেপিয়ে তুলতে। এসো বিশ্ববিচূর্ণকারিণী শক্তি, আমার প্রতি পেশিকে ইস্পাতে পরিণত করে তাদিগকে অবিশ্রান্ত নাচিয়ে দিতে। কোথা ভৈরবী মা আমার ! মেঘমন্দ্রে আমার কণ্ঠ ঠেলে বেরিয়ে এসো তোমার ভীষণ বিষাণ বাজিয়ে। মহামায়া, তোর মদালসা স্নেহের আঙুল যেন কখ্‌খনো আমার এ বাজেপোড়া দেহে বুলোস নে, জ্বলে যায় তার স্নেহের প্রলেপে। আয় মা দুর্ধর্ষা রুদ্রাণী বিজলির ফিনকি মেরে দিন রাত আমার ধমনিগুলোকে সজাগ রাখতে। নিদ্রা ? হতভাগী, দূর হ তোর চামর-দুলানো ঢুলুঢুলু আঁখি নিয়ে। হো-হো-হো মরণ-সঙ্গিনী, বিশ্রাম দিতে আসছ কাকে ? যার মায়ের, বোনের, ভায়ের পেটে অন্ন মুষ্টি নেই, যার শীতের রাতে চার আঙুল ছেঁড়া ন্যাকড়া জোটে না পিঠের পরে দিতে, যারা মরমের সাথে যুঝতে অক্ষম, বনের পশুর মতো নরখাদকদের শিকার হয়ে চোখ বুঁজে শরীর ছেড়ে দিয়েছে, তাকে ? যাকে শেয়াল-শকুনের মতো ছিঁড়ে ছিঁড়ে তিল তিল করে সভ্য পশুরা বাসি করে রেখে টুকরো টুকরো করে খাচ্ছে, তাকে ? প্রিয়জনসঙ্গসুখ কাকে দিতে চাইছ, বিস্মৃতিদায়িনী ? যার প্রতিবেশী অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপে, যে পরের রক্তআঁখির ভয়ে নিজের কাপড় তৈরি করতে ভয় পায়, যার ছেলে মরে পড়ে থাকতে মরণ-কর দিবার বিরুদ্ধে, ছেলে জন্মালে একটু আনন্দ করতে গেলে আমোদ-কর দিবার বিরুদ্ধে একটি কথা বলতে সাহসী হয় না সেই ইহ-পরকালহীন বর্বরকে ? দূর কর তোর জীবনঘাতিনী মায়া, আর পারিস তো আয় খর্পরকরবালিনি, সুয্যিকে পুড়িয়ে মারবার মতো আগুনের ঝলক দেওয়া রূপের ছটাতে আমার শোণিতকণাগুলো টগবগ করে বাষ্প করে দিয়ে আমাকে সাইক্লোনের বেগে, ঘূর্ণাবর্তের গতিতে দুনিয়াময় ঘুরিয়ে খাটিয়ে নিতে। পারিস তার ভীম তরবারির একটা খোঁচা বেচারি ধরণির বুকে আমূল বিঁধিয়ে তার তাজা রক্তে আমার এ সাগর-ভরা পিপাসা মিটিয়ে দিয়ে, আমার অশান্ত মাথার উপরের চুলের রাশটাকে মানুষের গতির সঙ্গে দুলিয়ে দিয়ে মস্তিষ্ক একটু তাজা করে দিতে। পারিস গোড়ালিতে আমার এমনই বল দে যেন লাথিতে দুনিয়ার অত্যাচার-দানবকে হীনা স্থবিরা ধরণির পাঁজরা ভেঙে ক্রোশ নীচে দাবিয়ে দিতে পারি। ... তো ডানা দুটোয় এমনই জোর দে ... যেন দক্ষিণমুখো হয়ে দুঃশাসন-ধরা ঠ্যাং দুটো ধরে পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে পারি আর সে ঝলকে রক্ত বমি করতে করতে দক্ষিণ মেরুর কুয়াশাময় বরফের ভেতর পুঁতে চিরদিনের মতো অদৃশ্য হয়ে যায়। আর যদি না পারিস তো, তবে দূর হ তোর অবিদ্যার রূপরাশি নিয়ে আমার চোখের সুমুখ থেকে, নইলে হাজার বছর তোর এলোচুলের রাশ ধরে ঘুরিয়ে

জাহান্নামের পূতিগন্ধময় অন্ধকারে তোকেও পুঁতে ফেলে, সেই শ্মশানের উপর চিরকাল আমার আগুনের ঝাণ্ডা উড়িয়ে নাচব। আমি অনাদি, আমি অশেষ, বিশ্রাম আমার সেই দিনই হবে শুধু, যেদিন হাঁটু গেড়ে জোড় হাতে অত্যাচারে অত্যাচারিতের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করে তার পাওনা-গণ্ডা ফিরিয়ে দিয়ে সরে দাঁড়াবে আর সজল চোখে হাসিমুখে আমার শিশুকোমলপ্রাণ ভাইরা তাদের ক্ষমা করে কোলে তুলে নেবে।

['ধূমকেতু,' ১ম বর্ষ, মঙ্গলবার, ১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩২৯]

ধূমকেতুর আদি-উদয় স্মৃতি

প্রায় দশ বছর আগের কথা। স্মৃতি-মঞ্জুষায় সে কথা হয়তো আজ ধূলিমলিন হইয়া গিয়াছে। ১৩০৯ সাল, শ্রাবণ মাস—'রাতের ভালে অলক্ষণের তিলক-রেখা'র মতোই 'ধূমকেতুর প্রথম উদয় হয়। তখন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সক্রিয় ধুলোট-উৎসব পুরামাত্রায় জমিয়া উঠিয়াছে। কারাগারে লোক আর ধরে না, ধরা দিতে গেলে পুলিশে ধরে না—'বন্দে মাতরম্', 'মহাত্মা গান্ধি কি জয়' রব আকাশে-বাতাসে আর ধরে না। মার খাইয়া পিঠ শিলা হইয়া গিয়াছে, মারিয়া মারিয়া পুলিশের হাতে খিল ধরিয়া গিয়াছে। মার খাইবার সে কী অদম্য উৎসাহ! পুলিশের পায়ে ধরিলেও সে আজ মারে না ; পলাইয়া যায়।

ইহারই মাঝে সর্ব-প্রথম প্রলয়েশ ক্ষেপিয়া উঠিলেন। দেশের নেতা অপ-নেতা হবু-নেতা সকলে যখন বড় বড় দূরবীন লাগাইয়া স্বরাজের উদয়-তারা খুঁজিতেছিলেন, তখন আমার উপরে শিব ঠাকুরের আদেশ হইল, এই আনন্দ-রজনীকে শঙ্কাকুল করিয়া তুলিতে। আমার হাতে তিনি তুলিয়া দিলেন 'ধূমকেতু'র ভয়াল নিশান। স্বরাজ-প্রত্যাশী দল নিন্দা করিলেন, গালি দিলেন। বহু ধূলি উৎক্ষিপ্ত হইল, বহু লোষ্ট্র নিক্ষেপিত হইল। 'ধূমকেতু'কে তাহা স্পর্শ করিতে পারিল না।

আমার ভয় ছিল না আমার পিছনে ছিলেন বিপুল প্রমথ-বাহিনীসহ দেবাদিদেব প্রলয়নাথ।

'ধূমকেতু' কল্যাণ আনিয়াছিল কি না জানি না ; সে অকল্যাণের প্রতীক হইয়াই আসিয়াছিল। 'ধূমকেতু' তাহাদের বাণী লইয়া আসিয়াছিল—যাহাদের গৃহী আশ্রয় দিতে ভয় পায়, গহন বনে ব্যাঘ্র যাহাদের পথ দেখায়, ফণি তাহার মাথার মণি জ্বালাইয়া যাহাদের পথের দিশারি হয়, পিতামাতার স্নেহ যাহাদের দেখিয়া ভয়ে তুহিন-শীতল হইয়া যায়।

রুদ্রদেব আশীর্বাদ করিলেন, আমার কারা-শুদ্ধি হইয়া গেল। প্রয়োজনের আহ্বানে নটনাথের আদেশে আমি নিশান-বর্দার হইয়াছিলাম। তাহারই আদেশে 'ধূমকেতু' অন্ধ বিমানপথে হারাইয়া গিয়াছে।

আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ভৌমিক আবার 'ধূমকেতু'কে আহ্বান করিতেছে। কোন রূপে 'ধূমকেতু'র উদয় হইবে জানি না। তবু আশা আছে, যে ধূর্জটির জটাজূটে 'ধূমকেতু' ময়ূর-পাখা, সেই ধূর্জটির রুদ্র আশীর্বাদ সে লাভ করিবে, এ-যুগের প্রলয়েশ তাহাকে নব-পথে চালিত করিবে। আমি ইহার অগ্নিশিখায় সমিধ জোগাইব মাত্র।

['ধূমকেতু' ৫ই ভাদ্র, ১৩৩৮]

আধ্যাত্মিকতা

Ruyat Continued

If He is omnipotent, He is potent to manifest Himself in any manner anywhere and at any time He likes.

"Mutazila" and the "Shia" doctors are opposed to 'Ruyat' (beholding).

Ruyat-i-tam (তাম) = Complete beholding,
Light of Essence = His pure & colourless self.
Beholding of God is of five kinds :

1. In dream with the eye of heart.
2. Beholding Him with the ordinary eyes.
3. Beholding in an intermidiate state of sleep and wakefulness.
4. Beholding in special determination.
5. Beholding the one self in the multitudious determinations of the internal & outernal (?) worlds.

Perfect manifestation = Mazhar-i-Alam.
আকাশ-বাণী = Wahi, Divine revelations
Saluk = Journey
Tatikat = Path
Mutlak = Absolute
মুকাইয়াদ্ = Determined
Arif = Knower of Allah
Marifat = ব্রহ্ম জ্ঞান, Knowledge of Allah

SUFIISM

"সুলতনত্ সহল্ অস্ত, খোদ্‌রা আশনাই ফকর কুন্
কত্‌রা দরয়্যা তত্তানদ্ শোদ্, চেরা গওহর শোদ্।"

"If a drop can be ocean, Why should it then be peurl?"

Anasir (عناصر) = (পঞ্চ) ভূত

Ist : Ansari-Azam (عنصر اعظم) = ব্যোম, the great element or Arshi Akbar = the great throne,

2nd : Ba'd (بعد) = মরুৎ

3rd : আতশ্ (اتش) = তেজ
4th : আব (اب) = Water অপ
5th : খাক (خاك) = ক্ষিতি

তিন আকাশ = ভূত আকাশ, মন আকাশ, চিৎ আকাশ
ভূত আকাশ = পঞ্চভূতকে ঘিরে আছে (Surrounding elements)
মন আকাশ = সমস্ত অস্তিত্বকে (Existance) ঘিরে আছে।
চিদাকাশ = is enveloping all & covering everything, চিদাকাশ is permanent ie, is not transitory এবং লয় বা ধ্বংস হয় না। (কোরান ও বেদান্তের উক্তি)

চিদাকাশ থেকে প্রথমে এলো love (عشق)। অদ্বৈতবাদীরা একেই বলেন, মায়া (?)। "মায়া" বা Love থেকে এলো জীবাত্মা (Ruh-i-Azam) রুহ্-ই-আজম The great soul.

Ruh-i-Azam is understood a reference to be soul of Mohommad and (further) to the 'complete soul' of the chief (of the faithful), ভারতীয় অদ্বৈতবাদীরা এ'কেই (Ruh-i-Azamকে) বলেন "হিরণ্যগর্ভ" + "Avasthatman" (?)

এরপরে এলো "মরুৎ" (?)—Which is said to be the breath of the Merciful (Rahman) from which springe air mundane.

কোরান : "Everything is perishable but His face (wajh), "কুল্লু শাইয়েন, হালেকুল্লা ওয়াজ্ হাহ্" অর্থাৎ মহাকাল ছাড়া সবই লয় হবে। মহাকাল—His face হিরণ্যগর্ভ? মহাকাল is the firm body of the Holy Self.

পঞ্চ ইন্দ্রিয় (Hawas حواس)

নাস	রসনা	চক্ষু	ত্বক	শ্রোত্র
গন্ধ	রস	রূপ	স্পর্শ	শব্দ
ক্ষিতি	অপ	তেজ	মরুৎ	ব্যোম
شامه	ذايقه	باصرة	سامعه	لامسه
শোম্মা	(জাইকা)	(বাসিরা)	(সামিয়া)	(লামেসা)

Shaghlipasi Aufus—ধ্যান

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (Internal Senses)

বুদ্ধি, মন, অহংকার, চিত্ত = অন্তঃকরণ।
মুশ্‌তবক = Common বা সাধারণ জ্ঞান
মুতাখাইয়েলা = Imaginary

মুতাফাক্কিরা = Contemplative
z
হাফিজা = Retentive

ওয়াহিমা = চিত্তের সৎপ্রকৃতি নামক পা আছে—তা কেটে দিলে তা আর ছুটাছুটি করতে পারে না।

বুদ্ধি = জ্ঞান, ভালোর দিকে টানে, মন্দকে (evil) পরিত্যাগ করতে বলে।

মন = এর দুটী বিশেষত্ব—সঙ্কল্প ও বিকল্প অর্থাৎ Determination—abandonment (doubt),

চিত্ত = মনের messenger বা বাহক, সকল দিকে ছুটে বেড়ানোর কর্ত্তব্য চিত্তকে দেয় মন। চিত্ত ভাল মন্দ বিচার করতে পারে না।

অহঙ্কার = যা আমি আমি বা আমার আমার চিন্তা করায়—পরমাত্মার গুণ। কেননা ইহা 'মায়া' দ্বারা চালিত হয়।

('মায়া' কিন্তু Love নয়, 'মায়া' পরমাত্মার রূপ উৎপাদিকা শক্তি)

অহঙ্কার তিনভাগে বিভক্ত—সত্ত্ব রজ তম।

উত্তম বা সাত্ত্বিক অহঙ্কার জ্ঞান স্বরূপ। যা বলে, সোহহম্। ইহা পরমাত্মার জ্ঞান।

মধ্যম বা রাজসিক অহঙ্কার = (Middle Stage), ইহা জীবাত্মার জ্ঞান। ইহা বলে, My self বা আমিত্ব দেহ ও সর্ব্ব ইন্দ্রিয় মুক্ত।

অধম বা তামসিক অহঙ্কার—অবিদ্যা। ইহাই জীবন মৃত্যুর সৎ অসতের কল্পনা করে।

'আকলি কুল' عقلی کل = Perfect wisdom পূর্ণ জ্ঞান।

মন—সঙ্কল্প ও মহত্ত্ব হতে সৃষ্ট বলে এর থেকে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় রূপ রসাদির সৃষ্টি করলে।

সঙ্কল্প ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় থেকে স্পষ্ট হলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

পরমাত্মা = Abul Arwah 'আবুল আরওয়াহ্'।

এই পরমাত্মাই নিজেকে এই সব বন্ধনে নিজেকে বেঁধেছেন। যেমন বীজ থেকে গাছ উদ্গত হবার পর বীজ নিজেকে গাছের শাখা পল্লবে ফুলে ফলে হারিয়ে যায়—তেমনি 'তিনি' নিজের সৃষ্টিতে নিজে বদ্ধ হয়েছেন। সৃষ্টির আগে এই জগৎ তাঁতে গুপ্ত ছিল—এখন তিনি সৃষ্টিতে গুপ্ত আছেন। 'অস্তিত্ব'ই তাঁকে আড়াল করে রেখেছে।

সাধনা (Ashghal) اشغل

অজপা শ্রেষ্ঠ। অজপা—মুরাকাবা
ও—(He) প্রশ্বাস। ম—(আমি, I) নিশ্বাস।
ওম্—He is I—হু আল্লাহু—He is God

ঈশ্বরতত্ত্ব (সেফাত-ই-আল্লাহ তা'লা)

সুফি মতে আল্লার দুই দিব্যগুণ—Beauty + Majesty অর্থাৎ 'জামাল' ও 'জালাল'। এই দুই attributes সমস্ত বিশ্বকে (সৃষ্টিকে) ঘিরে রয়েছে।

আর্য্যমতে—তিন গুণ সত্ত্ব, রজঃ তমঃ। স্থিতি, সৃষ্টি, প্রলয়। সুফিরা সৃষ্টিকে স্থিতিকে এক ধরিয়া 'জামাল' নাম দেন।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—জিবরাইল, মিকাইল, ইসরাফিল।

জল = জিবরাইল = ব্রহ্মা
অগ্নি = মিকাইল = বিষ্ণু
বায়ু = ইসরাফিল = মহেশ্বর } Superintending angels

এই তিন বস্তু 'জল অগ্নি বায়ু' সমস্ত সৃষ্টিতে রয়েছে। আমাদের মাঝেও আছে।

জল = রসনায় রস = ব্রহ্মা = বাণী শক্তি + Divine utterance = সরস্বতী + সাবিত্রী বা বেদমাতা শক্তি।

বিষ্ণু = চক্ষে জ্যোতিঃ = সমস্ত জ্যোতির ও তেজের মূল।

মহেশ্বর = নাসায় নিশ্বাস প্রশ্বাস = Two blowing horns শৃঙ্গ ও বিষাণ = এর সংহারে মৃত্যু বা সমাধি।

ঐ তিন জনের শক্তিই (potential power = শক্তি বা কালি বা দুর্গা। কাজেই শক্তিই ঐ তিন দেবতার জননী বা মাতা। ব্রহ্মার সরস্বতী শক্তি। বিষ্ণুর লক্ষ্মী শক্তি। মহেশ্বরের পার্ব্বতী শক্তি।

আত্মা

আত্মা = রুহ
জীবাত্মা = Common Soul
পরমাত্মা = আবুল আর্ওয়াহ = The Soul of Souls,

z

জাতে বহত্ অর্থাৎ PureSelf যখন determinate + fettered হয় in respect of শুদ্ধ বা অশুদ্ধ তখন তার নাম হয় রুহ বা আত্মা। শুদ্ধ অবস্থায় আত্মা অশুদ্ধ অবস্থায় দেহ বা শরীর = 'জসদ' جسد

The Self that was determined in eternity Pasts ... known as Ruh-i-Azam (Supreme Soul) and is said to possess uniform identity with he Omnicient) being.

Now, the soul in which all the souls are included is known as Paramatma or Abul Arwah.

জল ও তার তরঙ্গের মধ্যে যে সম্বন্ধ inter-relation body and soul অর্থাৎ শরীর ও আত্মার মধ্যে সেই সম্বন্ধ।

শুধু জল যেন শুদ্ধ বা চেতন আত্মা = Adjust existance, সমস্ত তরঙ্গ তাদের একত্ববোধে যেন পরমাত্মা।

মরুৎ (বায়ু) = **বাদ** باد

প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান = পঞ্চবায়ু

প্রাণ = নাসিকা থেকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পর্যন্ত যে বায়ু সঞ্চরণ করে তাই প্রাণ বায়ু। ইহাই নিশ্বাস প্রশ্বাস।

আপন = From the buttocke to the special organ is encireling the navel and is the Om of life. পাছা থেকে লিঙ্গমূল পর্যন্ত এর গতি—নাভিকেও পরিবেষ্টন করে।

সমান = Moves inside the breast and the navel. বক্ষ ও নাভির মধ্যে ইহা সঞ্চরণ করে।

উদান = কণ্ঠ থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত সঞ্চরণ করে।

ব্যান = গুপ্ত ও প্রকাশ সমস্ত অন্তর ও বাহিরে ইহা সঞ্চরণ ও অণুপ্রবিষ্ট হইতেছে।

The Four Worlds (Awalim-i-Arba'a) عوالم اربعة

সুফী মতে সমস্ত সৃষ্ট জীবকে চারি স্তরের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে।

১। নাসুল (The human world) ২। মালাকুত (The invisible world) ৩। জাবরুত (The Highest world) ৪। লাহুত (The Divine world), কারুর মতে আর এক স্তর দিয়ে যেতে হবে তার নাম "Alam-i-Mithal" আলাম-ই-মিসাল The world of similitude = Invisible world!

আর্য্য মতে =	জাগ্রত	স্বপ্ন	সুষুপ্তি ও	তুরীয়
	↓	↓	↓	↓
	নাসুল	মালাকুত	জাবরুত	লাহুত
	↓	↓	↓	↓
	স্থুল	সূক্ষ্ম	কারণ	অতিকারণ
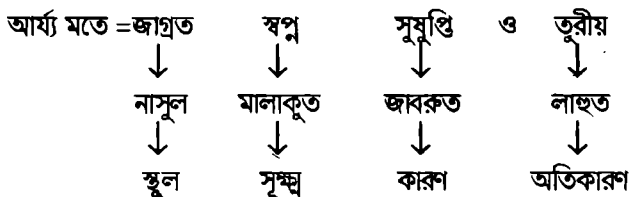
জাগ্রত বা নাসুল	=	World of manifestation and wakefulness.
স্বপ্ন বা মালাকুত	=	World of souls and dreams.
জাবরুত বা সুষুপ্তি	=	in which the traces of both the worlds disappear and আমি তুমির ভেদজ্ঞান লোপ হয়।
Tasaw-waf	=	'তসাও উফ' সুফী সাধনা Consists in sitting for a moment without an attendent ie. finding

without seeking, beholding without seeing, জাগ্রত ও স্বপ্ন-জগৎ যেন মনে প্রবেশ না করে।

তুরীয় = Pure existance encircling including and covering all the worlds. তুরীয় পর্যন্ত যাওয়াও Progress on his part,

তারপর অবসান = Ultimate বা পূর্ণ।

তাঁকে খুঁজে পেতে হলে এক মুহূর্তও খুঁজো না। তাঁকে জানতে হলে এক মুহূর্তও জেনো না। তাঁর গুপ্ত তত্ত্ব জানতে গেলে তাঁর বহিপ্রকাশ থেকে বঞ্চিত হই। বহির্প্রকাশ তত্ত্ব জানতে গেলে গুপ্ত তত্ত্ব থেকে বঞ্চিত হই। গুপ্ত ও প্রকাশ থেকে যখন তুমি বেরিয়ে এলে তখনই তাঁর আশ্রয়ে আরামে শুয়ে পড়।

Z
শব্দ (اواز) আওয়াজ

সুফী মতে শব্দ এলো from the same breathe of the merciful প্রথম "কুন্" অর্থাৎ Be যা "হও" হইতে। আর্য্যমতে ইহাই "নাদ" (প্রণব—নিনাদ) এই নাদ তিন প্রকার।

১। অনাহত = যাহা অতীতে ছিল, এখন আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে। সুফীরা একে বলেন, "আওয়াজ-ই-মুতলাক" (the sound of the Absolute) বা "সুলতানুল আজ্কার (the Sultan of all devotional exereises) this sound is eternal and ইহা দ্বারাই মহাকাশের অনুভূতি হয়। মহাযোগী ছাড়া এ শব্দ অন্য কেউ শুনতে পায় না।

২। আহত = এক জিনিষ অন্যে আঘাত করলে যে শব্দ হয় অথচ তাতে কোনো কথা বা বাণী নেই।

৩। শব্দ = কথা-যুক্ত শব্দ = সরস্বতী। এই শব্দই "ইসম-ই-আজম্" = The Great name, I s m-i-A z a m = Al-Hayy-ul-Kayyum or Ar-Rahman, Ar-Rahim.

বেদ্-মুখ বা ও'র মূল এই শব্দ = শব্দ ব্রহ্ম।

'অ'-কার 'উ'-কার ও 'ম'-কার। ফত্হা, জাম্মা এবং কাসারা।

নূর = জ্যোতি

Jalal (Majesty) Sun-coloured, Ruby-coloured, five-eoloured,

Jamal (Beauty) Moon-coloured, Pearl-coloured or Water-coloured.

Lastly the "Light of the Essence" which is devoid of all colours is the light of Allah.

স্বর্গ ও পৃথিবীর আলো = জ্যোতিঃ স্বরূপ বা স্ব-প্রকাশ ও স্বপ্ন প্রকাশ রূপেই তাঁরই আলো।

Vision of God = Ruyat, ভগবদ্দর্শন (সাক্ষাৎকার)

দ্বি-দলের নয়ন দিয়ে তাঁকে দর্শন = Vision of God, Men of the Book = Ahli Kitab,

জাত-ই-বহত্ = (Pure Self) = (ব্রহ্ম?) though can be beheld is an impossibility, Pureself is undetermined. He can't be determined. He is manifest in the veil of elegance.

আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন স্তরের যে ছবি কবি এঁকেছেন এই :

Body Soul, Abul Arwah, Allah

মন্দিরে আলো, সেই আলোকে একটি ভাস্বর নক্ষত্র ঘিরে রয়েছে, সেই নক্ষত্র বিনা অগ্নিতে যেন এক তৈল দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে, সেই তৈল আসছে এই পবিত্র জলপাই গাছ থেকে।[১]

Light from Olive tree

Glass is যেন ভাস্বর নক্ষত্র Lamp

Niche কুলুঙ্গী তাক্

প্রতি ধূলিকণা সূর্য্য প্রতি জল-বিন্দু, পূর্ণ সাগর কোন্ নামে তাঁকে ডাক্‌বে যা কিছু নাম শুন তা যে তাঁরই নাম।

He is manifest in all. And everything has emanated from this. He is the first and the last and nothing exists except Him.

স্থূল জগতে, সূক্ষ্ম জগৎ, জ্যোতির্জ্জগৎ, চিন্ময় জগৎ, শক্তি জগৎ, ব্রহ্ম Allah,

In the name of one, who hath no name with whatever name thou eallest Him, He uplifteth His Head."

ওগো চির-সুন্দর ! তব অতুলন/মধুর মুখের পাশে 'বিশ্বাস' আর 'অবিশ্বাসে'র/দুটী আবরণ ভাসে। খুলি' বিশ্বাস-আবরণ আমি/তোমারে দেখিতে, দেখিলাম, স্বামী, 'অবিশ্বাসী' ও কখন আসিয়া/হাসিছে তোমার পাশে॥

---

১. এই অংশটি পবিত্র কোরআন শরীফের একটি অংশের অনুবাদ। অনুবাদ আংশিক, সম্পূর্ণ অনুবাদটি এই : 'আল্লাহ্ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি। তাঁর জ্যোতির উপমা যেন সে তাকের মত, যার মধ্যে আছে এক প্রদীপ, প্রদীপটি কাচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ। পবিত্র জয়তুন বৃক্ষের (তৈল হতে) এ প্রজ্জ্বলিত হয়, যা প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও নয়, অগ্নিসংযোগ না করলেও মনে হয় ওর তৈল যেন উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে। জ্যোতির উপর জ্যোতি। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাঁর জ্যোতির দিকে পথনির্দেশ করেন।' .. সুরা নূর, পঁয়ত্রিশ সংখ্যক বাক্য।

আইরিশ-বিদ্রোহী
রবার্ট এমেট

সকল দেশের মুক্তির-পথের যাত্রী আমাদের নমস্য। জগতে এই তীর্থযাত্রার আরম্ভ মানবের সৃষ্টিকাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিজাত্যের বিপক্ষে যে অভিযান, তাহার পন্থা যা হউক না কেন সে অভিযান যে-সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সাফল্যের মাপকাঠিতে তাহার বিচার চলে না, কারণ মানুষ বাঁচে তাহার চেষ্টাতে, সাফল্যে নয়। মুক্তি লাভের আদর্শ মানব-সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন আকারে ধারণ করে। কোথাও তাহা ধনাভিজাত্যের বিপক্ষে উঠিয়াছে, কোথাও বা প্রতিষ্ঠিত অত্যাচারমূলক রাজশক্তির বিপক্ষে, কোথাও বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। তাহার পন্থা হয়ত কোথাও অস্ত্র ধারণ করে, কোথাও বা নৈযুজ্য। মুক্তি কোন পথে তাহার বিচার মানুষ নিজের সভ্যতার প্রকৃতি অনুযায়ী করিয়াছে। এই যে সমাজের, বা রাজশক্তির, বা যে কোন প্রকার আভিজাত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সেই বিদ্রোহের শক্তি আমরা চাই। ধ্বংসের, প্রলয়ের শক্তি এই দুই শক্তির ঘাত প্রতিঘাতে জগৎ চলিতেছে নিত্য-নূতন ধারায়, নূতন পথে ; চিরদিন নবীন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া। শীতের ঝরাপাতার সমাধির উপরই বসন্তের অভিযান। খৃষ্ট, মোহম্মদ, বুদ্ধ সকল মহাপুরুষই সেই বিদ্রোহীর দলভুক্ত ; সেই বিদ্রোহ গঠনের জন্য সৃষ্টির জন্য। বিদ্রোহেই সৃষ্টি ; তাই খৃষ্টের বাণী শুনি—I am not come to distroy but to fulfil. (ধ্বংসের জন্য আসি নাই ; আমি আসিয়াছি সৃষ্টিকে সফল করিয়া তুলিতে)। যাহাতে প্রকৃতির বিচিত্র রাজ্যের পাশে মানবসৃষ্ট সমাজেও প্রাণশক্তির এই রূপের ক্রিয়া যে নিত্য চলিতেছে—তাহা মাঝে মাঝে বিশেষভাবে ফুটিয়া ফুটিয়া, আকস্মিক ঘটনা বলিয়া প্রতীয়মান হয় ; কিন্তু বস্তুত ব্যাপারটা তা নয়। আবর্জনার স্তূপ যখন বহুদিনের [...] চেষ্টায় বিরাট আকার ধারণ করে ; বহুদিনের ধূমায়িত বিদ্রোহ-চেষ্টা ; আগুনের রূপ ধারণ করে আকস্মিক ব্যাপারের মতো দেখা দেয়। [...] ভিতরে যে অখণ্ড চেষ্টার একটি [...] আছে তাহা সহজে ধরা পড়ে না। তাহাকে অস্বাভাবিক, অসহজ [...] সুতরাং অন্যায় বলিয়া আমরা ছোট করিতে চেষ্টা করি। কিন্তু ব্যাপারটা তাহা নহে। বিদ্রোহ যে আমাদের সহজ অবস্থার পরিণত ফল। এবং বিদ্রোহী যে, সে যে আমাদের অন্তরের দেবতার মূর্ত্য প্রকাশ।

মানুষ দিনের পর দিন অগ্রসর হইয়া চলিতেছে, তাহার সভ্যতার নৈতিক আদর্শের রূপ পরিবর্তন করিতেছে। সুতরাং পুরাতন দিনের বিদ্রোহের পন্থার সহিত আজিকার বিদ্রোহ ঘোষণার পথ না মিলিতে পারে, তাই বলিয়া সে চেষ্টাগুলোকে ছোট করিবার অন্যায় অকল্যাণকর প্রবৃত্তি যেন আমাদের না পাইয়া বসে।

মাঝে মাঝে এই বিদ্রোহের আলোচনা করিয়া তাহাদের ভুলভ্রান্তিগুলিকে নিজেদের কাজে ফলাইয়া নিজের পথ নির্ধারণ আমরা যেন করি।

আজ যে বিদ্রোহী মহাপ্রাণের কথা বলিব তিনি হয়ত আজিকার আদর্শের মাপকাঠিতে খুব সুন্দর পথ অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু তবুও তাঁহার দেশপ্রীতি, অখণ্ডত্যাগ ও অপূর্ব সাহস কোন দিনই আমাদের চক্ষে ছোট বলিয়া মনে হইতে পারে না।

রবার্ট এমেট আজিও আয়র্লন্ডের অন্যতম মুক্তিমন্ত্রের সাধক বলিয়া পরিচিত। আয়র্লন্ড এখনও তাঁহার স্মৃতি পূজা করিতেছে, আজিও আয়র্লন্ডের সপ্তম বর্ষের শিশু মাতার মুখে স্বাধীনতা-মন্ত্রের প্রথম ঋত্বিক, এই পুরোহিতের কাহিনী শোনো।

আমেরিকায় এখনও বালকগণ এমেটের শেষ বাণী মুগ্ধচিত্তে পাঠ করে। এমেটের স্মরণে মুরের বিখ্যাত কবিতা—When he who adores thee has left but the name of his faults and his sorrows behind.

(Irish Melodies)

তোমারে যে জন পূজিত গো মাতঃরক্তদলে
সে যে আজ বহু দূরে,
আজ শুধু বাজে হেথা—তারই কথা—
তারি যে ব্যাথা
নিতি বিচিত্র সুরে !

আয়র্লন্ডের এমন লোক নাই যে জানে না এমেটের শেষ উক্তি আজ আয়র্লন্ডে মুক্তিচেষ্টার মন্ত্র।

কিন্তু হয়তো রাজার বিচারে এই বীর, মহাপ্রাণ একজন সামান্য সুকর্মী ; ঘাতকের হস্তে অতি সাধারণ তস্কর দস্যুর মত তাঁহাকে প্রাণ দিতে হইয়াছিল।

মানুষ এমনিভাবে চলে।

আয়র্লন্ডের ইতিহাসের একটা অধ্যায় এইখানে বলা হইবে।

১৭৫৯ খৃঃ অব্দে হেনরী ফ্লাড (১৭৩২–১৭৯১) যখন স্বীয় ব্যক্তিত্বের বিভব লইয়া আইরিশ পার্লামেন্টে প্রবেশ করিলেন, সেই দিন হইতে সঙ্ঘবদ্ধভাবে জাতীয়তার সৃষ্টি হইল ; তাহার পূর্বে আইরিশ পার্লামেন্টে জাতীয় দল বলিয়া কোন কিছু ছিল না। সপ্তম হেনরীর রাজত্বকালে Poyning Act এর ফলে আইরিশ পার্লামেন্ট বৃটিশ পার্লামেন্টের অধীনে একটা অভিনয় মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কোন ব্যাপারেই তাহার কোন ক্ষমতা ছিল না ; কোন একটা ব্যবস্থা করিতে হইলে বৃটিশ পার্লামেন্টের অনুমতি বিনা হইতে পারিত না। এবং আইরিশ পার্লামেন্টের যে কোন ব্যবস্থা বৃটিশ পার্লামেন্ট নাকচ করিয়া দিতে পারিত। আয়র্লন্ডের অধিবাসীগণের অর্ধেকের উপর যদিও রোমান ক্যাথলিক ছিলেন তবুও তাঁহাদের কোথাও প্রতিনিধি নির্বাচনের দণ্ডবিধি অধিকার ছিল না। আইন তাঁহাদের বিরুদ্ধে ছিল। Penal code এ তাঁহাদের উপর অত্যাচারের নিষেধ বিধি ছিল না। সমগ্র শাসন যন্ত্র যেন তাঁহাদের পেষণ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল।

এমন অবস্থায় ফ্লাড আইরিশ পার্লামেন্টের সদস্য হইলেই ১৭৬৮ খৃঃ নানা কারণে যখন বৃটিশ গভর্নমেন্ট আয়র্লন্ডকে চটাইতে সাহস করিয়াছিলেন না, সেই সুযোগে ফ্লাড আইরিশ গভর্নমেন্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার আইন অনুমোদিত করিয়া লয়েন।

এতদিন আইরিশ পার্লামেন্টের উপর প্রভুত্ব স্থায়ী রাখিবার জন্য বৃটিশ গভর্নমেন্ট এক জঘন্য প্রথা অবলম্বন করিয়াছিলেন। পার্লামেন্টে আইরিশ সদস্যদের গভর্নমেন্ট অনেকগুলো সুবিধা দিয়া প্রতিনিধি করিতেন এই শর্তে যে, তাহারা পার্লামেন্টে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। তাহারা জনসাধারণের প্রতি অত্যাচার করিত, কিন্তু তাহার কোন প্রতিকার ছিল না, তাহার কারণ রাজশক্তি তাহাদের সহায়তা করিত। তাহারা undertaker নামে পরিচিত হইত। ১৭৬৮ খৃঃ অব্দে বৃটিশ গভর্নমেন্ট অদূরদর্শিতা দেখাইয়া তাহাদিগকে এতদিনের সুবিধাগুলি কাড়িয়া লওয়াতে তাহারা ফ্লাড এর সহিত পার্লামেন্টের বিপক্ষতাচরণে যোগ দিল। সেই দিন হইতে আইরিশ পার্লামেন্ট যুক্তভাবে বৃটিশ পার্লামেন্টের বিপক্ষতাচরণ করিতে আরম্ভ করিল। যা পূর্বে কখনও হয় নাই তাও হইল, বৃটিশ গভর্নমেন্ট যে আইন প্রচলন করিবার চেষ্টা করিলেন আইরিশ পার্লামেন্ট তা সমর্থন করিল না।

ফ্লাড ধীরে ধীরে আয়র্লন্ডের একচ্ছত্র জাতীয় নেতা হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বৃটিশ গভর্নমেন্ট যে নীতি সর্বত্র অবলম্বন করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন, আজও সেই নীতি অবলম্বন করিলেন। ফ্লাডকে অর্থ, সম্পদ ও আসনের প্রলোভন দেখান হইল। তিনি বৎসরে ৩৫০০ পাউন্ডের বিনিময়ে আয়র্লন্ডের স্বাধীনতা বিক্রয় করিলেন।

কিন্তু বিধাতার অমোঘ বিধানে যে জাতি উঠিবে তাহার জাগরণে কোন শক্তিই বাধা দিতে পারে না। গ্রাটন আসিয়া তাঁহার স্থান অধিকার করিলেন। ১৭৫৯ খৃঃ অব্দ হইতে সুদীর্ঘ ১৬ বৎসর ধরিয়া ফ্লাড আইরিশ পার্লামেন্টের স্বাধীনতার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন রাজশক্তির প্রলোভনে তাহা যখন ত্যাগ করিলেন, হেনরি গ্রাটন (১৭৬৪–১৮২০) সে চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। কুক্ষণে হোক, সুক্ষণে হোক ফ্রান্স যখন বিদ্রোহী আমেরিকার ঔপনিবেশিকগণের সহিত যোগদান করিল তখন আয়র্লন্ডকে কালের আক্রমণের সম্ভাবী বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যদল গঠিত হইল। ফ্লাড সেই Volunteer Convention এ যোগদান করিয়া একবার নিজের নষ্ট খ্যাতি ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলেন। আইরিশ রাজনীতির ক্ষেত্রে এই Volunteer Convention (স্বেচ্ছাসেবী সঙ্ঘ) অনেকখানি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। তাহারা আয়র্লন্ডের অধিকার ফিরাইয়া আনিবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করিল। বলীর সম্মুখে যে অল্প বলিয়া বলী সে চিরদিনই নতি স্বীকার করে। বৃটিশ গভর্নমেন্টের তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবার সাহস হইল না। ১৭৭৯ খৃঃ অব্দে আয়র্লন্ডকে ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের পূর্ণ অধিকার দিতে হইল। এই Volunteer Convenation (স্বেচ্ছাসেবক সমিতিকে) পিছনে রাখিয়াই গ্রাটন ১৬ এপ্রিল ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে দীর্ঘকালের চেষ্টা সফলতা লাভ করিল। আইরিশ পার্লামেন্ট অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা বিষয়ে অনেকখানি স্বাধীনতা লাভ করিল। জনসাধারণ স্বাধীনতা লাভের প্রথম স্পর্শে উন্মত্ত হইয়া গ্রাটনকে

দেশের বরেণ্য নেতা রূপে বরণ করিয়া লইল। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে ফ্লাডের চেষ্টায় বৃটিশ গভর্নমেন্ট ভবিষ্যতে আয়র্লন্ডের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার প্রত্যাহার করিয়া লইলেন।

কিন্তু তখনও পর্যন্ত রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়কে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা হইল না। ১৭৯২ খৃঃ অব্দে গ্রাটনের চেষ্টায় সেই অধিকার দেওয়া হইল বটে কিন্তু তাহা শুধু নামে মাত্র। তাহার কিছুদিন আগে হইতেই ক্যাথলিক-অধিকার-সমস্যা জাতির চিত্ত অধিকার করিয়াছিল এবং ১৭৯৪ খৃঃ অব্দে যখন গ্রাটন সে অধিকার পূর্ণতরভাবে দিবার চেষ্টা করিয়া বিফল হইলেন তখন দেশের ননফরাসি সাধারণ-তন্ত্রের আদর্শের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। এতদিন যে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত অন্তর্জাতি বিদ্বেষ আয়র্লন্ডকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল তাহা এইবার দূর হইতে লাগিল। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের চেষ্টায় সকলেই ধর্মনির্বিশেষে একযোগ হইতে লাগিল। (প্রেসবাইটেরিয়ান) Presbyterian ও রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় মিলিত হইয়া United Irishmen মিলিত আয়র্লন্ড-এর ও Catholic Committee-র (ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের) সৃষ্টি হইল। ঠিক এই সময়েই আবার বৃটিশ পার্লামেন্টে উন্নতিশীল দল পিটের নেতৃত্বে একটি ভুল করিয়া জাতির মিলনটা আরও দৃঢ় করিয়া দিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আয়র্লন্ডের চিত্তমথিত করিয়া টোন ও ফিটজোরাল্ড দেশের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেশ যাহা চায়, যাহা এতোদিন বৃথাই ভাষায় প্রকাশ লাভ করিবার সুযোগ খুঁজিয়াছিল, দেশের সেই আদর্শটি তাঁহাদের মধ্যে মূর্তি ধারণ করিল। মিলিতে হইবে, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকেই মিলিত হইতে হইবে। দেশের মুক্তি কামনার এই বাণী লইয়া টোন রাজনীতি ক্ষেত্রে নামিলেন। ১৭৯১ খৃঃ অব্দে টমাস রাসেল ও ন্যাপার ট্যাডি (Napper Taddyর) সহায়তায় টোন United Irishmen প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইউরোপের আকাশে তখন একটা নূতন হাওয়া উঠিয়াছিল। ফরাসী গণতন্ত্র জাতিধর্ম নির্বিশেষে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতেছিল। আদর্শ সংক্রামক। এই সাম্যবাদের একটা উন্মাদনা আছে যাহার ঢেউ আয়র্লন্ডেও আসিয়া পৌঁছিল। ১৭৯২ খৃঃ লর্ড উইলিয়ম ফিটজেরাল্ড (Lord William Fitgerald) প্যারিসে গিয়া ফরাসি গণতন্ত্রবাদের অন্যতম মন্ত্রদ্রষ্টা টমাস পেন Thomas Paine-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দেশে ফিরিলেন বিদ্রোহের আদর্শে ভরপুর হইয়া। এইদিকে দেশেও বিদ্রোহের হাওয়া বহিতে শুরু করিয়াছিল। ১৭৯১ খৃঃ অব্দে লর্ড কেনমেয়ার প্রতিষ্ঠিত রোমান ক্যাথলিক কমিটিতে গৃহবিবাদ হইয়া কেনমেয়ার প্রমুখ মধ্যপন্থী ৬০জন সভ্য কমিটির সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিলেন। তখন টোন আসিয়া কমিটির কর্মসচিবের পদ গ্রহণ করিলেন। সেইদিন হইতে কার্যতঃ United Irishmen ও Roman-Catholic Committee একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া চলিতে লাগিল। টোন কোনদিনই বিশ্বাস করেন নাই যে, সশস্ত্র বিদ্রোহ ছাড়া দেশের মুক্তি লাভ হইতে পারে। ১৭৯১ খৃঃ অব্দে যখন তিনি Letter from a Northern Whig নামে একটি পত্র প্রচার করেন তাহাতেই তিনি Grattan Flood

প্রভৃতি (Constitutionalist) অনুশাসন বাদীদের বিদ্রুপ করিতে ছাড়েন নাই। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত United Irishmen বা Roman Catholic Society কোনটিই তাঁহার এ আদর্শ কার্যে গ্রহণ করে নাই। কিন্তু ১৭৯৪ খৃঃ অব্দে যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, এভাবে চলিবে না তখন হইতে United Irishmen এর লক্ষ্য বিদ্রোহের সাহায্যে দেশের স্বাধীনতা লাভ হইল। তখন হইতেই টোন প্রভৃতি নেতাগণ বিদ্রোহের দিনে ফরাসি গণতন্ত্রের সাহায্য আশা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ফ্রান্স হইতে একজন দূত আসিয়া বিদ্রোহের আয়োজনের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। টোন তাহার হাতে ফরাসি সাধারণতন্ত্রের (Directoric) এর নায়কসভার জন্য একটি পত্র দিলেন। কিন্তু পত্রবাহক ধরা পড়িল। টোন আমেরিকায় পালাতে বাধ্য হইলেন। United Irishmen এর সভ্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে ১৭৯৬ খৃঃ অব্দে Fitzgerald আসিয়া United Irishmen পুনরায় গড়িয়া তুলিলেন। টোন এইদিকে আমেরিকায় নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। ১৭৯৬ খৃঃ অব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি প্যারিতে আসিলেন বিদ্রোহের আয়োজন করিতে। তিনি আসিয়া ফরাসি গণতন্ত্রের নেতা কর্নোট (Cornot) ডিলাক্রয় (Delacroix) এর সহিত দেখা করিলেন। আয়র্লন্ডে এইদিকে রবার্ট এমেটের ভ্রাতা (Thomas Emmet) United Irishmen এ যোগ দিয়াছিলেন। ১৭৯৭ খৃঃ অব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে টোন যখন প্যারিতে লর্ড ফিটজেরাল্ড (Lord William Fitzgerald) তখন হ্যামবুর্গে ফরাসি মন্ত্রী (Reinhert) রাইনহার্টের সহিত বিদ্রোহের আয়োজনের বন্দোবস্ত করিতেছেন। ফ্রান্স সাহায্য করিতে সম্মত হইয়া জেনারেল হোক (General Hoche)কে ১৫০০০ সৈন্য দিয়া আয়র্লন্ড আক্রমণ করিতে বলিলেন। টোন ফরাসি সৈন্যদলে সৈন্যাধক্ষের পদ গ্রহণ করিলেন। ১৭৯৬ খৃঃ অব্দে আইরিশ স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। হোকের উদ্দেশ্য ছিল আয়র্লন্ডে অস্ত্রশস্ত্র বিতরণ করিয়া দেশকে প্রস্তুত করিয়া রাখা। ১৭৯৭ খৃঃ অব্দে টোন দ্বিতীয়বার ডাচ সৈন্যের সাহায্যে কর্ম আরম্ভ করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু এইবারও তাঁহাকে বিফল মনোরথ হইতে হইল। এইদিকে United Irishmen এর সকল চেষ্টা বৃটিশ গভর্নমেন্ট জানিতে পারিলেন একজন দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের নিকট হইতে। তাহার নাম স্মরণীয়। রেনল্ডস গভর্নমেন্টকে যে সকল গোপন কথা জানাইলেন তাহার ফলে ১৭৯৮ খৃঃ ১২ মার্চ তারিখে অনেকগুলো নেতা ধৃত হইল। Lord William তখন ধরা পড়েন নাই। তাঁহাকে আমেরিকায় পালাইবার সুযোগ দেওয়া হইলে তিনি ঘৃণার সহিত তাহা এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন, যাহাদেরকে বিপদে ফেলিয়াছি তাহাদের ভাগ্যের সহিত আমার ভাগ্য চিরদিন অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত থাকিবে। ৩০ মার্চ Martial Law জারি করা হইল। তখন সে যে কি অত্যাচারের স্রোত আয়র্লন্ডের উপর দিয়া বহিয়া গেল তাহা অবর্ণনীয়। হত্যা, পাশব–অত্যাচার, অপমান, নির্যাতন দেশের কণ্ঠরোধ করিয়া জাতীয়তা–বোধকে নষ্ট করিবার যে চেষ্টা বিফল হয় তাহা প্রমাণ হইল পরে রবার্ট এমেটের জীবনে। রাজশক্তি যখন অস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তখন দুর্বলের অন্যায় দমন চিরদিনই

তাহার চেষ্টা থাকে। মানুষ অস্ত্রের সহায়তায় কোন দিনই স্নেহ জাগাইয়া দিতে পারে নাই। সেইদিনও পারিল না ; দেশের মন বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে জাগিয়া উঠিল। যে চেষ্টা এতদিন নানা চেষ্টায় ফলবতী হইতে পারে নাই অত্যাচারে তাহাই হইল। আয়র্লন্ড এক হইল। এই অত্যাচারের বিভীষিকা ইংরেজ ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। গভর্নমেন্ট ফিটজেরাল্ডের (Fitzgerald) মস্তকের জন্য ১০০০ পাউন্ড পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। Fitzgerald তখন এক বন্ধুর গৃহে লুকাইয়া মেজর স্যার (Major Sir) এর নেতৃত্বে এমন সময়ে একজন সৈন্য গিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। বীর সে একা মরিবে কেন? বিনা যুদ্ধে ধরা দিবে কেন? সেই অবস্থায় Fitzgeraldকে যখন ধরা হইল তখন তিনি আহত, আততায়ী দুইজনও আহত হইয়াছিল।

৪ জুন তাঁহার জেলে মৃত্যু হয়। টমাস এমেটকে এই সকল ধরপাকড়ের ফলে জেলে যাইতে হয় ; কিছুদিন পরে তিনি মুক্তিলাভ করিয়া আমেরিকায় গিয়া বাস করেন। এইদিকে টোন ট্যাডি প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ কতকগুলি ফরাসি রণপোত লইয়া আয়র্লন্ডের উপকূল আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিলেন।

হোফের মৃত্যু হইয়াছিল ; নেপোলিয়ন আইরিশ সমস্যার প্রতিবিধানের দিকে বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছিলেন না। টোন অনেক চেষ্টা করিয়া অ্যাডমিরাল ঝলার্ড প্রভৃতি কয়েকজনকে লইয়া আয়র্লন্ডের উপকূল আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধের পূর্বে অ্যাডমিরাল কম্মার্ড টোনকে পলায়ন করিবার পরামর্শ দিলে, তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন। তাঁহার ফাঁসির আদেশ হইল। ধার্য দিনের আগের দিন ১১ নভেম্বর তিনি আত্মহত্যা করিয়া ফাঁসির অপমান হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। তাঁহার চরিত্রের মধ্যে একটা দুর্দম পৌরুষ ছিল, তাই আয়র্লন্ডের লোকের হৃদয় হরণ করিয়া লইয়াছিল। Fitzgerald এর চরিত্রের মধ্যে যে একটি মাধুর্য্য, একটা সরল বীর্য্য ছিল হয়ত তাহার জন্য তিনি নেতৃত্বের পদের উপযুক্ত হইতে পারেন নাই কিন্তু তাঁহার আভিজাত্যহীনতা, ত্যাগ দ্বারা তিনি আয়র্লন্ডের জনসাধারণের চিরদিনের জন্য আদর্শ হইয়া আছেন।

একে একে সকল নেতাই অবসর গ্রহণ করিলেন। কিছুদিনের জন্য আয়র্লন্ডের অবস্থা খারাপ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। রবার্ট এমেট তখনও কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই। গভর্নমেন্ট বিদ্রোহ দমনের ছলে অত্যাচারের সুযোগ পাইলেন। মানুষের মনে যে পাশব প্রবৃত্তি আছে তাহা অবারিত সুযোগ পাইল।

যে সত্য লাভ করে নাই সে এখনও অত্যাচারকে ভয় করিয়া, অত্যাচারের সম্মুখে মাথা নত করিয়া নিজের ন্যায্য অধিকার ত্যাগ করে। আয়র্লন্ড যদিও ধীরে ধীরে জাতীয়ভাবে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল তবুও সে তখন পর্যন্ত আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে নাই। তাই কাপুরুষতা, দেশদ্রোহীতা, বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া অর্থের বিনিময়ে দেশের স্বাধীনতা বিক্রয় করিবার জন্য লোকের অভাব হয় নাই।

বৃটিশ রাজনৈতিকদল তখন আয়র্লন্ডকে যে কোন মূল্যে ক্রয় করিবার উপায় করিলেন। আইরিশ সেক্রেটারী কাশলরিয়াঘ (Cashlereagh) উৎকোচ দিয়া আইরিশ

পার্লামেন্টের স্বাধীনতা ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিলেন। এতদিন নামেই হোক না কেন আইরিশ পার্লামেন্ট কিছু স্বাতন্ত্র্য উপভোগ করিয়া আসিয়াছিল। ১৮০০ খৃঃ অব্দে ১৫ জানুয়ারি আইরিশ পার্লামেন্টের যে উপবেশন হয় ; তাহাতে Cashlereagh এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, যে উভয় পার্লামেন্টের স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজন না থাকায় তাহার পূর্বে পার্লামেন্টের সদস্যগণকে আড়াই কোটি টাকা দিয়া (১৫ লক্ষ পাউন্ড) ক্রয় করা হইয়াছিল।

দেশপ্রাণ স্বাধীনতা প্রয়াসী মুষ্টিমেয় নেতৃবৃন্দ এ অবস্থায় কি করিবেন স্থির করিতে পারছিলেন না। হঠাৎ Grattan এর কথা মনে হইলে কিছুদিন আগে গভর্নমেন্ট ও উগ্রপন্থী কোনো দলের সহিত মতের মিল না হওয়ায় তিনি রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। গভর্নমেন্টও নানা কারণে তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিল। তাঁহার ছবি ট্রিনিটি কলেজ হইতে অপসারিত করা হইয়াছিল, গভর্নমেন্টের অধীনে যে যে পদ তিনি অধিকার করিয়াছিলেন—সবগুলো হইতে তাঁহাকে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। যদিও দেশের উগ্রপন্থীদের সহিত তাঁহার কোনো ঐক্য ছিল না তবুও তখন পর্যন্ত তিনি দেশের আদর্শ নেতা বলিয়া সম্মানিত হইতেন। দেশের স্বাধীনতা তিনিই আনিয়াছিলেন, আজও যখন সেই স্বাধীনতা হরণ করিবার চেষ্টা হইল, দেশ তাহাকে নেতৃত্ব পদে বরণ করিল।

গ্রাটন তখন মরণাপন্ন, বার্ধক্যে, রোগে শয্যাগত। হঠাৎ পার্লামেন্টের একজন সদস্যের পদ খালি হইল। ব্যবস্থা হইল ১৫ জানুয়ারি যে অধিবেশন হইবে গ্রাটন সেইদিন সদস্য পদপ্রার্থী হইয়া সভায় উপস্থিত হইবেন। ১৫ জানুয়ারি আইরিশ পার্লামেন্টের শেষ অধিবেশন হইল। Speaker নূতন সদস্যকে সম্মিলনীর সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিতে আহ্বান করিলেন। গ্রাটন উত্থানশক্তি রহিত, তাঁহাকে চেয়ারে শয়ান অবস্থায় আনা হইল। সম্মুখে হঠাৎ গ্রাটনকে ফিরিতে দেখিয়া সভা নিস্তব্ধ হইয়া গেল ; ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা সমরের নেতা যেন আবার দেশের দুর্দিনে ফিরিয়া তাহার পর জনসাধারণে আসিয়াছে, সে এক অপূর্ব অভিনন্দন। রবার্ট এমেট তখন দর্শকগণের গ্যালারীতে বসিয়াছিলেন।

গ্রাটন বসিয়া বক্তৃতা করিলেন। তর্কযুক্তি বলিয়া তিনি উভয় পার্লামেন্টের মিলনের বিরুদ্ধে বলিলেন। ২৬ মে পর্যন্ত পার্লামেন্টের শেষ অধিবেশন হইল। গ্রাটনের শেষ উক্তি--Against such aproposition were I expiring on the floor, I should beg to litter my last breath a record my dying testimony. I will remain faithful to her freedom, faithful to her fall.—এইখানে যদি আমার মৃত্যুও আসে তবুও এইরূপ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আমার শেষ প্রতিবাদ আমি করিয়া যাইব, দেশের স্বাধীনতার দিনে যেমন আমি তাহার পক্ষে, দেশের পতনের দিনেও আমি তাহার বিপক্ষে যাইব না।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। উৎকোচের সম্মুখে তাঁহার অপূর্ব বাগ্মিতাও ব্যর্থ হইল। যেইদিন মিলনের বিবাদের শেষ নিষ্পত্তি হইবে স্থির হইল সেইদিন সভাগৃহ পূর্ণ

হইয়া গেল, উৎসুক শঙ্কিতহৃদয় জনসাধারণ উৎকণ্ঠিতচিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। যখন speaker ডাকিলেন যদ্দারা মিলনের পক্ষে তাহারা হাত তুলুক তখন নির্লজ্জ সদস্যগণ একে একে হাত তুলিল।

—আইরিশ পার্লামেন্টের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল এবং সে বিলোপ আয়র্লন্ডেরই সন্তানকৃত।

সেইদিন দর্শকগণের মঞ্চে বসিয়া একজন যুবক—সকলে কথায় যাহা বলিতেছে কিন্তু কাজে কিছু করিতেছে না তাহাই কর্মে ফুটাইয়া তুলিবার সংকল্প লইয়া গৃহে ফিরিয়াছিল।

দেশের হারান স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনিবার প্রতিজ্ঞা রবার্ট এমেট সেইদিন করিলেন।

আয়র্লন্ড আজিও তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত আইরিশ কবি আজিও তাঁহার গান গাহে।

এমেট ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ডাবলিনে কোন সমৃদ্ধ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রবার্ট এমেট আইরিশ লর্ড লেফটেন্যান্টের গৃহচিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা টমাস এমেটের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ট্রিনিটি কলেজে প্রবেশ করেন। বাল্যকালেই তাঁহার প্রতিভা স্ফূর্তি লাভ করিয়াছিল। যখন তিনি ১২ বৎসরের বালক তখনই অঙ্ক ও রসায়নে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। একদিন তিনি একটি রাসায়নিক পরীক্ষা করিবার পরে অঙ্কের একটি জটিল সমস্যার সমাধান করিতে করিতে মুখে আঙ্গুল দিয়া ফেলিয়াছিলেন—হাতে করোসিভ সাব্লিমেট নামক তীব্র বিষ লাগিয়াছিল। পেটের ভিতর যে ভীষণ যন্ত্রণা আরম্ভ হইল, তাহাতেই তিনি নিজের বিপদের কথা বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু প্রকাশ করিলে যদি পাছে পরে রাসায়নিক পরীক্ষা বন্ধ হয়, এই ভয়ে তিনি কাউকেও কিছু না বলিয়া পিতার পুস্তক খুঁজিয়া ওষুধ বাহির করিয়া প্রয়োগ করিলেন। সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। পরদিন শিক্ষক তাঁহার আকৃতি দেখে প্রশ্ন করিতে সকলই বলিতে হইল কিন্তু তখনও বলিলেন, রাত্রে ঘুম না হওয়ায় একটি ফল হইয়াছে যে, অঙ্কের সমাধান হইয়াছে। যে বালক এ কথা বলিতে পারে তাহার হৃদয়ে যে বীর্য্যকুণ্ড রহিয়াছে তাহা যে জাগিয়া একদিন আয়র্লন্ডকে দুর্দিনে নেতৃত্ব করিবে তাহা বোঝা যায়।

কবি ইমামসুর ছিলেন এমেটের সহপাঠী, তিনিই পরে আইরিশ জাতীয় কবির আসন লাভ করেন। এমেটের প্রভাব তাঁহার জীবনে ও কাজে অনেকখানি আসিয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার বিখ্যাত Irish melodies আইরিশগাঁথা এমেটের স্মৃতিপূজায় দেশপ্রেমে পরিপূর্ণ।

কলেজ জীবনেই এমেট রাজনীতির চর্চা আরম্ভ করেন। তাঁহার চরিত্রের মধ্যে একটি সতেজ, সরলতা ছিল তাহা তাঁহার সহপাঠীগণের চিত্ত অধিকার করিয়াছিলেন। পরদুঃখকাতরতা আভিজাত্যের বিপক্ষে বিদ্রোহ তাঁহার অধ্যয়নকালেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই সময়েই তিনি বাগ্মিতা দ্বারা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার জীবনে যে একটি অপূর্ব শুচিতা ছিল মৃত্যুর দিনেও সেই শুচিতার অপমান তিনি হইতে দেন নি।

তাঁহার চরিত্রের মধ্যে যে কোমলতার সহিত কঠোরতার মিলন হইয়াছিল, মূর তাহাই উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—'He was altogether a noble fellow, and as full of imagination and tenders as of manly dwing'.

১৯৯৭ খৃঃ রবার্ট ও টমাস এমেট ওকনার প্রভৃতি নেতাগণ 'The Press' নামে একটা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। মূর তাহাতে লিখিতেন।

এমেট ও মূরের জীবনের মধ্যে যে ঐক্য অনেকখানি ছিল তাহা নহে কিন্তু তবুও এমেট মূরকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। অনেকদিন তাহারা দু'জনে বসিয়া পিয়ানো বাজাইতেন। একদিন মূরের গৃহে মূর 'Let drin remember' নামক জাতীয় সঙ্গীত পিয়ানোতে বাজাইতেছিলেন—এমেট শুনে উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—'Oh that I were at the head of Twenty thousand men marchin to that air'.

১৭৯৮ খৃঃ আইরিশ ষড়যন্ত্রের প্রকাশের পরেই আয়র্লন্ডের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। এমেট তখনও Trinity College এর ছাত্র। কলেজ কর্তৃপক্ষেরা ছাত্রদের রাজনৈতিক মতবাদ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তখন এমেট এই ব্যবহারের প্রতিবাদ স্বরূপ কলেজ ছাড়িলেন।

United Irishmen এর সহিত তিনি পূর্ব হইতে যুক্ত ছিলেন। এইবার তিনি পূর্ণভাবে তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। ১৭৯৯ খৃঃ তাঁহার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট বাহির হইয়াছিল। ১৮০০ সালে তিনি ইউরোপে ভ্রমণ করেন। এই সময়েই তিনি ১৭৯৮ খৃঃ অব্দের বিদ্রোহের পর নির্বাসিত নেতৃবৃন্দের সহিত দেখা করেন। ১৮০২ খৃঃ তিনি নেপোলিয়নের সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখনই তিনি বুঝিতে পারেন যে অ্যামিএঁর সন্ধি বেশিদিন টিকিবে না। সে সময়ে যে খুব একটা সুযোগ আসিয়াছিল, নেপোলিয়ন পরে তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তখন তাহার কোন বিশেষ ব্যবস্থা করে নাই। এমেট তখন মনে করিয়াছিলেন যে, ১৮০৩ খৃঃ ফ্রান্স আয়র্লন্ডের সাহায্যে যোগ দিবে এ আশা সুদূরপরাহত নয়। তাই ১৮০২ সালের নভেম্বর মাসে তিনি দেশে ফিরিলেন, এই বিশ্বাস লইয়া যে ১৮০৩ সালে আগস্টে ফ্রান্সের সৈন্য আয়র্লন্ডের সাহায্যে আসিবে।

দেশের সর্বত্র একটা বিদ্রোহের ব্যবস্থা করিয়াই তখন তাঁহার কাজ হইল। তাঁহার মনে হইল ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের চেষ্টা বিফল হইয়াছিল তাহার কারণ রাজধানীতে বিশেষ সাড়া পাওয়া যায় নাই। তাঁহার লক্ষ ছিল রাজধানী বিশেষ করিয়া Castle অধিকার করা। দিন রাত্রি তিনি এই কাজে ঘুরিতে লাগিলেন। সর্বত্র কর্ম পরিদর্শন করা, লোককে তৈরি করা ছিল তাঁহার কাজ। ডাবলিনে নানাস্থানে বাড়ি ভাড়া করা হইল। অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করা হইতে লাগিল। বিশ্রাম তাঁহার ছিল না ; মাঝে মাঝে শুধু কোন কারখানার মেঝেতে একখণ্ড মাদুরের উপর কিছুকালের জন্য বসিয়া থাকা।

আয়র্লন্ডে আসিয়াই তিনি শুনিয়াছিলেন যে যদি ডাবলিনের চেষ্টা সফল হয় তবে ১৭টি কাউন্টি যোগ দিবে, তাহারা প্রস্তুত আছে।

প্রায় এক হাজার লোক এই আয়োজনে যুক্ত ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজনও বিশ্বাসঘাতকতা করে নাই। গভর্নমেন্ট ঘুর্ণাক্ষরেও কিছু জানিতে পারেন নাই।

১৮০৩ খৃঃ মে মাসে যখন ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের আবার যুদ্ধ বাঁধিল, তখন এমেটর আশা তাহা সুদূরপরাহত বলিয়া মনে হইল না যে আয়র্লন্ডকে ফ্রান্স সাহায্য করিবে।

আয়োজন চলিতেই লাগিল। এমেট নিজের যাহা কিছু ছিল সকলই দিয়াছিলেন। কেউ অর্থ গ্রহণ করে নাই। তবুও অস্ত্র সংগ্রহ ইত্যাদিতে খরচ হইয়াছিল।

আয়োজন তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই ; এমন সময়ে একদিন হঠাৎ এমেটের এক বারুদের কারখানায় আগুন লাগিল। এতদিন গভর্নমেন্ট সুপ্ত ছিল, আজ তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিল। তখন আর ফ্রান্সের সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করা আর চলে না কারণ রাজশক্তি তাহার আগেই যে কোন উপায়েই তাঁহাদের চেষ্টাকে সমূলে ধ্বংস করিবে।

২৩ জুলাই রবার্ট এমেটের লিখিত আয়র্লন্ডের জনসাধারণের প্রতি উক্তি ডাবলিনে রাজপথে দেখা দিল। সেইদিন সন্ধ্যায় যখন ডাবলিন ক্যাসল আচমকা আক্রমণ করিবার আয়োজন হইল তখন এমেট দেখিলেন কত লোক মিথ্যা দেশপ্রেম লইয়া তাঁহার সহিত যোগ দিয়াছিল।

অনেকে বিশ্বাসঘাতকতা করিল, অস্ত্র আনিবার জন্য যাহাকে অর্থ দেওয়া হইল সে অর্থ লইয়া পালায়। Wicklow Country হইতে যে দল আসিয়া যোগ দিবে স্থির ছিল তাহারা আসিল না। সর্বত্র একটা গোলমালের সৃষ্টি হইল। যাহারা এতদিন মুখে সাহস দেখাইয়াছিল আজ কর্মের সম্মুখে তাহারা পিছাইয়া দাঁড়াইল। Kildare হইতে যে দল আসিতেছিল পথে দিন পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে শুনিয়া তাহারা ফিরিয়া গেল। কিন্তু বীর নয় যাহার কাছে জীবন মরণ সমান হইয়া উঠে, আদর্শের সাধনে সে কি ঘোরে। সেই মুষ্টিমেয় অনুচর লইয়া এমেট অগ্রসর হইলেন। তাহাদের সংখ্যা ৮০ জন মাত্র। কিন্তু ক্যাসেলের সম্মুখে আসিয়া যখন এমেট বুঝিতে পারিলেন আর অগ্রসর হওয়া বৃথা, তখন তিনি ফিরিলেন।

পরদিন Cicklow পর্বতে এক মন্ত্রণা সভা হইল।

এমেট নিজেদের দৌর্বল্য কোথায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন ; তাহার ভুল ভাঙ্গিয়াছিল। এই অশিক্ষিত মুষ্টিমেয় বিদ্রোহীকে লইয়া শত্রুর সম্মুখে অগ্রসর হওয়া যে বাতুলতা মাত্র, তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়া সহকর্মীদের বুঝাইলেন যে এখন চেষ্টা ক্ষান্ত রাখিতে হইবে। বৃথা রক্তপাত করার কোন প্রয়োজন নাই ; জাতি অনেক সহিয়াছে।

তখন সকলে এমেটকে কিছুকালের জন্য আয়র্লন্ড ত্যাগ করিতে বলিল, কিন্তু তিনি অস্বীকার করিলেন।

এই অস্বীকার করিবার পিছনে তাঁহার জীবনের একটি রোমান্স জড়িত আছে। তাই শেষে তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল।

ডাবলিন পুলিশ তাঁহার পিছনে কিন্তু তিনি আয়র্লন্ড ছাড়িতে পারিলেন না। একটি মেয়েকে তিনি ভালোবাসেন তাহার সহিত একবার দেখা না করিয়া তিনি যাইতে

পারিলেন না। এই তরুণী তখনকার আয়র্লন্ডের খ্যাতনামা ব্যারিস্টার John Philop Berran এর কন্যা 'সারা'।

পুলিশ আসিয়া এমেটের গৃহরক্ষিকার উপর অত্যাচার করিতে লাগিল, কিন্তু সেই ছোট্ট মেয়েটির হৃদয়ে দেশপ্রেম এমেট–ই আনিয়া দিয়াছিল। তিনি তাহার চক্ষে দেবতা। সে শত অত্যাচারের সম্মুখেও প্রভুর গোপনবাসের কথা বলিল না।

কয়েকদিন Wikclow Mountains–এ গোপনে থাকিয়া আমেরিকায় যাইবার পূর্বে সারার সহিত শেষ দেখা করিবার জন্য এমেট Harlodi Lross এ, Mrs. Patmer এর গৃহে আসিলেন। সারাকে আমেরিকায় যাইবার জন্য বলিলে তিনি স্বীকার করিলেন না। ২৫ আগস্ট পর্যন্ত তিনি সেইখানে ছিলেন। সেইদিন Major Sirr (যিনি Fitzgrald–কে ধরিয়াছিলেন) তাঁহাকে ধরিলেন।

কিন্তু বীর বিনাযুদ্ধে ধরা দেন নাই।

তাঁহাকে আহত করিয়া ধরা হইল। যখন Major এই আঘাতের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন তখন পুরুষেরই মত বীর্য্যের সহিত তিনি উত্তর করিলেন 'All is fair in war' (সমরে সবই সুন্দর)।

জেলেও এমেট 'সারাকে' শেষ বিদায়ের চিঠি লেখেন। জেলারের হাতে সে চিঠি পড়ায় সে তাহা Attorney General এর কাছে লইয়া গেল। তাহা জানিতে পারিয়া শেষে নিজের প্রিয়কে বিচারালয়ে আনিতে হইবে এই ভয়ে, এমেট Attorney Generalকে লিখিলেন যে যদি 'সারার' চিঠির কোন উল্লেখ না করা হয় তবে তিনি অপরাধ স্বীকার করিবেন। তিনি জানিতেন গভর্নমেন্ট তাঁহার বাগ্মিতাকে কতখানি ভয় করে! কিন্তু প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল না। তাহার পরদিন যখন পুলিশ কুরাণের গৃহ অনুসন্ধান করিতে গেল তখন কুরাণ বুঝিতে পারিলেন তাহার কন্যার সহিত এমেটের কতখানি গভীর সম্বন্ধ ছিল।

বিচারের ফল যে কি হইবে সে বিষয়ে এমেট বা কাহারো মনে কোন সন্দেহ ছিল না। এমেটের শেষ বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন 'Sentence was already pronounced at the castle before the jury was empanelled' 'জুরীকে আহ্বান করিবার আগেই ক্যাসেলে আমার দণ্ড উচ্চারিত হইয়া গিয়াছে।' জেলের গভর্ণর একদিন আসিয়া দেখেন এমেট 'সারার' একগুচ্ছ চুল লইয়া সাজাইতেছিলেন, তখন এমেট তাহার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—I am preparing it to take with me to the Scaffold. (মৃত্যুর আঙ্গিনের সাক্ষী এই কেশগুচ্ছ তাই তাহাকে গুছাইয়া রাখছি)। তাঁহার কক্ষে টেবিলের উপর তাঁহার স্বহস্তকৃত একটি ছবি পাওয়া গেল তাহাতে তাঁহার মস্তক দেহ হইতে ছিন্ন করা হইয়াছে, তাই দেখানো হইয়াছে।

বেলা ১০টার সময় বিচার আরম্ভ হইল। Attorney General বক্তৃতায় বলিলেন, বিদ্রোহের ব্যর্থতায় বোঝা যায় যে আয়র্লন্ড ... ইংল্যান্ডের সহিত কতখানি যুক্ত থাকিতে চায়। তাহার উত্তরে এমেট ২৩ জুলাই যে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছিলেন তাহাই পাঠ করিতে বলিলেন।

তাহার পর দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক Leonord Macnally ও Plumkett এর তাঁহার বিরুদ্ধে বক্তৃতা হয়। Plumkett পূর্বে এমেটর দলভুক্ত ছিলেন কিন্তু আজ তিনি গভর্নমেন্টের পক্ষে দাঁড়াইয়া এমেটর বিরুদ্ধে নির্লজ্জভাবে বলিলেন। তাহারপর এমেটের শেষ বক্তৃতা।

মরণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নির্ভীক বীর একে একে গভর্নমেন্টের অভিযোগের এক একটি লইয়া উত্তর দিতে লাগিলেন।

এমন কোন আইরিশ নাই যে সে বক্তৃতা পুনঃপুন পড়ে নাই।

তিনি বলিলেন—যদি শুধু মরিতে হইত তবে তিনি নতমস্তকে সে দণ্ড গ্রহণ করিতেন, কিন্তু যে দণ্ড তাঁহার দেহ ছিন্ন করিবে, তাহা যে শুধু তাহা করিয়া ক্ষান্ত হইবে না, তাহা তাঁহার চরিত্রে, আদর্শে কালিমা লেপন করিতে চেষ্টা করিবে। তাঁহার আদর্শের অপমান তিনি কিছুতেই সহ্য করিবেন না।

যাহাতে আমার নাম অমর হইয়া আমার দেশবাসীর শ্রদ্ধাবিনত হৃদয়ে চিরদিন জাগরূক থাকিতে পারে তাহার জন্য আমি আমার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলি খণ্ডন করিবার এই সুযোগ গ্রহণ করিয়াছি। যখন আমার আত্মা আনন্দধামে উপস্থিত হইবেন। যে সকল বীর দেশের জন্য, ধর্মের জন্য রণক্ষেত্রে বা ফাঁসি কাষ্ঠে রক্ত দান করিয়াছেন তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবে তখন এই আমার আশা, এই আমার প্রার্থনা যে আমার নাম আমার স্মৃতি আমোর দেশবাসীকে হৃদয় অভয় করিয়া তুলিবে।

যে রাজশক্তি বিধাতার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া নিজের রাজ্য অক্ষুণ্ন রাখে, যে রাজশক্তি বনের পশুরই সমানভাবে মানুষের প্রতি নিজের শক্তি দেখায়, যে শক্তি মানুষকে তাহার ভ্রাতার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া, যে তাহার সহিত ভিন্নমত তাহার বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি ভগবানের নামে চালিত করিয়া, যে রাজশক্তি শত শত নারীকে বিধবা ও শত শত অনাথ করিয়া রাখিয়াছে—তাহাদের অশ্রুজলেও যে বর্বর রাজশক্তি পাষাণ হইয়া আছে আমি আজ সুখে সেই রাজশক্তির ধ্বংস লক্ষ্য করিয়াছি।

That mine may not perish—that it may live in the respect of my Countrymen, I seizeupon this opportunity to vindicate myself from some of the charge alleged against me. When my spirit shall be wafted to a more friendly post—when my shade shall have joined the banns of there martyred heroes who have shed their blood on the Scaffold and in the field in defence of their country and of virtue this is my hope—I wish that my memory and name may animate those who survive me while I look down with com-lacency on the destruction of that perfidious Government which phoids its domination by the blasphemy of the Most High, which displays its power over man as over the best of the forests, which sets man upon his brother and lifts his hand, in the name of God, against the throat of his fellow who belives or doubts a little more than the Govt. standard,—a Govt steeled to barbarity by the cries of the orphans and the tears of widows which it has made.

তাঁর আশা পূর্ণ হইয়াছিল।

মৃত্যু শিয়রে, তবুও এই বক্তৃতা দিবার সময় তাঁহার স্বর কিছুমাত্র কম্পিত হয় নাই। Times লিখিয়াছিলেন—কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে রবার্ট এমেটের কথা বলিতে হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে শত ভুলের মাঝখানেও তিনি নিজের মহত্ত্ব হারান নি। বিচারের দিনে মৃত্যু তখন তাঁহার যে বাগ্মিতা অপূর্ব অমানুষিক মনে হইয়াছিল। সে বাগ্মিতা যেন যে কক্ষে তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন তাহার ভিত্তি পর্যন্তও কাঁপাইয়া দিয়া গেল। But as to Robert Emmet individually it will swoly be admitted even in the midst of error he was greet. And that the burst of eloquence with wich, upon the day of his trial with the grave already open to receive him he shook the very court where in he stood and consed not only 'That viper whome his father nowished (Mr. Phunkett) to quall beneath the lash but like voice forced that remnent of humanitty' lord Norbery who tried him to tremble on the judgement seat, was an effort almost super-duman.

তিনি বলিলেন তাহার সকল কর্মের মধ্যে শুধু লক্ষ্য ছিল দেশের মুক্তিলাভ এই দীর্ঘ অমানুষী অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাহাকে পুনরায় স্বাধীন করা। আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা যাহারা আয়র্লন্ডের মুক্তিকামী তাহাদের মধ্যে আমার স্থান হয়; সেখানে বল প্রতাপ নাই—ক্ষতি লাভ নাই, আছে শুধু মুক্তির আনন্দ পরিপূর্ণতার তৃপ্তি।

My conduct has been through all this peril and through all my purposes governed only by the convictions which I have uttered, and by no other view than that of their care and the emancipation of my country from the supperhuman oppreštion under which she has so long and to hatientty travailed.

'... and my ambition was to hold a place among the deliverers of my country not in power not in profit, but in the glory of the achievement.'

তিনি বলিলেন—তিনি ফ্রান্সের গুপ্তচর ছিলেন না। ফ্রান্সের সাহায্য চাহিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সে not to relieve new task masters but to expel old tyrants (নূতন রাজার প্রজা হইবার জন্য—সে অত্যাচারীর উৎপীড়ন দমন করিবার জন্য) তিনি বলিলেন—

(I) My country was my idial, to it I sacrificed every selfish, every endearing sentiment and for it now I now offer my life, ... Let no man dare, when I am dead, to charge me with dishonour, let no man attain my memory by believing that I could have engaged in any cause out of my country's liberty and independence of that I became the pliant mission of power in the opression the miscries of my countrymen.'

তাঁহার শেষ কথা—My lord—you are impatient for the sacrifice—the blood which you seek is not congealed by the artificial errors which surround your victim ; it circulates war my and unruffle

through the cannels which God created for nobler purpose but which you are bent to hestroy for purpose so [...] that they cry to heaven ; [...] patint!. I have but a few word more to say. I am going to my cold and silent grave. My lamp of life is [...] extinguished my race is run, the grave opens to receive me and I sink into its bosom. I have but one request to ask at my departure from this word, it is the charity of its silence. Let no man write my epitaph ; for as no man who knows my motives dare now vindicate them. Set them prejudice of ignorance asperse them. Set them and me repose in obscurity and peace and my tomb remain uninscribd, untill other times and other man can do justice to my charachter when my country takes her place among the nations of the earth—then and not till then let my epitaph be written. I have done.

(১) আমার আয়র্লন্ড মূর্ত দেবতা। তারই বেদীতলে নিশিদিন যা কিছু আমার প্রিয়, যা কিছু আমার বাসনা সব অঞ্জলি দিয়ে এসেছি ; এখন এই আমার শেষ নিবেদন, এই আমার প্রাণ। মৃত্যুর গহনতম পারাবারে যখন লুপ্ত হব কেউ যেন আমার নাম ধুমাঙ্কিত না করে—কেউ যেন না বলে দেশের মুক্তি কামনা ভিন্ন অন্য কামনা আমার ছিল, কেউ যেন না ভাবে আমি আমার দেশবাসীর দুঃখজ্বালা অত্যাচারী রাজার অত্যাচারের নিকট নতমস্তক ছিলাম।

(২) বলির বিলম্বে অন্তর চঞ্চল আপনাদের। যে রক্তের জন্য আপনারা লোলুপ—সে ভীরুর রক্ত নয়—মিথ্যা ভয়ের সামনে শিরায় উপশিরায় তার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় না। সে তেমনি উষ্ণ ধারায়, তেমনি গতিতে দেহে প্রাণে সঞ্চারিত হচ্ছে। যাবার বেলায় আর দুটি কথা বলে যাই! আজ মৃত্যুর গহনতম তুহিন শীতল কোলে স্থান পেতে চলেছি! আজ জীবনপ্রদীপ নির্বাণোন্মুখ! জীবনের খেলা আজ সাঙ্গ হলো, মরণের খেলা শুরু হলো! যাবার বেলায় শুধু এইটুকু চাই—জীবন মরণের এই মহামিলন যেন কোলাহলকলুষিত করো না—আমায় দিও শুধু অনন্ত নীরবতা। আমার সমাধিস্তম্ভে কোন গাথা যেন না থাকে—কোন স্মারক যেন না লেখা হয়। তারপর সে কোন শুভদিন যখন জগতের মহাসভায় আয়র্লন্ড নিমন্ত্রিত হবে—যখন সবার নামের সাথে তারও নাম বেজে উঠবে, তখনই আমার সমাধিস্তম্ভে স্মৃতিলিপি গাথা হবে তার আগে নয়! আর কিছু নয়।

লর্ড নরবেরী দণ্ড উচ্চারণ করিলেন। এমেট পরদিন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। যখন বন্দীকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইল, তখন রাত্রি দশটা। একজন পরিচিত বন্ধুর সেলের সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে এমেট বলিলেন I shall be hanged to-morrow. গবর্নমেন্ট শেষে তাঁহার উদ্ধারের জন্য লোকে জেল আক্রমণ করে এই ভয়ে দুই মাইল দূরে অন্য একটি জেলে লইয়া গেল। তখনও পর্যন্ত তাঁহার হাতে হাতকড়ি পরান ছিল। সেই যে বেলা দশটার আগে তাঁহাকে কিছু খাইতে দেওয়া হইয়াছিল তাহার পর এ পর্যন্ত কিছুই দেওয়া হয় নাই।

এমেট তাহার পর কিছুক্ষণ শান্ত হইয়া ঘুমাইলেন। জাগিয়া তিনি ভাই টমাসকে আমেরিকায় একখানা, সারাকে একটি ও তাহার ভাইকে একখানি চিঠি লিখিলেন।

তাঁহার এক বন্ধু শেষ বিদায় নিতে আসিয়াছেন। তাহার কাছে নিজের মাতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন এতদিনের দুর্দিনে যাঁহার স্নেহ তাঁহাকে এতদিন ঘিরিয়াছিল, গত রাত্রে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এমেট শান্ত স্বরে উত্তর দিলেন ভালোই হইয়াছে।

সারার ভাইকে লিখিয়াছিলেন--I did not look to honours for myself—praise I would have asked from the lips no man ; but I would have wished to read in the glow of Sara's Countenance that her husband was respected.

আত্মগৌরব কোনদিনই চাই নাই—অন্যের প্রশংসার কোনদিন মুখাপেক্ষি ছিলাম না—শুধু 'সারা'র অন্তর-আলোকে নিজেকে নিশিদিন মনে পবিত্র রাখিয়াছিলাম। চিঠির মধ্যেও কোথাও কোন দুর্বলতা প্রকাশ পায় নি—তাহা আগেকার দিনের লেখারই মত সবল, সতেজ।

একটার সময় তাঁহাকে বধ্যভূমিতে নিয়া যাওয়া হইল। তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্য সকলকে এতদূর অভিভূত করিয়াছিল যে একজন ওয়ার্ডার তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার সময়ে অশ্রু সংবরণ করিতে পারে নাই। এমেটের হাত বাঁধা ছিল তিনি নত হইয়া তাহাকে স্পর্শ করিলেন। জেলারের হৃদয় কুড়ি বৎসরের দাসত্বে কঠিন হইয়াছিল সেও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া তাঁহার পায়ের কাছে মাথা লুটাইয়া দিল। মঞ্চে উঠিবার আগে সারার চিঠিটা একজন বন্ধুর হাতে দিলেন। সে চিঠি সারার হাতে পড়িতে পারে নাই।

তাহার পর ধীরে ধীরে মঞ্চে উঠিয়া কণ্ঠরজ্জু নিজের হাতে পরিয়া নিলেন।

২০ সেপ্টেম্বর ১৮০৩ খৃঃ তাঁহাকে হত্যা করা হয়। তখন তাঁহার বয়স ২৩ বছর মাত্র।

পদানত আয়র্লন্ড তাঁহার শেষ অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিল ; তাঁহার সমাধির উপর কোন স্মারকচিহ্ন দেয় নাই। যে দিন তাহা দিবার সময় হইবে এখনো সেদিন আসে নাই।

এমেটের মৃত্যুর অল্প দিন পরেই সারার মৃত্যু হয়।

গ্রন্থ-পরিচয়

['নজরুল-রচনাবলী'-র বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশকাল ও কতকগুলি রচনা সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য নিম্নে পরিবেশিত হলো। 'পুনশ্চ' শিরোনামে পরিবেশিত তথ্য নতুন সংস্করণের (১৯৯৩) সম্পাদনা-পরিষদ কর্তৃক সংযোজিত। 'জন্মশতবর্ষ সংস্করণের (২০১০) সংযোজন' বর্তমান সংস্করণের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক যোগ করা হয়েছে।]

গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা ও গান

এই পর্যায়ে নতুন সংস্করণ *নজরুল-রচনাবলীতে* আবদুল কাদির-সম্পাদিত *নজরুল-রচনাবলী* থেকে নিম্নলিখিত ক্রম-অনুসারে কবিতা ও গান সংকলিত হয়েছে :

প্রথম খণ্ডের সংযোজন অংশ ;

তৃতীয় খণ্ডের সংযোজন অংশ ;

চতুর্থ খণ্ডে মুদ্রিত *শেষ সওগাতে* সংযোজিত 'মহাত্মা মোহসিন' কবিতা, *ঝড়* কাব্যের সঙ্গে মুদ্রিত সংযোজন অংশ এবং *সঙ্গীতাঞ্জলি* নামে সংকলিত কবিতা ও গান ;

পঞ্চম খণ্ডের প্রথমার্ধে মুদ্রিত অগ্রনায়ক, মৃত তারা, কিশোর, সন্ধ্যামণি, গীতি-বিচিত্রা ও নবরাগমালিকা নামে সংকলিত কবিতা ও গান।

তাছাড়া বর্তমান সংস্করণে নতুন করে যুক্ত হয়েছে :

আবদুল আজিজ আল-আমান-সম্পাদিত *অপ্রকাশিত নজরুল* (কলিকাতা : হরফ প্রকাশনী, ১৩৯৬) থেকে নির্বাচিত অংশ ; এবং

ব্রহ্মমোহন ঠাকুর-সম্পাদিত অপ্রকাশিত নজরুল (কলিকাতা : হরফ প্রকাশনী, ১৩৯৯) গ্রন্থের নির্বাচিত অংশ/সকল গান।

সবশেষে

আবদুল কাদির-সম্পাদিত নজরুল-রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত চন্দ্রবিন্দু কাব্যের সংযোজন-অংশ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত নজরুল ইসলামের কবিতা ও গান সম্পর্কে *নজরুল-রচনাবলীর* বিভিন্ন খণ্ডে আবদুল কাদির যেসব তথ্য দিয়েছিলেন, নিচে তা সংকলিত হলো :

'বন্দনা-গান', 'চাষীর গীত' ও 'প্রেমের ছলনা' কবি কিশোর বয়সে স্থানীয় 'লেটো' (নট) দলের জন্য লিখিয়াছিলেন। 'চাষীর গীত' দুইটি ১৩৫৩ সালের ঈদ-সংখ্যা সাপ্তাহিক 'মিল্লাতে' প্রকাশিত হইয়াছিল।

'ভগ্নস্তূপ' ১৩২৯ আশ্বিনে ময়মনসিংহের মাসিক 'পল্লিশ্রী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। স্বনামখ্যাত কথাশিল্পী শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'আমার বন্ধু নজরুল' (১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫ তারিখে প্রকাশিত) পুস্তকে "১৯১৭ সালের বারোই এপ্রিল" (তখন নজরুল রানীগঞ্জের সিয়ারসোল-রাজ হাই স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র) তারিখে লেখা নজরুলের 'রাজার গড়' নামক কবিতার যে-চারটি স্তবক উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেগুলি হইতেছে 'ভগ্নস্তূপ' কবিতার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম স্তবক। শৈলজানন্দ লিখিয়াছেন :

> চুরুলিয়া গ্রামের বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড একটা মাটির ঢিপি আছে অনেক দিনের পুরানো। ... এখানে নরোত্তম নামে ছিল এক হিন্দু রাজা। বর্গীরা এসে আক্রমণ করেছিল সেই রাজার প্রাসাদ। আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল রাত্রির অন্ধকারে। পুড়ে মরেছিল সবাই। সোনার নগরী ছাই হয়ে গিয়েছিল দেখতে দেখতে। তারপর সেটা পরিণত হয়েছিল পাহাড়ের মত একটা মাটির ঢিপিতে। সেই মাটির ঢিপিটাকে নিয়েই নজরুল রচনা করেছিল তার প্রথম কবিতা। একটি কবিতার নাম দিয়েছিল 'রাজার গড়' আর একটির নাম দিয়েছিল 'রানীর গড়'।
>
> [আমার বন্ধু নজরুল, ১৮ পৃষ্ঠা]

উক্ত 'রাজার গড়' ও 'রাণীর গড়' সংযুক্ত ও সংশোধিত হইয়া 'ভগ্নস্তূপ' নামে আত্মপ্রকাশ করে। 'ভগ্নস্তূপ' নিখুঁত মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা নজরুলের 'প্রথম কবিতা'।

'চড়ুই পাখির ছানা' শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে' (১৩৬৭ ভাদ্রে প্রকাশিত) পুস্তকে সংকলিত। শৈলজানন্দ বলেন যে, কবিতাটি ১৯১৮ সালে [১৯৬০ আগস্ট "থেকে প্রায় বিয়াল্লিশ বছর আগে"] লেখা।

'করুণ গাথা' খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীনের 'যুগ-স্রষ্টা নজরুল' গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে।

'করুণ বেহাগ' ১৯৫৩ সালে ঈদ-সংখ্যা সাপ্তাহিক 'ওয়াতান'-এ প্রকাশিত হইয়াছিল।

'কবিতা-সমাধি' ১৩২৬ আশ্বিনের 'সওগাতে', 'ফুলছড়ি' ১৩৬৩ ভাদ্রের 'মাহে-নও'-এ, 'কালোর উকিল' ১৩২৭ জ্যৈষ্ঠের 'নূর'-এ, 'বকুল' ১৩২৭ আষাঢ়ের 'বকুল'-এ এবং 'আজান' ১৩২৮ বৈশাখের 'সাধনা'য় বাহির হইয়াছিল।

'মুকুলের উদ্বোধন' ১৩৬১ ভাদ্রের এবং 'লাল সালাম' ১৩৬০ ভাদ্রের 'মাহে-নও' পত্রিকায় 'একটি অপ্রকাশিত কবিতা' শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

'অদর্শনের কৈফিয়ৎ' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১লা অগ্রহায়ণ মুতাবিক ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর এবং 'আত্মকথা' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১৩ই মাঘ মুতাবিক ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারি তারিখে 'ধূমকেতু'তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'আনন্দময়ীর আগমনে' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ৯ই আশ্বিন মুতাবিক ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে ১ম বর্ষের ১২শ সংখ্যক 'ধূমকেতু'তে বাহির হইয়াছিল। এই কবিতাটির জন্য সে-সংখ্যা 'ধূমকেতু' বাজেয়াফ্‌ত হইয়া যায় এবং ধূমকেতুর সারথি নজরুল ইসলাম ২৩শে নভেম্বর কুমিল্লায় গ্রেফতার হন। কলিকাতার চিফ্ প্রেসিডেন্ট

ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সুইনহো'র এজলাসে নজরুলের বিচার হয় এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি তারিখে মোকদ্দমার রায় শোনানো হয় ; ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪–এ ধারা অনুসারে কবি এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করেন। সেদিন কবি প্রেসিডেন্সি জেলে ফিরিয়া যান। পরদিন ১৭ই জানুয়ারি সকাল বেলা তাঁহাকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে প্রেরণ করা হয়। সেখানে তিনি বিশেষ শ্রেণীর বন্দীর ব্যবহার পাইতেন। সেখান হইতে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল তারিখে কবিকে হুগলি সেন্ট্রাল জেলে বদলি করিয়া এবং সাধারণ কয়েদীর স্তরে নামাইয়া দিয়া কারাগারের পূর্বমুখীন ৫ নং কক্ষে (cell–এ) রাখা হয়। তার প্রতিবাদে কবি অনশন-ধর্মঘট করেন। অনশন-ভঙ্গের পর কবিকে বিশেষ শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা দিয়া ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন তারিখে বহরমপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। কবির মুক্তি সম্পর্কে ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ৫ই পৌষ তারিখের সাপ্তাহিক 'ছোলতান' পত্রিকায় এই সংবাদটি প্রকাশিত হয় :

> "গত ১৫ই ডিসেম্বর (১৯২৩) বহরমপুর জেল হইতে কাজী নজরুল ইসলাম মুক্তিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে আর একটি মোকদ্দমা দায়ের আছে, আগামী ৯ই জানুয়ারি এই মোকদ্দমার শুনানীর দিন নির্দিষ্ট আছে।"

১৩৩০ সালের ৩রা ফাল্গুন তারিখের সাপ্তাহিক ছোল্‌তানে 'কাজী নজরুল ইসলামের অব্যাহতি' শিরোনামে লেখা হয় :

> "কাজি ছাহেব যে ইতিপূর্বে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, সেখান হইতে মুক্তি পাইবার অব্যবহিত পূর্বে তিনি জেল-আইনের ৪২–ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হন। বহরমপুর মহকুমা-ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে এতদিন এই মামলার বিচার চলিতেছিল। তত্রত্য উকিল শ্রীযুক্ত ব্রজভূষণ গুপ্ত প্রভৃতি কতিপয় সহৃদয় ভদ্রলোক বিনা-পয়সায় কাজি ছাহেবের মামলার তদ্‌বির করিয়াছিলেন। বাদী-পক্ষের জবানবন্দীতেই কাজি ছাহেব নির্দোষ প্রতিপন্ন হইয়া বেকসুর খালাস পাইয়াছেন। এ-সংবাদে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।"

১৩৫৯ সালের ১৫ই আষাঢ় 'বন-গীতি' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রকাশিকা : প্রমীলা নজরুল ইসলাম, ১৬, রাজেন্দ্র লাল স্ট্রিট, কলিকাতা-৬। ২৫/১এ, কালিদাস সিংহ লেন, কলিকাতা, আনন্দময়ী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখার্জী দ্বারা মুদ্রিত। ১০২ পৃষ্ঠা ; মূল্য ২॥০ টাকা। তাহাতে এই বিভাগের ২২টি গান নূতন সংযোজিত হইয়াছে।

"মোহাম্মদ মোর নয়ন-মণি" ১৩৪৩ শ্রাবণের 'মোয়াজ্জিন'-এ এবং "মোহাম্মদ নাম জপেছিলি" ১৩৪৫ চৈত্রের মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত হয়।

"সন্ধ্যামালতী যবে ফুলবনে ঝুরে" ১৩৪৫ মাঘের 'ভারতবর্ষে' শ্রীজগৎ ঘটক-কৃত স্বরলিপিসহ বাহির হয়। তাহাতে গানটির সুর-তাল ছাপা হয় 'ধানশ্রী (ভৈরবী ঠাট)' ত্রিতালী।

১৩৩০ সালের আশ্বিন মাসে 'দোলন-চাপা' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে মোট ২০টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়। 'দোলন-চাঁপার তৃতীয় সংস্করণ ১৩৬১

শ্রাবণে ১৬ নং রাজেন্দ্রলাল স্ট্রিট, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীমতী প্রমীলা নজরুল ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত ; এবং ২৮ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা-৬ কালিকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীবিজয়কুমার মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত ; ৬৪ পৃষ্ঠা ; মূল্য ২৷৷. টাকা। তাহাতে প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের 'পউষ', 'পথহারা', 'অবেলার ডাক', 'পূজারিণী', 'অভিশাপ', 'পিছু-ডাক', ও 'কবি-রানী', এই ৭টি কবিতা পরিত্যক্ত এবং তৎস্থলে ৩৮টি কবিতা সংযোজিত হইয়াছে। উক্ত ৩৮টি কবিতার মধ্যে ২৭টি 'ছায়ানট'-এ, ২টি 'গীতি-শতদলে' এবং ১টি 'গানের মালা'য় পূর্বেই পরিবেশিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট ৮টি গীতি-কবিতা এই বিভাগের আদ্যে মুদ্রিত হইল।

"না মিটিতে সাধ মোর" গানটির নীচে 'দোলন-চাঁপা'র তৃতীয় সংস্করণে লেখা আছে : 'উপাসনা'। এটি 'চোখের চাতক' এর ৩৪-সংখ্যক গান ; প্রথমে ১৩৩৬ কার্তিকের 'সওগাতে' প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে গানটির আস্থায়ী নিম্নরূপ—

সাধ না মিটিতে মোর নিশি পোহায়।
নিবিড় তিমির ছেয়ে আজো হিয়ায়॥

'দূর বনান্তের পথ ভুলি' কোন্ বুলবুলি" ১৩৪০ ভাদ্র-অগ্রহায়ণের, "ভেসে আসে সুদুর স্মৃতির ম্লান সুরভি" ১৩৪৩ কার্তিকের, "জানি আমার সাধনা নাই" ১৩৪৩ অগ্রহায়ণের, "রূপের কথায় নাই জানালে" ১৩৪৩ চৈত্রের, "তেপান্তরের মাঠে বঁধু হে" ১৩৪৪ বৈশাখে, "আমার সুরের ঝর্ণা-ধারায়" ১৩৪৪ কার্তিকের, "জাগো রে তরুণ জাগো রে ছাত্রদল" ১৩৪৪ পৌষের, "ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে আমার গানের বুল্‌বুলি" ১৩৪৪ মাঘের এবং "এস ফিরে প্রিয়তম এস ফিরে" ১৩৪৪ ফাল্গুনের 'বুল্‌বুল' পত্রিকায় বাহির হয়।

"তেপান্তরের মাঠে বঁধু হে একা বসে থাকি" 'সাঁওতালী-গীতি' শিরোনামে ১৩৪৪ কার্তিকের মাসিক মোহাম্মদীতেও পত্রস্থ হয়।

"ভোরে স্বপনে তুমি কি দিয়ে লেখা" ১৩৪১ আষাঢ়ের, "দিনগুলি মোর পদ্মেরই দল" ১৩৪১ আশ্বিনের, "আমার গানের মালা আমি" ১৩৪১ কার্তিকের এবং "তোমার দেওয়া ব্যথা সে যে" ১৩৪২ জ্যৈষ্ঠের 'পূর্বাচল'-এ ছাপা হয়।

"ঝর্‌লো যে ফুল ফোটার আগেই" ১৩৪১ শ্রাবণের, "হাওয়াতেই নেচে নেচে যায় এ তটিনী" ১৩৪১ পৌষের, "জ্যোস্না-হসিত মাধবী নিশি আজ" ১৩৪১ মাঘের এবং "তব চরণ-প্রান্তে মরণ-বেলায় শরণ দিও" ১৩৪১ চৈত্রের 'ছায়াবীথি'তে বাহির হয়।

১৩৪০ সালে 'গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'ধ্রুব' নাটকের বাণীচিত্র নির্মাণ করেন কলিকাতার পাইওনিয়র ফিল্মস্ কোম্পানি ; নজরুল ইসলাম সেই ছায়াচিত্রে নারদের ভূমিকায় অভিনয় করেন এবং উহার ১৭টি গীত রচনা করেন। "চমকে চপলা মেঘে গগন মগন" উক্ত ছায়াচিত্রের 'সুনীতির গীত'।

"চোখে চোখে চাই যখন" ১৩৪২ শ্রাবণের, "গুণে গরিমায় আমাদের নারী" ১৩৪১ আষাঢ়ের, "কাবার জিয়ারতে তুমি" ১৩৪৬ ভাদ্রের, "আমার হৃদয়-শামাদানে" ১৩৪৬

বৈশাখের, "ওগো মুর্শিদ পীর বলো বলো" ১৩৪৬ কার্তিকের এবং "নাই হল মা জেওর লেবাস্" ১৩৪৬ অগ্রহায়ণের মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত হয়।

"এস বরষা শ্যাম সরসা প্রিয়-দরশা" ১৩৫১ কার্তিক-পৌষের 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

"এলে কি স্বপন-মায়া আবার আমায় গান গাওয়াতে" গজলটি নজরুল ইসলাম ১৩৩৮ সালে দার্জিলিঙে অবস্থানকালে জাহান-আরা বেগম চৌধুরীর অটোগ্রাফের খাতায় লিখিয়া দিয়াছিলেন ; ইহা ১৩৫৭ সালে জাহান-আরা বেগমের সম্পাদিত ১০ম বর্ষের 'বর্ষবাণী'তে মুদ্রিত হয়।

"কল-কল্লোলে ত্রিংশ কোটি কণ্ঠে" ১৩৪০ ভাদ্রের, "তোমার নামে এ কি নেশা" ১৩৪৩ বৈশাখের, "দূর আরবের স্বপন দেখি" ও "নামাজ পড় রোজা রাখ" ১৩৪৬ জ্যৈষ্ঠের, "নিশিদিন জপে খোদা দুনিয়া জাহান" ১৩৪৫ পৌষের এবং "শোনো শোনো য়্যা এলাহী" ১৩৪২ শ্রাবণের "মোয়াজ্জিন"-এ প্রকাশিত হয়।

"তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ" ১৩৪০ ভাদ্র-অগ্রহায়ণের এবং "আমি যদি আরব হতাম" ১৩৪৩ পৌষের 'বুলবুল'-এ বাহির হয়।

"আমারে সকল ক্ষুদ্রতা হতে বাঁচাও প্রভু উদার" ১৯৪১ অক্টোবরের ১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা 'জাগরণ'-এ প্রকাশিত হয়।

এখানে সংকলিত ১১১টি গান [নতুন সংস্করণের ১০৬-২১৫ সংখ্যক] ইতোপূর্বে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

১-সংখ্যক গান : "নবীর মাঝে রবির সম"সহ পাঁচটি গানের কবির স্বহস্তলিখিত রচনার ফটোস্ট্যাট কপি ১৯৭৬ অক্টোবর দ্বিতীয় পক্ষের নজরুল-স্মরণী-সংখ্যা 'বেতার বাংলা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ; সে সম্পর্কে নভেম্বরের প্রথম পক্ষের 'বেতার বাংলা' পত্রিকায় সম্পাদক 'সংশোধনী' শিরোনামে লেখেন :

"বেতার-বাংলার গত নজরুল-স্মরণী-সংখ্যার—

(ক) 'কলঙ্ক আর জ্যোৎস্নায় মেশা',

(খ) 'নবীর মাঝে রবির সম',

(গ) 'ফুলের মতন ফুল্লমুখে',

(ঘ) 'ফুটল সন্ধ্যামণির ফুল',

(ঙ) 'তব যাবার বেলা'

এই কটি গানের পাণ্ডুলিপি কবি-সমালোচক আবদুল কাদিরের সৌজন্যে প্রাপ্ত।"

জনাব আবদুস্ সাত্তার সম্পাদিত 'নজরুল-গীতি-সন্ধানে' পুস্তকে এখানকার ২-২০ সংখ্যক ১৯টি গান সংকলিত হইয়াছে।

২১-সংখ্যক গান : "তুমি রহিমুর্ রহমান আমি গুণাহ্গার বান্দা" জনাব আসাদুল হক কর্তৃক সংগৃহীত এবং ১৯৭৬ সালের নজরুল-জয়ন্তী-সংখ্যা 'বেতার বাংলা' পত্রিকায় প্রকাশিত।

নজরুল একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত 'নজরুল-গীতি' প্রথম খণ্ডে এখানকার ২২-২৯ সংখ্যক ৮টি গান, দ্বিতীয় খণ্ডে ৩০-৩৮ সংখ্যক ৯টি গান, তৃতীয় খণ্ডে ৩৯-৪৫

সংখ্যক ৭টি গান, চতুর্থ খণ্ডে ৪৬–৫৬ সংখ্যক ১১টি গান এবং পঞ্চম খণ্ডে ৫০–৭২ সংখ্যক ১৬টি গান সংকলিত হইয়াছে।

৭৩–সংখ্যক গান : "জাগো অমৃত–পিয়াসী চিত" ১৩৪৫ পৌষের ত্রৈমাসিক 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

কলিকাতার দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় 'অগ্রনায়ক' শীর্ষক কবিতাটি প্রকাশিত হইয়াছিল। 'নবযুগ' হইতে ইহা ১৯৫৮ সেপ্টেম্বরের ২য় বর্ষের ৪র্থ–৫ম সংখ্যক 'তরুণ পাকিস্তান' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল।

'জয় হোক ! জয় হোক !' ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখের 'নবযুগ'–এ পত্রস্থ হইয়াছিল।

১৩৮১ সালের বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠ সংখ্যক 'সওগাত' পত্রিকার ৪২৪ পৃষ্ঠায় নজরুল ইসলামের স্বহস্তলিখিত 'আবীর' কবিতাটি মুদ্রিত হইয়াছিল।

'ট্রেড–শো' ১৩৪৫ আশ্বিনের মাসিক 'বসুমতী'তে বাহির হইয়াছিল।

'স্বদেশ' কবিতাটি শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালের সম্পাদিত ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যক 'স্বদেশ' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ১৩৩৮ আষাঢ়ে ছাপা হইয়াছিল। কবিতাটি শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

'তীর্থপথিক' ১৩৪২ সালের ২২ বর্ষের ১ম সংখ্যক 'নাগরিক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহা 'রবীন্দ্রনাথের পত্রের উত্তর'–স্বরূপ লিখিত হইয়াছিল। কলিকাতার সাপ্তাহিক 'নাগরিক'–এর ১৩৪২ সালের বিশেষ বার্ষিক সংখ্যার জন্য একটি লেখা চাহিয়া নজরুল ইসলাম ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে আগস্ট তারিখে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন ; তার জবাবে রবীন্দ্রনাথ ১৫ই ভাদ্র, ১৩৪২ তারিখে নজরুল ইসলামকে নিম্নোক্ত পত্রখানি লিখেন :

কল্যাণীয়েষু :

অনেকখানি পরে তোমার সাড়া পেয়ে মন খুব খুশি হলো। কিছু দাবি করেছ— তোমার দাবি অস্বীকার করা আমার পক্ষে কঠিন। আমার মুস্কিল এই, পঁচাত্তরে পড়তে তোমার এখনো অনেক দেরি আছে, সেইজন্য আমার শীর্ণ–শক্তি ও জীর্ণ–দেহের পরে তোমার দরদ নেই। কোনো মন্ত্রবলে বয়স বদল করতে পারলে তোমার শিক্ষা হতো। কিন্তু মহাভারতের যুগ অনেক দূরে চলে গেছে, এখন দেহে–মনে মানব–সমাজকে চলতে হয় সায়ান্সের সীমানা বাঁচিয়ে। অনেক দিন থেকে আমার আয়ুর ক্ষেত্রে ক্লান্তির ছায়া ঘনিয়ে আসছিল ; কিছুদিন থেকে তার উপরেও দেহ–যন্ত্রের বিকলতা দেখা দিয়েছে। এখন মূলধন ভেঙে দেহযাত্রা নির্বাহ করতে হচ্ছে, যা ব্যয় হচ্ছে তা আর পূরণ হবার উপায় নেই। তোমাদের বয়সে লেখা সম্বন্ধে প্রায় দাতাকর্ণ ছিলুম, ছোট বড় সকলকেই অন্তত মুষ্টিভিক্ষাও দিয়েছি। কলম এখন কৃপণ, স্বভাব–দোষে নয়, অভাববশত। ছোট বড় নানা আয়তনের কাগজের পত্র–পুট নিয়ে নানা অর্থী আমার অঙ্গনে এসে ভিড় করে, প্রায় সকলকেই ফেরাতে হোলো। আমার অনাবৃষ্টির কুয়োর শেষ তলায় অল্প যেটুকু জল জমে ছিল সেটুকু

নিঃশেষ হয়ে গেছে। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, কৃপণের অখ্যাতি শেষ বয়সে স্বীকার করে নিয়ে রিক্ত দানপত্র হাতে বিদায় নেব। যারা ফিরে যাবে, তারা দুয়ো দিয়ে যাবে, কিন্তু বৈতরণীর মাঝ দরিয়ায় সে ধ্বনি উঠবে না।

আজকাল দেখতে পাই ছোটো ছোটো বিস্তর কাগজের অকস্মাৎ উদ্‌গম হচ্ছে। ফুল-ফসলের চেয়ে তাদের কাঁটার প্রাধান্যই বেশি। আমি সেকেলে লোক, বয়সও হয়েছে। সাহিত্যে পরস্পর খোঁচাখুঁচির প্রাদুর্ভাব কেবল দুঃখকর নয়, আমার কাছে লজ্জাজনক বোধ হয়। এই জন্যে এখানকার ক্ষণ-সাহিত্যের কাঁচা রাস্তায় যেখানে সেখানে পা বাড়াতে আমার ভয় লাগে। সাবধানে বাছাই করে চলবার সময় নেই, নজরও ক্ষীণ হয়েছে ; এইজন্য এই সকল গলিপথ একেবারে এড়িয়ে চলাই আমার পক্ষে নিরাপদ। তুমি তরুণ কবি, এই প্রাচীন কবি তোমার কাছ থেকে আর কিছু না হোক করুণা দাবি করতে পারে। অকিঞ্চনের কাছে প্রার্থনা করে তাকে লজ্জা দিও না। এই নতুন যুগে যে সব যাত্রী সাহিত্য-তীর্থে যাত্রা করবে, পাথেয় তাদের নিজের ভিতর থেকেই সংগ্রহ করতে হবে।

শুনেছি বর্ধমান অঞ্চলে তোমার জন্ম। আমরা থাকি তার পাশের জিলায়। কখনও যদি এ সীমানা পেরিয়ে আমাদের দিকে আসতে পারো, খুশি হবো। স্বচক্ষে আমার অবস্থাও দেখে যেতে পারবে। ইতি

১৫ই ভাদ্র, ১৩৪২

স্নেহরত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের এই পত্রখানি পাইয়া নজরুল ইসলাম তার 'উত্তর'-স্বরূপ কবিগুরুকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। 'তীর্থপথিক' কবিতাটি।

'রবি-হারা' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে কলিকাতা বেতার-যোগে প্রচারিত হইয়াছিল।

'দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের তিরোধানে' ১৩৪০ ভাদ্রের মাসিক মোহাম্মদীতে বাহির হইয়াছিল।

'সাম্যের জয় হোক' গানটি চিয়াং কাইসেকের ভারতে আগমন উপলক্ষে হিজ্ মাস্টার্স ভয়েস কোম্পানির উপরোধে বিরচিত হয় এবং শ্রীজগন্ময় মিত্র গানটি গ্রামোফোন কোম্পানিতে রেকর্ড করেন।

'মৃত তারা' কবিতাটি ১৩৪৪ সালের বার্ষিক শারদীয়া-সংখ্যা সাপ্তাহিক 'ছন্দা' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 'ছন্দা' হইতে ইহা 'জনপদ' পত্রিকায় (প্রথম বর্ষ : নজরুল সংখ্যা : ১৩৫৮) পুনর্মুদ্রিত হয়।

'স্রোতের ফুল' কবিতাটি ঢাকার মাসিক 'জাগরণ' পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার পুরোভাগে প্রকাশিত হয়।

'অবেলায়' ও 'কবির চাওয়া' কবি করাচিতে অবস্থান-কালে রচনা করিয়াছিলেন। করাচি হইতে কলিকাতা আসার সময়ে তাঁর জিনিসপত্রের সঙ্গে একটি কবিতার

খাতা ছিল ; সেই খাতা হইতে তিনি এই দুইটি কবিতা মাসিক 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য দিয়াছিলেন। 'অবেলায়' ১৩২৭ কার্তিক এবং 'কবির চাওয়া' ১৩২৮ ভাদ্রে বাহির হয়।

'সংকল্প' কবিতাটির প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম স্তবক 'দেখব এবার জগৎটাকে' শিরোনামে বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'কবিতা-সংকলন' নামক বাংলা-দ্রুত-পাঠ্যপুস্তকে সংকলিত (অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯) হইয়াছে।

'চল্‌ব আমি হালকা চালে' ১৩৩৪ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'মৌচাক' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়।

কিশোরের স্বপ্ন' ১৩৬৭ মাঘের 'খেলাঘর' পত্রিকায় সংকলিত হয়।

'জিজ্ঞাসা' ১৩৩৪ সালে ১ম বর্ষের প্রথম সংখ্যক 'শিশু-মহল' পত্রিকায় ছাপা হইয়াছিল।

'লক্ষ্মী ছেলে তাই তোলে' ছাপা হইয়াছিল 'শিশু-মহল'-এর দ্বিতীয় সংখ্যায়।

'কিশোর স্বপন' ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ 'বেণু' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

'নতুন পথিক' ১৩৩৫ আষাঢ়ে 'রাজভোগ' পত্রিকায় বাহির হয়।

'শিশু সওগাত' প্রকাশিত হয় ১৩৪৪ মাঘে প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যক 'শিশু সওগাত' পত্রিকায়।

'গদাই-এর পদবৃদ্ধি' প্রকাশিত হয় ১৩৪২ আশ্বিনের মাসিক মোহাম্মদীতে।

'মৌলভী সাহেব', 'চাষী' ও 'ঈদের চাঁদ' প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল নজরুল ইসলামের প্রণীত 'মক্তব-সাহিত্য' নামক পাঠ্যপুস্তকে। সাবেক বাংলাদেশের জনশিক্ষা-বিভাগের মহামান্য ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক বঙ্গদেশের মক্তব ও মাদ্রাসাসমূহের প্রথম শ্রেণীর অবশ্যপাঠ্য পুস্তক-রূপে। উক্ত 'মক্তব-সাহিত্য' অনুমোদিত হইয়াছিল (কলিকাতা গেজেট : ২৪/৯/৩৬)।

'ফুটল সন্ধ্যামণির ফুল আমার মনের আঙিনায়' গানটি নজরুল ইসলামের স্বহস্তলিখিত পাঠ—১৯৭৬ সালের অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় নজরুল-স্মরণী-সংখ্যা 'বেতার-বাংলা' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়।

'সজল হাওয়া কেঁদে বেড়ায়' গানটি ১৩৪৩ শ্রাবণের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় বাহির হয়।

'কহিতে নারি যে কথাগুলি' গানটি ১৩৫৯ সালের শারদীয় সংখ্যা 'সত্যযুগ' পত্রিকায় ছাপা হয়।

'ঝিলের জলে কে ভাসালে নীল শালুকের ভেলা' গানটি শ্রীজগৎ ঘটককৃত স্বরলিপিসমেত ১৩৪৫ সালের পৌষ সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় বাহির হয়।

'মা' ১৩২৭ অগ্রহায়ণের নারায়ণে, 'আবাহন' ১৩২৮ মাঘের সওগাতে এবং 'নবীনচন্দ্র' ১৩৩৪ ভাদ্রের জয়তীতে প্রকাশিত হয়।

'প্রথম অশ্রু' কবিতাটির প্রথম পাঁচটি স্তবক ১৩৩৭ আশ্বিনের 'জয়তী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। সমগ্র কবিতাটি ১৩৬০ জ্যৈষ্ঠের 'মাহে-নও'-এ প্রকাশিত হয়।

জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন
নতুন সংযোজিত গান

'নজরুল-রচনাবলী'তে এ যাবৎ প্রকাশিত গানের বাইরে আরো প্রায় একশতটি গান নতুন সংযোজিত হয়েছে।

মুহম্মদ নূরুল হুদা-সম্পাদিত 'নজরুলের হারানো গানের খাতা' (১৯৯৭) এবং নজরুল-সংগীতজ্ঞ আবদুস সাত্তারের সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত।

জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

বিবিধ

কবিতা

সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলীম সাহিত্য সংসদের পাঠাগার থেকে কাজী নজরুল ইসলামের দুষ্প্রাপ্য কবিতা 'আগুন' সংগ্রহ করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ভূঁইয়া ইকবাল।

ভূঁইয়া ইকবাল-এর 'রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ' গ্রন্থে নজরুলের 'মৃত্যুহীন রবীন্দ্র' কবিতাটি সংকলিত হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণে নজরুল এই কবিতাটি কিশোরদের জন্য লিখেছিলেন।

অভিনন্দনপত্র

১৯২৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর (১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৬) কলকাতার এ্যালবার্ট হলে বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে কাজী নজরুল ইসলামকে 'জাতীয় সংবর্ধনা' দেওয়া হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিজ্ঞানাচার্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়। সুভাষচন্দ্র বসু ও মাসিক 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক জলধর সেন ভাষণ দেন। মানপত্র পাঠ করেন এস. ওয়াজেদ আলী বার-এট ল। প্রতিভাষণ দেন কবি।

কবি নজরুল ইসলাম সিরাজ স্মৃতি উদযাপনের আবেদন

অগ্রন্থিত বাণী
নবাব সিরাজউদ্দৌলা স্মৃতি-দিবস উদযাপনের আহ্বান

১৯৩৯ সালের ২৯শে জুন দৈনিক 'আজাদে' প্রকাশিত হয়েছিল নজরুল ইসলামের এই আহ্বান-বাণী। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার (১৭৩৩-৫৭) প্রতি

নজরুলের একটি মুগ্ধতা লক্ষ্য করা গেছে সব সময়। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮–১৯৬৮) একসময় নবাব সিরাজউদ্দৌলার স্মরণে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সম্পাদিত 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকার একটি সংখ্যা সিরাজ-সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে নজরুল ইসলামের এই আবেদন প্রচারিত হয়। সিরাজউদ্দৌলা স্মৃতি-দিবসে নজরুল নিজে অংশ নিয়েছিলেন কি না, তা অবশ্য দৈনিক 'আজাদ'-এর পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে পাওয়া যায়নি। এখানে স্মরণীয় যে, নজরুল নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের (১৮৯২–১৯৬১) 'সিরাজউদ্দৌলা' রেকর্ড-নাট্যের গানগুলি লিখে দিয়েছিলেন। গানগুলি এই : ১. আমি আলোর শিখা ; ২. কেন প্রেম-যমুনা আজি হলো অধীর ; ৩. পথহারা পাখি কেঁদে ফিরি একা ; ৪. নদীর একূল ভাঙে ওকূল গড়ে এই তো নদীর খেলা ; ৫. হায় পলাশী !

মুড়ো খ্যাংড়া
অগ্রন্থিত সমালোচনা

নজরুল-সম্পাদিত 'ধূমকেতু' অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকাটি বেরিয়েছিল মাত্র মাস তিনেক (২৪শে শ্রাবণ-২৮শে কার্তিক ১৩২৯)। কিন্তু এর মধ্যে বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক অঙ্গনে এক অভূতপূর্ব আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। এই পত্রিকায় নজরুল স্বনামে, ছদ্মনামে ও নামহীনভাবে অনেক লেখাই লিখেছিলেন। তার সবগুলি আজ চিহ্নিত করাই প্রায় অসম্ভব। এরকম একটি রচনা নজরুল লিখেছিলেন 'শ্রী কাঁধে-বাড়ি বলরাম' ছদ্মনামে, সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৬৬–১৯২৩) উদ্দেশ্যে। এই রচনাটি যে নজরুলের, তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'ধূমকেতু'র 'ম্যানেজার বা কর্মসচিব' শান্তিপদ সিংহের স্মৃতিচারণায়। শক্তিপদ সিংহের 'নজরুল-কথা' গ্রন্থ থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি :

> দুপুরে ছাপাখানা থেকে এসে বললাম যে আরো পুরো দেড় কলম ম্যাটার না হলে পাতাটা পুরো হচ্ছে না।
>
> আমাদের কাগজে দুটো ভাগ ছিল। 'মুসলিম জাহান' শিরোনামায় লিখতেন শ্রীযুক্ত মঈনুদ্দীন হোসায়েন সাহেব এবং 'ত্রিশূল' শিরোনামায় লিখতেন স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। কবি কাগজ কলম নিয়ে বসে গেলেন। মিনিট পনেরোর মধ্যে লিখে দিলেন একটা গালিগালাজ করা প্রবন্ধ, যার শিরোনাম হলো 'মুড়ো খ্যাংড়া', লেখক 'শ্রী কাঁধে-বাড়ি বলরাম'। গালাগালটা দেওয়া হয়েছিল শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় 'নায়ক' বলে এক জোরালো কাগজের বাঘা সম্পাদক। ফরমাশমতো যে কোনো বিষয় নিয়ে জোরালো লেখা লিখতে পারতেন। তিনি তাঁর কাগজে কতগুলো বেফাঁস কথা লিখেছিলেন। এটা তারই উত্তর। তাঁর ভাষাটা যেমন অসাহিত্যিক ছিল এর ভাষাও তেমনি অসাহিত্যিক হয়েছিল। লেখাটা এমন আন্দাজ করে লিখলেন যা আমাদের কাগজে ঠিক দেড় কলম ভর্তি হলো।

চিঠি-পত্র

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরীর 'নজরুলের বিলুপ্ত, অগ্রন্থিত ও অপ্রকাশিত পত্রাবলী' (ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, কুষ্টিয়া, ৫ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৭) শিরোনামের গবেষণা-প্রবন্ধে নজরুলের অপ্রকাশিত ৮টি চিঠি প্রকাশ করেন। ৮টি চিঠি বর্তমান খণ্ডে সংকলিত হলো পত্র পরিচিতিসহ।

মাসিক 'নওরোজ' পত্রিকার সম্পাদকের কাছে লেখা নজরুলের চিঠিটি সাপ্তাহিক 'গণবাণী'তে ২৭শে মে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা'য় এপ্রিল-জুন সংখ্যার ৮ পৃষ্ঠায় এই চিঠি ছাপা হয়।

নজরুলের বিবৃতিটি 'নিখিল বঙ্গীয় তরুণ মুসলিম সমিতি'র সম্পাদকের সদস্যপদ গ্রহণ সংক্রান্ত। বিবৃতিটি 'সত্যগ্রহী' পত্রিকায় ১৩৩৩ সালের ৯ই চৈত্র সংখ্যায় ৫৫০ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়।

'নজরুলের অগ্রথিত রচনা ও অন্যান্য' নামক গ্রন্থে লায়লা জামান চিঠি ও বিবৃতি সংযোজন করেন। সংযোজন দুটি বর্তমান খণ্ডে সংকলিত হলো।

কানার বোঝা কুঁজোর ঘাড়ে

১৫ই আগস্ট ১৯২২, ৩০শে শ্রাবণ মঙ্গলবার ১৩২৯ বঙ্গাব্দে 'ধূমকেতু' পত্রিকায় অস্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়টি প্রকাশিত হয়।

দেয়ালি উৎসব

'দেয়ালি-উৎসব' সম্পাদকীয়টি অস্বাক্ষরিত। সম্পাদকীয়টি ২০শে অক্টোবর ১৯২২, ৩রা কার্তিক শুক্রবার ১৩২৯, ১ম বর্ষ ১৫শ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

ভাইয়ের ডাক

অস্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়টি 'ধূমকেতু' পত্রিকায় ১৭ই নভেম্বর ১৯২২, ১লা অগ্রহায়ণ শুক্রবার ১৩২৯, ১ম বর্ষ ২২শ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র

১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ২৭শে জুন কলকাতা বেতারে কবি নজরুল একটি কথিকা পাঠ করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন (২৭শে জুন, ১৯৩৮) উপলক্ষে। আসাদুল হকের 'নজরুল যখন বেতারে' (পৃষ্ঠা ২০২-২০৩) গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

সৈনিকের পথ ও আমার বিশ্রাম

'সৈনিকের পথ' রচনাটিতে নজরুলের স্বাক্ষর পাওয়া যায়নি। রচনাটি 'ধূমকেতু' অর্ধসাপ্তাহিকে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ২১শে নভেম্বর সম্পাদকীয়রূপে প্রকাশিত হয়। লায়লা জামানের 'নজরুলের অগ্রন্থিত রচনা ও অন্যান্য' (২০০১) গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

অত্যাচারের বিরুদ্ধে নজরুলের আবেগদৃপ্ত বিদ্রোহী ভাষার যে প্রকাশ পাওয়া যায় তা নিঃসন্দেহে নজরুলেরই।

ধূমকেতুর আদি-উদয় স্মৃতি

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে নজরুলের কারা বরণের কিছুদিন পরই 'ধূমকেতু'র ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ২২শে আগস্ট 'ধূমকেতু' পুনরায় প্রকাশিত হয় কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ভৌমিকের সম্পাদনায়। এই প্রবন্ধটি নতুন সংখ্যার জন্য আশীর্বাণী হিসেবে তিনি লেখেন।

আধ্যাত্মিকতা

আবদুল আজিজ আল-আমান সম্পাদিত 'অপ্রকাশিত নজরুল' গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে, তিনি নজরুলের অপ্রকাশিত আধ্যাত্মিক রচনার পাণ্ডুলিপি নিতাই ঘটকের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন।

আইরীশ-বিদ্রোহী

শুধু নিজের নামে নয় ধীরে ধীরে জানা যাচ্ছে, নানা ছদ্মনামেও কাজী নজরুল ইসলাম বহু রচনা প্রকাশ করেছেন। এর কারণ ছিল বিচিত্র। কখনো ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের আঘাত এড়িয়ে যাওয়ার জন্য কখনো বা পত্রিকার পাতা ভরানোর কাজে একাধিক লেখা লিখলে নামের দৃষ্টিকটু পৌনপুনিকতা পরিহার করার জন্য। অজ্ঞাত আরো কোনো কারণও এর পেছনে থাকতে পারে।

নজরুল রচিত প্রবন্ধগ্রন্থ 'যুগবাণী'র প্রথম সংস্করণ (১৯২২ খ্রি.)-এর কপি উদ্ধার করে বসুমিত্র মজুমদার জানাচ্ছেন, এ বইয়ের দ্বিতীয় আখ্যাপত্রে নজরুলের প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য ছয়টি গ্রন্থের তালিকায় রবার্ট এমেটের জীবনীর উল্লেখ রয়েছে। বসুমিত্র লিখেছেন সে সময়ে কবির প্রকাশিত গ্রন্থাবলির বিজ্ঞাপনে রবার্ট এমেটের জীবনীর নাম থাকত। রবার্ট এমেটকে নিয়ে একই সময়ে 'ধূমকেতু'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'আইরিশ বিদ্রোহী রবার্ট এমেট' শিরোনামে 'কহলন মিশ্র' নামে একজনের রচনা সম্পর্কে বসুমিত্র মজুমদার আরো লিখেছেন, 'আমি জানি না, সেই কহলন মিশ্র প্রকৃতই কোনো লেখকের নাম না, কাজী নজরুলের ছদ্মনাম। কেননা নজরুল অন্য আর কোনো পত্রিকায়

রবার্ট এমেটকে নিয়ে আর কিছু লেখেননি। আর কোনো পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতির আগে তার বিজ্ঞাপন দেবার মতো ব্যবসায়িক বুদ্ধি নজরুলের ছিল কি?'

শেষ পর্যন্ত আইরিশ বিদ্রোহী রবার্ট এমেটকে নিয়ে নজরুলের কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। এ বিষয়ে নজরুলের কোনো রচনাও অন্যত্র দেখিনি। বরং বসুমিত্র মজুমদারের জিজ্ঞাসার সূত্রে 'ধূমকেতু' অনুসন্ধান করে দেখেছি, 'যুগবাণী' প্রকাশের বিজ্ঞাপন এতে প্রথম ছাপা হয় ২৪ অক্টোবর ১৯২২-এ। কহলন মিশ্র রচিত 'আইরিশ-বিদ্রোহী রবার্ট এমেট' রচনার প্রথম কিস্তিত ছাপা হয় একই বছরের ২০ অক্টোবর এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিস্তি ছাপা হয় যথাক্রমে ২৭ ও ৩১ অক্টোবর সংখ্যায়। ফলে সন্দেহের প্রায় কোনো অবকাশ থাকে না যে 'কহলন মিশ্র' ছদ্মনামের আড়ালে এ রচনার লেখক স্বয়ং নজরুল।

আইরিশ বিদ্রোহী রবার্ট এমেট সম্পর্কে বিস্তর তথ্য এ লেখাটিতে আছে। শুধু একটি ছোট কিন্তু চিত্তাকর্ষক তথ্যের দিকে সবার দৃষ্টি ফেরাতে চাই। এক প্রহসনমূলক বিচার শেষে ২০ সেপ্টেম্বর ১৮০৩-এ বৃটিশ সরকার যখন রবার্ট এমেটকে ফাঁসি দেয় তখন তার বয়স মাত্র ২৩ বছর। এ লেখাটি লেখার সময় নজরুলের বয়সও ছিল ২৩ বছর।

আরেকটি দরকারি তথ্য এই যে, লেখাটির কোনো কোনো অংশ উদ্ধার করা যায়নি। উদ্ধারের অযোগ্য অংশগুলি তৃতীয় বন্ধনীর ভেতর তিনটি বিন্দুচিহ্ন দিয়ে নির্দেশ করা হয়েছে।

['আইরিশ-বিদ্রোহী রবার্ট এমেট' প্রবন্ধের ভূমিকা অংশ অনুপম হায়াৎ-এর 'প্রামাণ্য নজরুল' (২০০৮) গ্রন্থ থেকে গৃহীত।]

জীবনপঞ্জি

১৮৯৯ ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ২৪শে মে ১৮৯৯ সালে পশ্চিম-বঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম। পিতামহ কাজী আমিনুল্লাহ। পিতা কাজী ফকির আহমদ। মাতামহ তোফায়েল আলী। মাতা জাহেদা খাতুন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাজী সাহেবজান। কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাজী আলী হোসেন। ভগ্নী উম্মে কুলসুম। নজরুলের ডাক-নাম ছিল দুখু মিয়া।

১৯০৮ পিতা কাজী ফকির আহমদের মৃত্যু।

১৯০৯ গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাইমারি পাশ, মক্তবে শিক্ষকতা, মাজারের সেবক, লেটো দলের সদস্য ও পালাগান ইত্যাদি রচনা।

১৯১১ মাথরুন গ্রামে নবীনচন্দ্র ইন্সটিটিউটে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র।

১৯১২ স্কুল ত্যাগ, বাসুদেবের কবিদলের সঙ্গে সম্পর্ক, রেলওয়ে গার্ড সাহেবের খানসামা, আসানসোলে এম বখ্‌শের চা রুটির দোকানে চাকুরি, আসানসোলে পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর ময়মনসিংহের কাজী রফিজউল্লাহ ও তাঁর পত্নী শামসুন্নেসা খানমের স্নেহ লাভ।

১৯১৪ কাজী রফিজউল্লাহ্‌র সহায়তায় ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালের কাজীর-সিমলা, দরিরামপুর গমন এবং দরিরামপুর স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র।

১৯১৫-১৭ রানিগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ স্কুলে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন, শৈলজানন্দের সঙ্গে বন্ধুত্ব। প্রিটেস্ট পরীক্ষার আগে সেনাবাহিনীর ৪৯নম্বর বাঙালি পল্টনে যোগদান।

১৯১৭-১৯ সৈনিক জীবন, প্রধানত করাচিতে গন্‌জা বা আবিসিনিয়া লাইনে অতিবাহিত, ব্যাটালিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার পদে উন্নতি, সাহিত্য-চর্চা। কলকাতার মাসিক সওগাতে 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' গল্প এবং ত্রৈমাসিক বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় 'মুক্তি' কবিতা প্রকাশ।

১৯২০ মার্চ মাসে সেনাবাহিনী থেকে প্রত্যাবর্তন, বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির ৩২নম্বর কলেজ স্ট্রিটস্থ দফ্‌তরে মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে অবস্থান, কলকাতায় সাহিত্যিক ও সাংবাদিক জীবন শুরু, 'মোসলেম ভারত', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বিবিধ রচনা প্রকাশ।

সাংবাদিক জীবন : মে মাসে এ. কে. ফজলুল হকের সান্ধ্য-দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় যুগ্ম-সম্পাদক পদে যোগদান, নজরুল ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের ৮-এ টার্নার স্ট্রিটে অবস্থান, সেপ্টেম্বর মাসে 'নবযুগ' পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত এবং নজরুল ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের বরিশাল ভ্রমণ, 'নবযুগ'-এর চাকুরি পরিত্যাগ, বায়ু পরিবর্তনের জন্যে দেওঘর গমন।

১৯২১ দেওঘর থেকে প্রত্যাবর্তন, 'মোসলেম ভারতে'র সম্পাদক আফজাল-উল-হকের সঙ্গে ৩২নম্বর কলেজ স্ট্রিটে অবস্থান, পুনরায় 'নবযুগে' যোগদান।

এপ্রিল মাসে আলী আকবর খানের সঙ্গে কুমিল্লা যাত্রা, কান্দিরপাড়ে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত ও বিরজাসুন্দরী দেবীর আতিথ্য গ্রহণ, আলী আকবর খানের সঙ্গে দৌলতপুর গমন ও দুই মাস দৌলতপুর অবস্থান, আলী আকবর খানের ভাগিনেয়ী সৈয়দা খাতুন ওরফে নার্গিস আসার খানমের সঙ্গে ১৩২৮ সালের ৩রা আষাঢ় তারিখে বিবাহ। কুমিল্লা থেকে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের পরিবারের সকলের অনুষ্ঠানে যোগদান, বিবাহের রাত্রেই নজরুলের দৌলতপুর ত্যাগ ও পরদিন কুমিল্লা প্রত্যাবর্তন এবং অবস্থান। কলকাতায় বিবাহ-সংক্রান্ত গোলযোগের বার্তা প্রেরণ।

জুলাই মাসে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে কুমিল্লা থেকে চাঁদপুর হয়ে কলকাতা প্রত্যাবর্তন, ৩/৪সি তালতলা লেনের বাড়িতে অবস্থান, অক্টোবর মাসে অধ্যাপক (ডক্টর) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সঙ্গে শান্তিনিকেতন ভ্রমণ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ। নভেম্বর মাসে পুনরায় কুমিল্লা গমন, অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ। কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। ডিসেম্বরের শেষ দিকে কলকাতায় তালতলা লেনের বাড়িতে বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী' রচনা। 'বিদ্রোহী' সাপ্তাহিক 'বিজলী' ও মাসিক 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় ছাপা হলে প্রবল আলোড়ন।

১৯২২ পুনরায় কুমিল্লায় আগমন, চার মাস কুমিল্লা অবস্থান, আশালতা সেনগুপ্তা ওরফে প্রমীলার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক। মার্চ মাসে প্রথম গ্রন্থ 'ব্যথার দান' প্রকাশ। ২৫শে জুন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু, কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শোক সভায় যোগদান, সত্যেন দত্ত সম্পর্কে রচিত শোক-কবিতা পাঠ। দৈনিক 'সেবকে' যোগদান ও চাকরি পরিত্যাগ। ১২ই আগস্ট অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' প্রকাশ, ধূমকেতুর জন্য রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ধূমকেতুতে 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা প্রকাশ, অক্টোবর মাসে 'অগ্নি-বীণা' কাব্য ও 'যুগবাণী' প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ, 'যুগবাণী' সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ, ধূমকেতুতে প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' বাজেয়াপ্ত, নভেম্বর মাসে নজরুলকে কুমিল্লায় গ্রেপ্তার ও কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে আটক। 'ধূমকেতু' পত্রিকাতেই নজরুল প্রথম ভারতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেছিলেন ১৩ই অক্টোবর ১৯২২ সংখ্যায়।

১৯২৩ জানুয়ারি মাসে বিচারকালে নজরুলের বিখ্যাত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' আদালতে উপস্থাপন, এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, আলিপুর জেলে স্থানান্তর, নজরুলকে রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত' গীতিনাটক উৎসর্গ, হুগলি জেলে স্থানান্তর, মে মাসে নজরুলের অনশন ধর্মঘট, শিলং থেকে রবীন্দ্রনাথের টেলিগ্রাম, 'Give up hunger strike, our literature claims you', বিরজাসুন্দরী দেবীর অনুরোধে অনশন ভঙ্গ, জুলাই মাসে বহরমপুর জেলে স্থানান্তর, ডিসেম্বরে মুক্তিলাভ।

১৯২৪ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর শাখার একাদশ বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান। মিসেস এম রহমানের উদ্যোগে এপ্রিলে প্রমীলার সঙ্গে বিবাহ, হুগলিতে নজরুলের সংসার স্থাপন, অগাস্টে 'বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙার গান' প্রকাশ ও সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত, 'শনিবারের চিঠি'তে নজরুল-বিরোধী প্রচারণা। হুগলিতে নজরুলের প্রথম পুত্র আজাদ কামালের জন্ম ও অকালমৃত্যু।

১৯২৫ মে মাসে কংগ্রেসের ফরিদপুর অধিবেশনে যোগদান। এই অধিবেশনের গুরুত্ব, মহাত্মা গান্ধি এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের যোগদান। জুলাই মাসে বাঁকুড়া সফর, 'কল্লোল' পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক, ডিসেম্বর মাসে নজরুল ইসলাম, হেমন্তকুমার সরকার, কুতুবউদ্দীন আহ্‌মদ ও শামসুদ্দিন হোসায়ন কর্তৃক ভারতীয় কংগ্রেসের অন্তর্গত, 'মজুর স্বরাজ পার্টি' গঠন। ডিসেম্বরে শ্রমিক প্রজা স্বরাজ দলের মুখপত্র 'লাঙল' প্রকাশ, প্রধান পরিচালক কাজী নজরুল ইসলাম। 'লাঙল'-এর জন্যেও রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী। 'লাঙল' বাংলা ভাষায় প্রথম শ্রেণীসচেতন পত্রিকা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু ১৬ই জুন। কবিতাসংকলন 'চিত্তনামা' প্রকাশ।

১৯২৬ জানুয়ারি থেকে কৃষ্ণনগরে বসবাস। মার্চ মাসে মাদারিপুরে নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মৎস্যজীবী সম্মেলনে যোগদান। এপ্রিল মাসে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত। এপ্রিলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা। রবীন্দ্রনাথকে 'চল চঞ্চল বাণীর দুলাল', 'ধ্বংসপথের যাত্রীদল' এবং 'শিকল-পরা ছল' গান শোনান। মে মাসে কৃষ্ণনগরে কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীত 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার', কিষাণ সভায় 'কৃষাণের গান' ও 'শ্রমিকের গান' এবং ছাত্র ও যুব সম্মেলনে 'ছাত্রদলের গান' পরিবেশন। জুলাই মাসে চট্টগ্রাম, অক্টোবর মাসে সিলেট এবং যশোর ও খুলনা সফর। সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের জন্ম। আর্থিক অনটন। 'দারিদ্র্য' কবিতা রচনা। নভেম্বর মাসে পূর্ববঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় আইন সভার উচ্চ পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পরাজয় বরণ। ডিসেম্বর থেকে গজল রচনার সূত্রপাত,

'বাগিচায় বুলবুলি', 'আসে বসন্ত ফুলবনে', 'দুরন্ত বায়ু পুরবইয়াঁ', 'মৃদুল বায়ে বকুল ছায়ে' প্রভৃতি গান ও 'খালেদ' কবিতা রচনা। নজরুলের ক্রমাগত অসুস্থতা।

১৯২৭ ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা সফর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান ও 'খোশ আমদেদ' গানটি পরিবেশন, 'খালেদ' কবিতা আবৃত্তি।

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য নির্বাচিত। কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'গণবাণী' (সম্পাদক মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ)-র জন্যে এপ্রিল মাসে 'ইন্টারন্যাশনাল', 'রেড ফ্লাগ' ও শেলির ভাব অবলম্বনে যথাক্রমে 'অন্তর ন্যাশনাল সঙ্গীত', 'রক্ত-পতাকার গান' ও 'জাগর তূর্য' রচনা। জুলাই মাসে 'গণবাণী' অফিসে পুলিশের হানা। আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কিত বাদ-প্রতিবাদ। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, নজরুল, সজনীকান্ত দাস, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ সাহিত্যিক এবং 'প্রবাসী', 'শনিবারের চিঠি', 'কল্লোল', 'কালিকলম' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বিতর্ক। ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্র পরিষদে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ, 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধ এবং নজরুলের 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' প্রবন্ধ, 'রক্ত' অর্থে 'খুন' শব্দের ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক। বিতর্কের অবসানে প্রমথ চৌধুরীর 'বাংলা সাহিত্যে খুনের মামলা' প্রবন্ধ।

'ইসলাম দর্শন', 'মোসলেম দর্পণ' প্রভৃতি রক্ষণশীল মুসলমান পত্রিকায় নজরুল-সমালোচনা। ইব্‌রাহিম খান, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আবুল হুসেনের নজরুল-সমর্থন।

১৯২৮ ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান, এই সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীতের জন্যে 'নতুনের গান' রচনা ['চল্ চল্ চল্'] ঢাকায় অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, ফজিলতুন্নেসা, প্রতিভা সোম, উমা মৈত্র প্রমুখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। মে মাসে নজরুলের মাতা জাহেদা খাতুনের এন্তেকাল।

সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে শরৎ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দিলীপকুমার রায়, সাহানা দেবী ও নলিনীকান্ত সরকারের সঙ্গে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশনা।

অক্টোবর 'সঞ্চিতা' প্রকাশ। 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় নজরুল বিরোধিতা। 'সওগাত' পত্রিকার নজরুল সমর্থন। ডিসেম্বর মাসে নজরুলের রংপুর ও রাজশাহী সফর।

কলকাতায় নিখিল ভারত কৃষক ও শ্রমিক দলের সম্মেলনে যোগদান। নেহেরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কলকাতায় নিখিল ভারত সোশিয়ালিস্ট যুবক কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান, কবি গোলাম মোস্তফার নজরুল-বিরোধিতা।

ডিসেম্বরের শেষে কৃষ্ণনগর থেকে নজরুলের কলকাতা প্রত্যাবর্তন, 'সওগাতে' যোগদান। প্রথমে ১১নং ওয়েলেস্‌লি স্ট্রিটে 'সওগাত' অফিস সংলগ্ন ভাড়া বাড়িতে ও পরে ৮/১ পান বাগান লেনে ভাড়া বাড়িতে বসবাস। নজরুলের সঙ্গে গ্রামোফোন কোম্পানির যোগাযোগ।

১৯২৯ ১৫ই ডিসেম্বর এলবার্ট হলে নজরুলকে জাতীয় সংবর্ধনা প্রদান, উদ্যোক্তা 'সওগাত' সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, হবীবুল্লাহ্ বাহার প্রমুখ। সংবর্ধনা সভায় সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রধান অতিথি সুভাষচন্দ্র বসু।

১৯৩০ 'প্রলয়-শিখা' প্রকাশ, কবির বিরুদ্ধে মামলা ও ছয় মাসের কারাদণ্ড। কিন্তু গান্ধি-আরউইন চুক্তির ফলে ও সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার দরুণ কারাবাস থেকে রেহাই। কবির দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যু।

১৯৩১ সিনেমা ও মঞ্চ-জগতের সঙ্গে যোগাযোগ।

'আলেয়া' গীতিনাট্য রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ। নজরুলের অভিনয়ে অংশগ্রহণ। গ্রীষ্মে 'বর্ষবাণী' সম্পাদিকা জাহান আরা চৌধুরীর সঙ্গে দার্জিলিং ভ্রমণ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

১৯৩২ নভেম্বরে সিরাজগঞ্জে 'বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনে' সভাপতিত্ব।

ডিসেম্বরে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের' পঞ্চম অধিবেশনে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন।

১৯৩৪ 'ধ্রুব' চিত্রে নারদের ভূমিকায় অভিনয়, সঙ্গীত পরিচালনা।

গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকান 'কলগীতি' প্রতিষ্ঠা।

১৯৩৬ ফরিদপুর 'মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশনের কনফারেন্সে' সভাপতিত্ব।

১৯৩৮ এপ্রিলে, কলকাতায় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে' কাব্য শাখার অধিবেশনে সভাপতিত্ব।

ছায়াচিত্র 'বিদ্যাপতি'র কাহিনী রচনা।

১৯৩৯ ছায়াচিত্র 'সাপুড়ে'র কাহিনী রচনা।

১৯৪০ কলকাতা বেতারে 'হারামণি', 'নবরাগ মালিকা' প্রভৃতি নিয়মিত সঙ্গীত অনুষ্ঠান প্রচার। লুপ্ত রাগ-রাগিণীর উদ্ধার ও নবসৃষ্ট রাগিণীর প্রচার অনুষ্ঠান দুটির বৈশিষ্ট্য।

প্রমীলা নজরুল পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত।

১৯৪১ মার্চ, বনগাঁ সাহিত্য-সভার চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব।

অক্টোবর মাসে, নব পর্যায়ে প্রকাশিত 'নবযুগে'র প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত। ডিসেম্বরে কলকাতা মুসলিম ছাত্র সম্মেলনে ভাষণ।

৫ই ও ৬ই এপ্রিল নজরুলের সভাপতিত্বে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র রজত জুবিলি উৎসবে সভাপতিরূপে জীবনের শেষ গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান, 'যদি আর বাঁশি না বাজে'।

১৯৪২ ১০ই জুলাই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। ১৯শে জুলাই, কবি জুলফিকার হায়দারের চেষ্টায়, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আর্থিক সহায়তায় নজরুলের বায়ু পরিবর্তনের জন্য ডাঃ সরকারের সঙ্গে মধুপুর গমন। মধুপুরে অবস্থার অবনতি। ২১শে সেপ্টেম্বর মধুপুর থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। অক্টোবর মাসের শেষের দিকে ডা. গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'লুম্বিনি পার্কে' চিকিৎসার জন্য ভর্তি। অবস্থার উন্নতি না ঘটায় তিন মাস পর বাড়িতে প্রত্যাবর্তন। কলকাতায় নজরুল সাহায্য কমিটি গঠন।

সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ—	ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
যুগ্ম সম্পাদক—	সজনীকান্ত দাস
	জুলফিকার হায়দার
কার্যনির্বাহী কমিটির সভ্য—	এ. এফ. রহমান
	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
	বিমলানন্দ তর্কতীর্থ
	সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
	তুষারকান্তি ঘোষ
	চপলাকান্ত ভট্টাচার্য
	সৈয়দ বদরুদ্দোজা
	গোপাল হালদার।

এই সাহায্য কমিটি কর্তৃক পাঁচ মাস কবিকে মাসিক দুইশত টাকা করে সাহায্য প্রদান।

১৯৪৪ বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার 'নজরুল-সংখ্যা' (কার্তিক-পৌষ ১৩৫১) প্রকাশ।

১৯৪৫ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নজরুলকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান।

১৯৪৬ নজরুল পরিবারের অভিভাবিকা নজরুলের শাশুড়ি গিরিবালা দেবী নিরুদ্দেশ। নজরুলের সৃষ্টিকর্ম মূল্যায়নে প্রথম গ্রন্থ কাজী আবদুল ওদুদ কৃত 'নজরুল-প্রতিভা' প্রকাশ। গ্রন্থের পরিশিষ্টে কবি আবদুল কাদির প্রণীত নজরুল-জীবনীর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা সংযোজিত।

১৯৫২ 'নজরুল নিরাময় সমিতি' গঠন। সম্পাদক কাজী আবদুল ওদুদ। জুলাই মাসে নজরুল ও তাঁর পত্নীকে রাঁচি মানসিক হাসপাতালে প্রেরণ। চার মাস চিকিৎসা, সুফলের অভাবে কলকাতা আনয়ন।

১৯৫৩ মে মাসে নজরুল ও তাঁর পত্নী প্রমীলাকে চিকিৎসার জন্য লণ্ডন প্রেরণ করা হয়। 'জল আজাদ' নামক জাহাজে লণ্ডন যাত্রার আগে কবি ও কবি-পত্নী বোম্বাইয়ের (বর্তমানে মুম্বাই) মেরিন ড্রাইভের 'সী গ্রীন হোটেল'-এ

অবস্থান করেন। ঐ হোটেলের সভাকক্ষে নজরুলের সম্মানে এক বিরাট সংবর্ধনা–সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন উপমহাদেশের বহু খ্যাতনামা চলচ্চিত্র–শিল্পী, কবি–সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞ। অশোককুমার, প্রদীপকুমার, কে. এস. ইউসুফ, কামাল আমরোহী, কে. এ. আব্বাস, মুকেশ, নৌশাদ আলী ছাড়াও, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যোশ মালিহাবাদী, কাইফি আজমী, খৈয়াম, সাহীর লুধিয়ানভী, মাজাজ লাখনভী, কাতিল সিপাহী, ফিরাক গোরকপুরী, ফয়েজ আহ্‌মদ ফয়েজ। নজরুল–বন্দনায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কাইফী আজমী ও শাতীর লুধিয়ানভী। নজরুলের 'ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি' গানটি পরিবেশন করেন হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে কবির চিকিৎসার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ৫০ হাজার টাকা তুলে একটি থলিতে কবির হাতে প্রদান করা হয়। এই সংবর্ধনা–অনুষ্ঠান নজরুল–জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। [তথ্যসূত্র : 'নজরুল স্মৃতি', ডঃ অশোক বাগচী, নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, জুন, ১৯৯৫]। লন্ডনে মানসিক চিকিৎসক উইলিয়ম স্যারগন্ট, ই. এ. বেটন, ম্যাকসিক ও রাসেল ব্রেনের মধ্যে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যাপারে মতভেদ, ডিসেম্বর মাসে নজরুলকে ভিয়েনাতে প্রেরণ। ভিয়েনায় বিখ্যাত স্নায়ুচিকিৎসক ডা. হ্যান্স হফ্ কর্তৃক সেরিব্রাল এনজিওগ্রাম পরীক্ষার ফল, নজরুল 'পিকস ডিজিজ' নামে মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত এবং তা চিকিৎসার বাইরে। ডিসেম্বর মাসে নজরুল ও তাঁর পত্নীকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়।

১৯৬০ ভারত সরকার কর্তৃক নজরুলকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দান।

১৯৬২ ৩০শে জুন নজরুল–পত্নী প্রমীলা নজরুলের দীর্ঘ রোগ ভোগের পর পরলোক গমন। প্রমীলা নজরুলকে চুরুলিয়ায় দাফন। নজরুলের দুই পুত্র কাজী সব্যসাচী ইসলাম ও কাজী অনিরুদ্ধ ইসলামের জন্ম ও মৃত্যু যথাক্রমে ১৯২৯ ও ১৯৭৪ এবং ১৯৩১ ও ১৯৭৯ সালে।

১৯৬৬ কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় ঢাকার 'কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড' কর্তৃক 'নজরুল–রচনাবলী' প্রথম খণ্ড প্রকাশ।

১৯৬৯ সম্বিতহারা কবির সত্তর বৎসর পূর্ণ এবং সর্বত্র কবি কাজী নজরুল ইসলামের সপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন। কলকাতার রবীন্দ্র–ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি প্রদান।

১৯৭১ ২৫শে মে নজরুল জন্মবার্ষিকীর দিন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিচালক প্রবাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নব পর্যায়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার শুরু।

১৯৭২ স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম নজরুল–জন্মবার্ষিকীর প্রাক্কালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে নজরুলকে সপরিবার ঢাকায় আনয়ন, ধানমণ্ডিতে কবিভবনে অবস্থান এবং সেখানে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উড্ডীন। স্বাধীন বাংলাদেশে কবির প্রথম জন্মবার্ষিকী কবিকে নিয়ে

উদ্‌যাপন। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক কবিভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

১৯৭৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি প্রদান।

১৯৭৫ ২২শে জুলাই কবিকে পি. জি. হাসপাতালে স্থানান্তর, ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট মোট এক বছর এক মাস আট দিন পিজি হাসপাতালের ১৯৭নং কেবিনে নিঃসঙ্গ জীবন।

১৯৭৬ ২১শে ফেব্রুয়ারি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'একুশে পদক' প্রচলন ও নজরুলকে পদক প্রদান।

ঐ বছরেই আগস্ট মাসে কবির স্বাস্থ্যের অবনতি। ২৭শে আগস্ট শুক্রবার বিকেল থেকে কবির শরীরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তিনি ব্রঙ্কো-নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। ২৯শে আগস্ট রবিবার সকালে কবির দেহের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়ে ১০৫ ডিগ্রি অতিক্রম করে যায়। কবিকে অক্সিজেন দেওয়া হয় এবং সাকশান-এর সাহায্যে কবির ফুসফুস থেকে কফ ও কাশি বের করার চেষ্টা চলে। কিন্তু চিকিৎসকদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও কবির অবস্থার উন্নতি হয় না—সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১২ই ভাদ্র ১৩৮৩ সাল মোতাবেক ২৯শে আগস্ট ১৯৭৬ সকাল ১০টা ১০ মিনিটে কবি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। বেতার এবং টেলিভিশনে কবির মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হলে পিজি হাসপাতালে শোকাহত মানুষের ঢল। কবির মরদেহ প্রথমে পিজি হাসপাতালের গাড়ি বারান্দার ওপরে, পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি-র সামনে রাখা হয়। অবিরাম জনস্রোত এবং কবির মরদেহে পুষ্প দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

কবির নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় বাদ আসর সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে। স্মরণকালের সর্ববৃহৎ জানাজায় লক্ষ লক্ষ মানুষ শামিল হন। নামাজে জানাজা শেষে শোভাযাত্রা সহযোগে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা শোভিত কবির মরদেহ বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে নিয়ে যাওয়া হয়। কবির মরদেহ বহন করেন তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল এম. এইচ. খান, বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ. জি. মাহমুদ, বি.ডি.আর. প্রধান মেজর জেনারেল দস্তগীর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন। পরবর্তী কালে কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদা প্রদান করা হয় ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৯৮-২০০০ সালে বিশ্বব্যাপী মহাসমারোহে নজরুল-জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন।

গ্রন্থপঞ্জি

ব্যথার দান	গল্প। ফাল্গুন ১৩২৮, ১লা মার্চ ১৯২২। উৎসর্গ—'মানসী আমার! মাথার কাঁটা নিয়েছিলুম বলে ক্ষমা করোনি, তাই বুকের কাঁটা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলুম'।
অগ্নি-বীণা	কবিতা। কার্তিক ১৩২৯, ২৫শে অক্টোবর ১৯২২। উৎসর্গ—'ভাঙা-বাংলার রাঙা-যুগের আদি পুরোহিত, সাগ্নিক বীর শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু'।
যুগ-বাণী	প্রবন্ধ। কার্তিক ১৩২৯, ২৬শে অক্টোবর ১৯২২। বাজেয়াপ্ত ২৩শে নভেম্বর ১৯২২, দ্বিতীয় মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬।
রাজবন্দীর জবানবন্দী	ভাষণ। ১৩২৯ সাল, ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ। পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।
দোলন-চাঁপা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩০, অক্টোবর ১৯২৩।
বিষের বাঁশী	কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩১, ১০ই আগস্ট ১৯২৪। উৎসর্গ—'বাংলার অগ্নি-নাগিনী মেয়ে মুসলিম-মহিলা-কুল-গৌরব আমার জগজ্জননী-স্বরূপা মা মিসেস এম. রহমান সাহেবার পবিত্র চরণারবিন্দে।' বাজেয়াপ্ত ২২শে অক্টোবর ১৯২৪, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ২৯শে এপ্রিল ১৯৪৫।
ভাঙার গান	কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩১, আগস্ট ১৯২৪। উৎসর্গ—'মেদিনীপুরবাসীর উদ্দেশে'। বাজেয়াপ্ত ১১ই নভেম্বর ১৯২৪, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪৯।
রিক্তের বেদন	গল্প। পৌষ ১৩৩১, ১২ই জানুয়ারি ১৯২৫।
চিত্তনামা	কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩২, আগস্ট ১৯২৫, উৎসর্গ—'মাতা বাসন্তী দেবীর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দে'।
ছায়ানট	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩২, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯২৫। উৎসর্গ—'আমার শ্রেয়তম রাজলাঞ্ছিত বন্ধু মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও কুতুবউদ্দীন আহ্‌মদ করকমলে'।
সাম্যবাদী	কবিতা। পৌষ ১৩৩২, ২০শে ডিসেম্বর ১৯২৫।
পূবের হাওয়া	কবিতা ও গান। মাঘ ১৩৩২, ৩০শে জানুয়ারি ১৯২৬।

ঝিঙে ফুল	ছোটদের কবিতা। চৈত্র ১৩৩২, ১৪ই এপ্রিল ১৯২৬।
দুর্দিনের যাত্রী	প্রবন্ধ। আশ্বিন ১৩৩৩, অক্টোবর ১৯২৬।
সর্বহারা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩৩, ২৫শে অক্টোবর ১৯২৬। উৎসর্গ—'মা (বিরজাসুন্দরী দেবী)-র শ্রীচরণার-বিন্দে'।
রুদ্রমঙ্গল	প্রবন্ধ। ১৯২৭।
ফণি-মনসা	কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩৪, ২৯শে জুলাই ১৯২৭।
বাঁধনহারা	উপন্যাস। শ্রাবণ ১৩৩৪, আগস্ট ১৯২৭। উৎসর্গ—'সুর-সুন্দর শ্রীনলিনীকান্ত সরকার করকমলেষু'।
সিন্ধু-হিন্দোল	কবিতা। উৎসর্গ—বাহার ও নাহারকে, ১৩৩৪/১৯২৮।
সঞ্চিতা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩৫, ২রা অক্টোবর ১৯২৮।
সঞ্চিতা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩৫, ১৪ই অক্টোবর ১৯২৮। উৎসর্গ— 'বিশ্বকবিসম্রাট শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু'।
বুলবুল	গান। কার্তিক ১৩৩৫, ১৫ই নভেম্বর, ১৯২৮। উৎসর্গ—'সুর-শিল্পী, বন্ধু দিলীপকুমার রায় করকমলেষু'।
জিঞ্জীর	কবিতা ও গান। কার্তিক ১৩৩৫, ১৫ই নভেম্বর ১৯২৮।
চক্রবাক	কবিতা। ভাদ্র ১৩৩৬, ১২ই আগস্ট ১৯২৯। উৎসর্গ— 'বিরাট-প্রাণ, কবি, দরদী প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র শ্রীচরণারবিন্দেষু'।
সন্ধ্যা	কবিতা ও গান। ভাদ্র ১৩৩৬, ১২ই আগস্ট ১৯২৯। উৎসর্গ—'মাদারিপুর 'শান্তি-সেনা'-র কর-শতদলে ও বীর সেনানায়কের শ্রীচরণাম্বুজে'।
চোখের চাতক	গান। পৌষ ১৩৩৬, ২১শে ডিসেম্বর ১৯২৯। উৎসর্গ— 'কল্যাণীয়া বীণা-কণ্ঠী শ্রীমতী প্রতিভা সোম জয়যুক্তাসু'।
মৃত্যু-ক্ষুধা	উপন্যাস। মাঘ ১৩৩৬, জানুয়ারি ১৯৩০।
রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ	অনুবাদ কবিতা। আষাঢ় ১৩৩৭, ১৪ই জুলাই ১৯৩০। উৎসর্গ—'বাবা বুলবুল ! ...'
নজরুল-গীতিকা	গান। ভাদ্র ১৩৩৭, ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৩০। উৎসর্গ— 'আমার গানের বুলবুলিরা ! ....'
ঝিলিমিলি	নাটিকা। অগ্রহায়ণ ১৩৩৭, ১৫ই নভেম্বর ১৯৩০।
প্রলয়-শিখা	কবিতা ও গান। ১৩৩৭, আগস্ট ১৯৩০। গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০। কবির বিরুদ্ধে ১১ই ডিসেম্বর মামলা এবং ছয় মাসের কারাদণ্ড, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৩০

	কবির জামিন লাভ, আপিল। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা মার্চে অনুষ্ঠিত গান্ধি-আরউইন চুক্তির ফলে সরকার পক্ষের অনুপস্থিতিতে ৩০শে মার্চ ১৯৩১ কলিকাতা হাইকোর্টের রায়ে কবির মামলা থেকে অব্যাহতি, কিন্তু 'প্রলয়-শিখা'র নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮।
কুহেলিকা	উপন্যাস। শ্রাবণ ১৩৩৮, ২১শে জুলাই ১৯৩১।
নজরুল-স্বরলিপি	স্বরলিপি। ভাদ্র ১৩৩৮, আগস্ট ১৯৩১।
চন্দ্রবিন্দু	গান। ১৩৩৮, সেপ্টেম্বর ১৯৩১। উৎসর্গ—'পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমদ্দাঠাকুর—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের শ্রীচরণকমলেষু'। বাজেয়াপ্ত ১৪ই অক্টোবর ১৯৩১। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ৩০শে নভেম্বর ১৯৪৫।
শিউলিমালা	গল্প। কার্তিক ১৩৩৮, ১৬ই অক্টোবর ১৯৩১।
আলেয়া	গীতিনাট্য। ১৩৩৮, ১৯৩১। উৎসর্গ—'নটরাজের চির নৃত্যসাথী সকল নট-নটীর নামে 'আলেয়া' উৎসর্গ করিলাম'।
সুরসাকী	গান। আষাঢ় ১৩৩৯, ৭ই জুলাই ১৯৩২।
বন-গীতি	গান। আশ্বিন ১৩৩৯, ১৩ই অক্টোবর ১৯৩২। উৎসর্গ—'ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকলাবিদ আমার গানের ওস্তাদ জমিরউদ্দিন খান সাহেবের দস্ত মোবারকে'।
জুলফিকার	গান। আশ্বিন ১৩৩৯, ১৩ই অক্টোবর।
পুতুলের বিয়ে	ছোটদের নাটিকা ও কবিতা। সম্ভবত চৈত্র ১৩৪০, এপ্রিল ১৯৩৩।
গুল-বাগিচা	গান। আষাঢ় ১৩৪০, ২৭শে জুন ১৯৩৩। উৎসর্গ—'স্বদেশী মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানির স্বত্বাধিকারী আমার অন্তরতম বন্ধু শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ অভিন্নহৃদয়েষু—'
কাব্য-আমপারা	অনুবাদ। অগ্রহায়ণ ১৩৪০, ২৭শে নভেম্বর ১৯৩৩। উৎসর্গ—'বাংলার নায়েবে-নবী মৌলবি সাহেবানদের দস্ত মোবারকে'।
গীতি-শতদল	গান। বৈশাখ ১৩৪১, এপ্রিল ১৯৩৪।
সুরলিপি	স্বরলিপি। ভাদ্র ১৩৪১, ১৬ই আগস্ট ১৯৩৪।
সুরমুকুর	স্বরলিপি। আশ্বিন ১৩৪১, ৪ঠা অক্টোবর ১৯৩৪।
গানের মালা	গান। কার্তিক ১৩৪১, ২৩শে অক্টোবর ১৯৩৪। উৎসর্গ—'পরম স্নেহভাজন শ্রীমান অনিলকুমার দাস কল্যাণীয়েষু—'।

মক্তব সাহিত্য	পাঠ্যপুস্তক। শ্রাবণ ১৩৪২, ৩১শে জুলাই ১৯৩৫।
নির্ঝর	কবিতা ও গান। মাঘ ১৩৪৫, ২৩শে জানুয়ারি ১৯৩৯।
নতুন চাঁদ	কবিতা। চৈত্র ১৩৫১, মার্চ ১৯৪৫।
মরু-ভাস্কর	কাব্য। ১৩৫৭, ১৯৫১।
বুলবুল (দ্বিতীয় খণ্ড)	গান। ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯।
সঞ্চয়ন	কবিতা ও গান। ১৩৬২, ১৯৫৫।
শেষ সওগাত	কবিতা ও গান। বৈশাখ, ১৩৬৫, ১৯৫৯।
রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম	অনুবাদ। অগ্রহায়ণ ১৩৬৫, ডিসেম্বর ১৯৫৯।
মধুমালা	গীতিনাট্য। মাঘ ১৩৬৫, জানুয়ারি ১৯৬০।
ঝড়	কবিতা ও গান। মাঘ ১৩৬৭, জানুয়ারি ১৯৬১।
ধূমকেতু	প্রবন্ধ। মাঘ ১৩৬৭, জানুয়ারি ১৯৬১।
পিলে পটকা পুতুলের বিয়ে	ছোটদের কবিতা ও নাটিকা। ১৩৭০, ১৯৬৪।
রাঙাজবা	শ্যামাসঙ্গীত। বৈশাখ ১৩৭৩, এপ্রিল ১৯৬৬।
নজরুল-রচনা-সম্ভার	আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮, মে ১৯৬৫।
নজরুল-রচনাবলী	প্রথম খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩, ডিসেম্বর ১৯৬৬। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	দ্বিতীয় খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। পৌষ ১৩৭৩, ডিসেম্বর ১৯৬৭। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	তৃতীয় খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। ফাল্গুন ১৩৭৬, ফেব্রুয়ারি ১৯৭০। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
সন্ধ্যামালতী	গান। মিত্র ও ঘোষ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রাবণ ১৩৭৭, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৭১।
নজরুল-রচনাবলী	চতুর্থ খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪, মে ১৯৭৭। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	পঞ্চম খণ্ড, প্রথমার্ধ। আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১, মে ১৯৮৪। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ। পৌষ ১৩৯১, ডিসেম্বর ১৯৮৪। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
নজরুল-গীতি অখণ্ড	আবদুল আজিজ আল্-আমান সম্পাদিত। সেপ্টেম্বর ১৯৭৮। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
অপ্রকাশিত নজরুল	আবদুল আজিজ আল্-আমান সম্পাদিত। অগ্রহায়ণ ১৩৯৬, নভেম্বর ১৯৮৯। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
লেখার রেখায় রইল আড়াল	কবিতা ও গান। আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত। ভাদ্র ১৪০৫, আগস্ট ১৯৯৮। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

জাগো সুন্দর চির কিশোর	সংগ্রহ ও সম্পাদনা : আসাদুল হক। ২৮শে আগস্ট ১৯৯১। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
নজরুলের 'ধূমকেতু'	নজরুল সম্পাদিত পত্রিকার একত্রিত পুনর্মুদ্রণ। সংগ্রহ ও সম্পাদনা সেলিনা বাহার জামান, ফাল্গুন ১৪০৭, ফেব্রুয়ারি ২০০১।
নজরুলের 'লাঙল'	নজরুল সম্পাদিত পত্রিকার একত্রিত পুনর্মুদ্রণ। মুহম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮, মে ২০০১।
কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র	প্রথম খণ্ড। কলকাতা বইমেলা ২০০১। দ্বিতীয় খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮, জুন ২০০১। তৃতীয় খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯, জুন ২০০২। চতুর্থ খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪১০, জুন ২০০৩। পঞ্চম খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪১১, জুন ২০০৪। ষষ্ঠ খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪১২, জুন ২০০৫। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।
নজরুলের হারানো গানের খাতা	সম্পাদনা : মুহম্মদ নূরুল হুদা, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, আষাঢ় ১৪০৪, জুন ১৯৯৭।
নজরুল-গীতি অখণ্ড	প্রথম সংস্করণ : সম্পাদক, আবদুল আজিজ আল-আমান। তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ : সম্পাদক, ব্রহ্মমোহন ঠাকুর। জানুয়ারি ২০০৪। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
নজরুল সঙ্গীত সমগ্র	সম্পাদনা : রশিদুন্নবী, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, কার্তিক ১৪১৩/অক্টোবর ২০০৬।

অগ্রন্থিত গান এবং বাণীর পাঠান্তর প্রসঙ্গে

এটা সুবিদিত যে, নজরুল তাঁর অসংখ্য গানে ও বহু কবিতায় বাণীর সংস্কার, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করেছেন। মূল পাণ্ডুলিপিতে তো বটেই, গ্রামোফোন রেকর্ডে শিল্পী-কণ্ঠে গান ধারণ করার আগেও অনেক গানের বাণীতে সংস্কার, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। এ-কারণেই, নজরুলের গানের বাণীর পাঠে পত্রিকা, গ্রন্থ ও রেকর্ডে পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। উল্লেখ্য, 'নজরুল রচনাবলী'র জন্মশতবর্ষ সংস্করণে (২০০৫) প্রতিটি খণ্ডেই যথাসম্ভব গানের বাণীর পার্থক্য ও পাঠান্তর পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে। এই কাজটি করা হয়েছে আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে ধারণকৃত গানের বাণীর সঙ্গে মিলিয়ে। বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গের নজরুল-সঙ্গীত গবেষক এবং নজরুল বিশেষজ্ঞদের রচিত নজরুল-সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ, সংকলন ও তথ্যাদির আলোকে বর্তমান খণ্ডে গানের বাণীর পাঠ সংকলিত হয়েছে।

'নজরুল-রচনাবলী'র বর্তমান খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত নজরুলের 'অগ্রন্থিত গান'-এর বাণীর পাঠান্তর করা হয়েছে আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে ধারণকৃত বাণীর আলোকে পশ্চিম বঙ্গের নজরুল-সঙ্গীত গবেষক, সংগ্রাহক এবং ডক্টর ব্রহ্মমোহন ঠাকুর সম্পাদিত এবং কলকাতার হরফ প্রকাশনী প্রকাশিত 'নজরুল-গীতি-অখণ্ড' (২০০৪) গ্রন্থে (সম্পাদক নজরুল-গবেষক আবদুল আজীজ আল-আমান) অন্তর্ভুক্ত নজরুল-সঙ্গীতের বাণীর সঙ্গে মিলিয়ে। পরলোকগত ডক্টর ব্রহ্মমোহন ঠাকুর ছিলেন নজরুল-সঙ্গীত এবং নজরুলের-গানের গ্রামোফোন রেকর্ডের ভাণ্ডারী। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় ঢাকার নজরুল ইন্সটিটিউটকে নজরুল-সঙ্গীতের প্রায় দেড় হাজার গ্রামোফোন রেকর্ডের ক্যাসেট উপহার দিয়ে গেছেন। উল্লেখ্য, তাঁর 'নজরুল-সঙ্গীত নির্দেশিকা' শীর্ষক একটি গ্রন্থ ঢাকার নজরুল ইন্সটিটিউট থেকে ২৫শে মে, ২০০৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এই গবেষণাগ্রন্থে ২৬৯৮টি নজরুল-সঙ্গীত সম্পর্কে বহু দুর্লভ তথ্য ও তথ্য-সূত্র এবং গ্রামোফোন কোম্পানীর নাম, রেকর্ড নম্বর এবং শিল্পীর নাম রয়েছে। নজরুলের অগ্রন্থিত গানের বাণীর পাঠান্তর তৈরিতে এই গ্রন্থটি ব্রহ্মমোহন ঠাকুর সম্পাদিত 'নজরুল-গীতি' অখণ্ড (তৃতীয় সংস্করণ ২০০৪), নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত রশিদুন্ নবী সম্পাদিত 'নজরুল-সঙ্গীত সমগ্র' (২০০৬) সহায়ক হয়েছে। যে-সব গানের বাণীতে পার্থক্য বেশি রয়েছে সে-গুলোর কয়েকটির পাঠান্তর এখানে দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য যে, 'নজরুল-রচনাবলী'র অষ্টম খণ্ডে (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ব্রহ্মমোহন ঠাকুর সংগৃহীত ও সম্পাদিত এবং নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত 'অগ্রন্থিত নজরুল রচনা সংগ্রহ' (জানুয়ারি ২০০১) গ্রন্থের ১২৭টি নজরুল-সঙ্গীত। পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত 'নজরুল রচনাবলী'র তৃতীয় খণ্ডে বহু 'অগ্রন্থিত কবিতা ও গান' একসঙ্গে ছিল। 'নজরুল-রচনাবলী'র জন্মশতবর্ষ সংস্করণে (২০০৫) অগ্রন্থিত কবিতাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে নবম খণ্ডে, অগ্রন্থিত গানসমূহের অধিকাংশ দশম খণ্ডে এবং অবশিষ্ট গানসমূহ বর্তমান খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখানে প্রদত্ত গ্রামোফোন রেকর্ডের নম্বর ও অন্যান্য তথ্য নেওয়া হয়েছে ব্রহ্মমোহন ঠাকুর সম্পাদিত 'নজরুল-সঙ্গীত নির্দেশিকা' গ্রন্থ থেকে।

অগ্রন্থিত গানের বাণীর পাঠান্তর

গানের প্রথম পংক্তি	নজরুল-রচনাবলী-৩য় খণ্ড	'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) ২০০৪
১	২	৩
১. ও কি ঈদের চাঁদ গো	'ও কি ঈদের চাঁদ গো' 'নজরুল রচনাবলী' ৩য় খণ্ডে পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'জোহরা তারা রূপ দেখে তার ঝুরিছে আসমানে', 'তার সাদা কবুতরের মত চরণ দু'টি ছুঁয়ে' নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' (২০০৬) গ্রন্থে পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'যাহারা তার রূপ দেখে তারা ঝুরিছে আস্‌মানে,' 'সাদা কবুতরের মত চরণ দু'টি ছুঁয়ে'	'ও কি ঈদের চাঁদ গো' 'নজরুল গীতি' অখণ্ডে (২০০৪) গানের পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'যাহারা তার রূপ দেখে তারা ঝুরিছে আস্‌মানে', 'সাদা কবুতরের মত চরণ দু'টি ছুঁয়ে' গানটির রেকর্ড নং এন ৯৯০৬ এইচ.এম.ভি. জুন ১৯৩৭ শিল্পী : রাবেয়া খাতুন সুর : নজরুল
২. রুমু রুমু ঝুম রুমু ঝুমু বাজে নূপুর।	'রুমু রুমু ঝুম রুমু ঝুমু বাজে নূপুর।' গানের প্রথম পঙ্‌ক্তিটি নিম্নরূপ : 'রুমু রুমু ঝুম রুমু ঝুমু বাজে নূপুর।' 'নজরুল রচনাবলী' ৩য় খণ্ডে গানের অন্য দুটি পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ : 'তালে তালে দোলে নাচের নেশায় চুর॥' 'নাচন শেখালে ময়ূর মরালে মরীচি–মায়া একি মরুতে ছড়ালে।' 'গিরিদরি বনে দোল লাগে নাচনের শুনে তারি সুর॥' নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' (২০০৬) গ্রন্থে গানের প্রথম বোলেই ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়— 'রুমু রুমু রুমু ঝুমু ঝুমু বাজে নূপুর' অন্যান্য পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ— 'তালে তালে দোদুল দোলে নাচের নেশায় চুর॥' 'নাচন শিখালে ময়ূর মরালে মরীচি–মায়া মরুতে ছড়ালে।' 'গিরিদরি বনে গো দোল লাগে নাচনের শুনে তারি সুর॥'	'রুমু রুমু ঝুম রুমু ঝুমু বাজে নূপুর'॥ 'নজরুল-গীতি' অখণ্ডে (২০০৪) গানের পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'রুমু রুম ঝুম রুমু ঝুমু বাজে নূপুর॥' 'তালে তালে দোদুল দোলে নাচের নেশায় চুর॥ 'নাচন শিখালে ময়ূর মরালে, 'মরিচি মায়া মরুতে ছড়ালে।' 'গিরি–দরী বনে গো দোল লাগে নাচনের শুনে তার সুর॥' গানটির রেকর্ড নং ১৭৯ জে.এন. জি ৪ মেগাফোন, ১৯৩২ শিল্পী : মিস বীণাপাণি

১	২	৩
৩. কেন আসিলে ভালোবাসিলে	'কেন আসিলে ভালোবাসিলে' 'নজরুল রচনাবলী' ৩য় খণ্ডে (১৯৯৩) কয়েকটি পঙ্ক্তি নিম্নরূপ : 'দিবে না ধরা জীবনে যদি।' 'বিশাল চোখে মিশায়ে মধু' 'কেন জাগাইলে আঘাত দিয়ে' 'করে হাহাকার বুকেরি তলায়' 'ওগো কত নিরাশায় কত অভিমান ফেনায়ে ওঠে গভীর ব্যথায়' 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' (২০০৬) গ্রন্থে পঙ্ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'দিলে না ধরা জীবনে যদি' 'বিলাশ চোখে মিশায়ে মরু' কেন জাগালে আঘাত দিয়ে' 'করে হাহাকার বুকেরি তলায়' 'ওগো কত নিরাশায় কত অভিমান ফেনায়ে ওঠে গভীর ব্যথায়।'	'কেন আসিলে ভালোবাসিলে' কলকাতা 'হরফ' প্রকাশনী প্রকাশিত 'নজরুল গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থে স্তবকগুলো নিম্নরূপ— 'দিবে না ধরা জীবনে যদি' 'বিশাল চোখে মিশায়ে মরু' 'কেন জাগাইলে আঘাত দিয়ে।' 'করে হাহাকার বুকের তলায়' 'ওগো কত নিরাশা, কত অভিমান, ফেনায়ে ওঠে গভীর ব্যথায় ; গানটির রেকর্ড নং জে.এন.জি. ৪৪ মেগাফোন, এপ্রিল ১৯৩৩ শিল্পী : নজরুল সুর : নজরুল
৪. গগনে সঘনে চমকিছে দামিনী।	'গগনে সঘনে চমকিছে দামিনী।' 'নজরুল-রচনাবলী'তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) দুটি পঙ্ক্তি নিম্নরূপ : 'মেঘ ঘন রসে রিনিঝিনি বরষে।' 'অভিসারে চলে খুঁজি কাহাকে।' 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' (২০০৬) গ্রন্থে পঙ্ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'মেঘ-ঘন-রস রিমঝিম বরষে।' 'অভিসারে চলে খুঁজে কাহাকে।'	'গগনে সঘনে চমকিছে দামিনী।' 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) (২০০৪) গ্রন্থে পঙ্ক্তি দুটি নিম্নরূপ : 'মেঘ-ঘন-রস রিমঝিম বরষে।' 'অভিসারে চলে খুঁজে কাহাকে।' গানটির রেকর্ড নং এন. ২৭৩০১ এইচ.এম.ভি., আগস্ট ১৯৪২ শিল্পী : সত্যেন ঘোষাল।

১	২	৩
৫. থৈ থৈ জলে ডুবে গেছে পথ	'থৈ থৈ জলে ডুবে গেছে পথ' 'নজরুল-রচনাবলী', ৩য় খণ্ডে (১৯৯৩) কয়েকটি পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ : 'আমার দুয়ার খোলা॥' 'ঘন মেঘে ঢাকা সবার দৃষ্টি ;' 'গাহি প্রেম-হিন্দোলা।' 'এলো যদি আজ মিলনের নিশি' 'আমার ঝুলনা বাঁধিয়া শ্রীহরি,' 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' (২০০৬) গ্রন্থে পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : '(আছে) আমার দুয়ার খোলা।' 'ঘন মেঘে ঢাকো সবার দৃষ্টি' 'গাহি প্রেম-হিন্দোলা।' 'এলো যদি আজ মিলনের নিশি' 'আষাঢ় ঝুলনা বাঁধিয়া শ্রীহরি,'	'থৈ থৈ জলে ডুবে গেছে পথ' 'নজরুল-গীতি (অখণ্ড) ২০০৪ গ্রন্থে পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : '(আছে) আমার দুয়ার খোলা।' 'ঘন মেঘে ঢাকো সবার দৃষ্টি 'বাঁধি প্রেম-হিন্দোলা।' 'এলো যদি আজ মিলনের তিথি' 'আমার ঝুলনা বাঁধিয়া শ্রীহরি' গানটির রেকর্ড নং জি.ই. ২৫৬১ কলম্বিয়া, ডিসেম্বর ১৯৪০ শিল্পী : ঝর্ণা দে
৬. নিশি-ভোরে অশান্ত ধারায়	'নিশি ভোরে অশান্ত ধারায়' 'নজরুল রচনাবলী' ৩য় খণ্ডে (১৯৯৩) পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'আকাশ-পারে বিজুরির বীণা— যেন সুর ঝরে আকুল স্বরে॥' 'বিরহের ভার বহি কত আজ একা' 'ম্লান হয়ে এলো চোখে কাজলের রেখা অশ্রু-লোরে॥' 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' (২০০৬) নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত গ্রন্থে পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'আকাশ-পারের বিরহীর বীণায় যেন সুর ঝরে আকুল স্বরে॥' 'বিরহের ভার বহি কত আর একা' 'ম্লান হয়ে এলো চোখে কাজলের লেখা অশ্রু লোরে॥'	'নিশি ভোরে অশান্ত ধারায়' 'নজরুল গীতি'র (অখণ্ড, ২০০৪) পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'আকাশ-পারের বিরহী-বীণায় যেন সুর ঝরে ব্যাকুল স্বরে॥' 'বিরহের ভার বহি' কত আর একা?' 'ম্লান হ'য়ে এল চোখে কাজলের-লেখা অশ্রু লোর' গানটি রেকর্ড নং এফ. টি. ১২১৪৭ টুইন, ১৯৩৭। শিল্পী : মীনা রায়

	১	২	৩
৭.	বিরহের অশ্রু–সায়রে বেদনার শতদল	'বিরহের অশ্রু–সায়রে বেদনার শতদল' 'নজরুল–রচনাবলী' ৩য় খণ্ডে (১৯৯৩) পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'উদাসী অশান্ত বায়ে করে টলমল।' তব রাঙা পদতল, প্রিয়,' 'ঝড় এলো এলায়ে মেঘের কুন্তল,' 'তুমি কোথায়, হায়, নিরালায় ঝরে কমল–দল॥' 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' (২০০৬) গ্রন্থে পঙ্‌ক্তিগুলোর সাথে 'নজরুল গীতি' অখণ্ড গ্রন্থের পঙ্‌ক্তি মিল রয়েছে।	'বিরহের অশ্রু–সায়রে বেদনার শতদল' কলকাতা 'হরফ' প্রকাশনী প্রকাশিত 'নজরুল–গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থে (২০০৪) পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'উদাসী অশান্ত বায়ে টলে টলমল টলমল॥' 'তব রাঙা–পদতলে, প্রিয়,' ঝড় এলো এলো এলায়ে মেঘের কুন্তল,' 'তুমি কোথায় হায়, নিরাশায় ঝরে কমল–দল॥' রেকর্ড নং এফ. টি. ৪৯২২, টুইন শিল্পী : ভক্তিরঞ্জন রায়
৮.	বসন্ত এলো এলো এলো রে	'বসন্ত এলো এলো এলো রে' 'নজরুল–রচনাবলী'তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিগুলো নেই : 'মাধবী নিকুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে ভ্রমর গুঞ্জে গুন গুন গানে।' 'নজরুল–রচনাবলী'তে নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিগুলো আছে : 'পিউ পিউ ডেকে ওঠে পাপিয়া মহুল, পলাশ বন ব্যাপিয়া। সুরভিত সমীরণ চঞ্চল উন্মন আনে নব–যৌবন প্রাণে॥' 'নজরুল–সঙ্গীত সমগ্র' (২০০৬) গ্রন্থেও উপরোক্ত পঙ্‌ক্তিগুলো আছে এবং অন্যান্য পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'পিয়া পিয়া ডেকে ওঠে পাপিয়া মহুল, পলাশ বন ব্যাপিয়া। সুরভিত সমীরণ চঞ্চল উন্মন আনে নব–যৌবন প্রাণে॥'	'বসন্ত এলো এলো এলো রে 'নজরুল–গীতি' অখণ্ড গ্রন্থে (২০০৪) নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিগুলো আছে : 'মাধবী নিকুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে ভ্রমর গুঞ্জে গুন গুন গানে।' উক্ত গ্রন্থে নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিগুলো নেই : 'পিউ পিউ ডেকে ওঠে পাপিয়া মহুল, পলাশ বন ব্যাপিয়া। সুরভিত সমীরণ চঞ্চল উন্মন আনে নব–যৌবন প্রাণে॥' রেকর্ড নং এফ. টি ৪৮৩২, টুইন, ১৯৩৭ শিল্পী : সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়

১	২	৩
৯. দূর বেণু-কুঞ্জে বাজে মুরলি মুহু মুহু	'দূর বেণু কুঞ্জে বাজে মুরলি মুহু মুহু' 'নজরুল-রচনাবলী'তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'দূর বেণু কুঞ্জে মুরলী মুহু মুহু' 'বাশুরিয়ার সুরের কুহু।' 'নজরুল-সঙ্গীত সমগ্র'তে (২০০৬) পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'দূর বেণুকুঞ্জে বাজে মুরলী মুহু মুহু' 'বাশুরিয়ার মধুর সুরের কুহু।'	'দূর বেণু-কুঞ্জে বাজে মুরলি মুহু মুহু' 'নজরুল-গীতি'তে (অখণ্ড, ২০০৪) পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'দূর বেণু কুঞ্জে বাজে মুরলী মুহু মুহু' 'বাশুরিয়ার মধুর সুরের কুহু॥' গানটির রেকর্ড নং এন ১৭৪৩৫ এইচ.এম.ভি., ১৯৪০ শিল্পী : দীপালি তালুকদার
১০. কেন গো যোগিনী! বিধুর অভিমানে	'কেন গো যোগিনী! বিধুর অভিমানে।' 'নজরুল-রচনাবলী'তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) গ্রন্থে গানের একটি পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ : 'চাহিতে কহে ধরণীর পানে।' 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র'তে (২০০৬) পঙ্‌ক্তিটি নিম্নরূপ : 'চাহিয়া রহে ধরণীর পানে॥'	'কেন গো যোগিনী! বিধুর অভিমানে।' 'নজরুল-গীতি'তে (অখণ্ড, ২০০৪) গ্রন্থে গানের পঙ্‌ক্তিটি নিম্নরূপ : 'চাহিয়া রহে ধরণীর পানে।' রেকর্ড নং এন ২৭১৯৩ এইচ.এম.ভি., ১৯৪১ শিল্পী : দীপালি তালুকদার
১১. অনেক কথা বলার মাঝে	'অনেক কথা বলার মাঝে' 'নজরুল-রচনাবলী'তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) নিম্নোক্ত স্তবক আছে : 'হে উদাসীন, সঙ্গোপনে বলব তোমায় রাতের স্বপনে নীরবে যেমন শোনায় বনে মনের ব্যথা (তার) পুষ্পলতা॥' 'নজরুল-সঙ্গীত সমগ্র (২০০৬) গ্রন্থে উপরোক্ত স্তবকটি নেই। তবে নিম্নোক্ত স্তবক আছে : 'মনের বনে অনুরাগে কত কথার মুকুল জাগে সেই মুকুলের বুকে জাগাও ফুটে উঠার ব্যাকুলতা॥'	'অনেক কথা বলার মাঝে' 'নজরুল-গীতি'তে (অখণ্ড, ২০০৪) গ্রন্থে নিম্নোক্ত স্তবক নেই। 'হে উদাসীন, সঙ্গোপনে বলব তোমায় রাতের স্বপনে নীরবে যেমন শোনায় বনে মনের ব্যথা (তার) পুস্পলতা॥' 'নজরুল-গীতি'তে (অখণ্ড, ২০০৪) নিম্নোক্ত স্তবক আছে। 'মনের বনে অনুরাগে কত কথার মুকুল জাগে সেই মুকুলের বুকে জাগাও ফুটে উঠার ব্যাকুলতা॥' রেকর্ড নং এফ. টি. ৪৫৬৬, টুইন শিল্পী : শিউলি সরকার।

১	২	৩
১২. ঝিলের জলে কে ভাসালে	'ঝিলের জলে কে ভাসালে' 'নজরুল-রচনাবলী'তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'দিঘির ধারে আপন মনে রয় চেয়ে একলা।' 'মেঘ-পরীরা খেলতে এলো ঘুমতী নদীর চরে।' 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' (২০০৬) গ্রন্থে পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'বসে দীঘির ধারে মেঘের পানে রয় চেয়ে একলা।' 'খেলতে এলো মেঘ পরীরা ঘুমতী নদীর চরে।'	'ঝিলের জলে কে ভাসালে' 'নজরুল গীতি'তে (অখণ্ড ২০০৪) পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'বসে দিঘির ধারে মেঘের পানে রয় চেয়ে একেলা।' 'খেলতে এলো মেঘ-পরীরা ঘুমতী নদীর চরে।" রেকর্ড নং এন ১৯৩৫ এইচ.এম.ভি., ১৯৩৭ শিল্পী : পারুল সেন
১৩. দে দোল, দে দোল ওরে দে দোল, দে দোল।	'দে দোল, দে দোল ওরে দে দোল, দে দোল' 'নজরুল-রচনাবলী'তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) গ্রন্থের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ : 'পাষাণ-পুরীতে ডাকে জীবনের বান রে' 'আর নহি অচেতন, আর নাহি ভয় রে' 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' (২০০৬) গ্রন্থে পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'পাষাণ-পুরীতে ডাকে জীবনেরি বান রে।' 'আর নাহি অচেতন, আর নাহি ভয় রে।'	'দে দোল, দে দোল ওরে দে দোল, দে দোল' 'নজরুলগীতি' (অখণ্ড, ২০০৪) গ্রন্থে পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'পাষাণ-পুরীতে ডাকে জীবনের বান রে,' 'আর নহি অচেতন, আর নাহি ভয় রে' গানটির রেকর্ড নং এন ৭৩১৩, এইচ.এম.ভি., ১৯৩৪ শিল্পী : ধীরেনদাস
১৪. ও বাঁশের বাঁশি রে বাজে বাজে	'ও বাঁশের বাঁশি রে বাজে বাজে' 'নজরুল-রচনাবলী ৩য় খণ্ডের (১৯৯৩) পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'ও বাঁশের বাঁশি রে, বাজে বাজে সই নদীর ওপারে।' 'ও সে কেঁদে কেঁদে কি বলে সই রাতের আঁধারে' নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' (২০০৬) গ্রন্থে পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'ও বাঁশের বাঁশি রে বাজে বাজে নদীর ওপারে।' '(ও সে) কেঁদে কেঁদে ডাকে আমায় রাতের আঁধারে॥'	'ও বাঁশের বাঁশি রে বাজে বাজে' কলকাতা 'হরফ' প্রকাশনী প্রকাশিত 'নজরুল গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থে পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'ও বাঁশের বাঁশি রে বাজে বাজে নদীর ওপারে।' '(ও সে) কেঁদে কেঁদে ডাকে আমায় রাতের আঁধারে নদীর ওপারে' গানটির রেকর্ড নং এন ১৭১৬৩ এইচ.এম.ভি., ১৯৩৮ শিল্পী : সিদ্ধেশ্বরী মুখোপাধ্যায়

১	২	৩
১৫. ঐ জলকে চলে লো কার ঝিয়ারি।	'ঐ জলকে চলে লো কার ঝিয়ারি।' 'নজরুল রচনাবলী'তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'এমন মিষ্টি বিজুলি দিঠি সে বালিকা কে গো?' 'রূপে ডুবু ডুব রবি রঙ ভরা ছবি' 'ঘরে থাকিতে আর না পারি।' 'কোন ফুল তার দুল গো?' 'নিল ভাসায়ে কূল আমারি দুকূল ছাপানো রূপ তারি।' নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' (২০০৬) গ্রন্থে পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'এমন মিঠি বিজলি দিঠি শেখালে তায় কে গো?' 'রূপে ডুবুডুবু রবির রঙ ভরা ছবির,' 'ঘরে থাকিতে আর নারি লো।' 'কোন ফুলে তারি তুল গো' 'নিল ভাসায়ে প্রাণ আমারি রূপে দু'কূল–ছাপা গাঙ তারি।'	'ঐ জলকে চলে লো কার ঝিয়ারি।' কলকাতা 'হরফ' প্রকাশনী প্রকাশিত 'নজরুল গীতি' অখণ্ডে (২০০৪) পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'এমন মিঠি বিজলি দিঠি শেখালে তায় কে গো? 'রূপে ডুবুডুবু রবির রঙ ধরা ছবির' 'ঘরে থাকিতে আর নারি'। 'কোন ফুল তারি তুল গো?' 'নিল ভাসায়ে প্রাণ আমারি' রূপে দুকুল ছাপা গাঙ তারি' গানটির রেকর্ড নং পি ১১৭৬০ এইচ.এম.ভি., ১৯৩৩ শিল্পী : ইন্দুবালা
১৬. চিকন কালো বেদের কুমার কোন পাহাড়ে যাও?	'চিকন কালো বেদের কুমার কোন পাহাড়ে যাও?' 'নজরুল রচনাবলী' ৩য় খণ্ডে (১৯৯৩) পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'কাঁকর–ভরা কাঁটার পথে নাই শিকারে গেল তুমি নাই শিকারে গেলে।' 'অশথ–তলে বাজাও বাঁশি হাতের ধনুক ফেলে তামার হাতের ধনুক ফেলে।' 'ঐ কমল দিঘির শাপলা নিয়ে বাঁশিখানি দাও', 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' (২০০৬) গ্রন্থে পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'কাঁকর–ভরা কাঁটার পথে (আজ) নাই শিকারে গেলে', 'অশথ–তলে বাজাও বাঁশি (তোমার) হাতের ধনুক ফেলে।' 'ঐ কমল ঝিলের শাপলা নিয়ে বাঁশিখানি দাও।'	'চিকন কালো বেদের কুমার কোন পাহাড়ে যাও?' কলকাতা 'হরফ' প্রকাশনী প্রকাশিত 'নজরুলগীতি' (অখণ্ড, ২০০৪) পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'কাঁকর–ভরা কাঁটার পথে, নাই শিকারে গেলে আজ নাই শিকারে গেলে। 'অশথ তলে বাজাও বাঁশী; হাতের ধনুক ফেলে তোমার হাতের ধনুক ফেলে।' 'ঐ কমল ঝিলের শাপলা নিয়ে বাঁশীখানি দাও, তোমার বাঁশীখানি দাও॥' গানটির রেকর্ড নং এন ২৭২৬২ এইচ.এম.ভি., ১৯৪২ শিল্পী : বীণা চৌধুরী

১	২	৩
১৭. ফুলবীথি এলে অতিথি	'ফুলবীথি এলে অতিথি'— 'নজরুল রচনাবলী'তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) গানের একটি পঙ্‌ক্তিটি নিম্নরূপ : 'কি হবে লয়ে সে মালা যাহা নিশি–ভোরে শুকায়।' 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র'তে (২০০৬) পঙ্‌ক্তিটি নিম্নরূপ : 'কি হবে লয়ে সে ফুলমালা যাহা নিশি–ভোর শুকায়।'	'ফুলবীথি এলে অতিথি'— 'নজরুলগীতি' (অখণ্ড, ২০০৪) গ্রন্থে গানের পঙ্‌ক্তিটি নিম্নরূপ : 'কি হবে লয়ে সে ফুলমালা যাহা নিশি–ভোরে শুকায়।' গানটির রেকর্ড নং এন ৯৯৫৫ এইচ এম ভি, ১৯৩৭ শিল্পী : গিরীন চক্রবর্তী ও হরিমতী।
১৮. ঝুমুর নাচে ডুমুর গাছ ঘুঙুর বেঁধে গায় লো	'ঝুমুর নাচে ডুমুর গাছ ঘুঙুর বেঁধে গায় লো।' 'নজরুল রচনাবলী'তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) গানে পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'ঝুমুর নাচে ডুমুর গাছে ঘুঙুর বেঁধে পায় লো।' 'এ জনমে হৃদয় ছিঁড়ে হৃদয়ে বিঁধিলি।' 'চোর কাঁটা নয়, ছিলাম কানের খিলি লো।' 'ঝিলিমিলিয়ে ঝিলের জল নাচায় শালুক ফুল', 'আর–জনমে যা করেছি তোরই বিরহে।' নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' (২০০৬) গ্রন্থে পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : ঝুমুর নাচে ডুমুর গাছে ঘুঙুর বেঁধে পায় (লো)।' 'এই জনমে আঁচল ছিঁড়ে হৃদয়ে বিঁধিলি।' 'চোর কাঁটা নয় ছিলাম পানের খিলি লো।' 'ঝিলিমিলিয়ে ঝিলের জল নাচায় শালুক ফুল', 'আর–জনমে করেছি যা তোরই বিরহে।'	'ঝুমুর নাচে ডুমুর গাছ ঘুঙুর বেঁধে গায় লো।' কলকাতা 'হরফ' প্রকাশনী প্রকাশিত 'নজরুল গীতি' অখণ্ড, ২০০৪–এ পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'ঝুমুর নাচে ডুমুর গাছ ঘুঙুর বেঁধে গায় লো, ঘুঙুর বেঁধে গায়'। 'এ জনমে আঁচল ছিঁড়ে হৃদয়ে বিঁধিলি।' 'চোর–কাটা নয় ছিলাম পানের খিলি লো' 'হিলমিলিয়ে ঝিলের জল নাচায় শালুক ফুল, 'আর জনমে কয়েছি যা তোরই বিরহে।' গানটির রেকর্ড নং এইচ ৯৮৪, হিন্দুস্থান ১৯৪২ শিল্পী : কালীপদ সেন ও শান্ত বসু
১৯. তোমায় দেখি নিতুই চেয়ে চেয়ে	'তোমায় দেখি নিতুই চেয়ে চেয়ে' 'নজরুল রচনাবলী' ৩য় খণ্ডে (১৯৯৩) একটি পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ : 'যেতে যেতে এই পথে তরী বেয়ে' নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র (২০০৬) গ্রন্থে পঙ্‌ক্তিটি নিম্নরূপ : 'যেতে এই পথে তরী বেয়ে'	'তোমায় দেখি নিতুই চেয়ে চেয়ে' 'নজরুল গীতি' অখণ্ডে (২০০৪) পঙ্‌ক্তিটি নিম্নরূপ : 'যেতে এই পথে তরী বেয়ে' রেকর্ড নং এফ. টি ৪২১৫, টুইন ১৯৩৬ শিল্পী : ইন্দুসেন, রেণুবালা

১	২	৩
২০. আমার খোকার মাসি শ্রী অমুকবালা দাসী	'আমার খোকার মাসি শ্রী অমুকবালা দাসী' 'নজরুল রচনাবলী' ৩য় খণ্ডে (১৯৯৩) পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'মোরে দেখেই সর্বনাশী খেলে ফিক করে হাসি' 'চেহারাও নয়, জ্যুসই' 'তাতে আছে তিনটি বৎসই' 'আর, চেহারাও মন্দা মন্দা।' 'দাদা কি বল?' 'দাদা মরব ঘানি ঠেলে', নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' (২০০৬) গ্রন্থে পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'মোরে দেখেই সর্বনাশী ফেলে ফিক্ করে সে হাসি॥' 'তার চেহারাও নয় জুৎসই' 'আবার (তার) আছে তিনটি বৎসই' 'তার চেহারাও মন্দা–মন্দা' 'কি বল দাদা এ্যা?' 'মরবো ঘানি ঠেলে',	'আমার খোকার মাসি শ্রী অমুকবালা দাসী' 'হরফ'–প্রকাশনী প্রকাশিত 'নজরুল গীতি' অখণ্ডে (২০০৪) পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'মোরে দেখেই সর্বনাশী ফেলে ফিক্ করে সে হাসি॥' 'তার চেহারাও নয় জুৎসই', 'তার আছে তিনটি বৎসই' 'তার চেহারাও মন্দা মন্দা।' 'কি বল দাদা?' 'মরব ঘানি ঠেলে', গানটির রেকর্ড নং এন ৭২৯৬ এইচ.এম.ভি., ১৯৩৪ শিল্পী : রঞ্জিত রায়
২২. ওরে বাবা! এর নাম নাকি পূজা!	'ওরে বাবা! এর নাম নাকি পূজা!' 'নজরুল রচনাবলী' ৩য় খণ্ডে (১৯৯৩) নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিগুলো নেই। 'সবাই যেন শ্রীদূর্গার গুষ্টি, আমি যেন বাহন সিঙ্গি, আসছে বছর পূজায় মাগো হব আমি ফিরিঙ্গি। জয় বাবা যীশুখ্রীস্টের জয় (এই পূজায় সময়) পিতা হওয়ার চেয়ে হাড়ি কাঠের পাঁঠা হওয়া সোজা॥' 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' (২০০৬) গ্রন্থে উপরোক্ত পঙ্‌ক্তিগুলো আছে।	'ওরে বাবা! এর নাম নাকি পূজা!' 'হরফ' প্রকাশনী প্রকাশিত 'নজরুল গীতি' অখণ্ডে (২০০৪) নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিগুলো আছে। 'সবাই যেন শ্রীদূর্গার গুষ্টি, আমি যেন বাহন সিঙ্গি, আসছে বছর পূজায় মাগো হব আমি ফিরিঙ্গি। জয় বাবা যীশুখ্রীস্টের জয় (এই পূজার সময়) পিতা হওয়ার চেয়ে হাড়ি কাটের পাঁঠা হওয়া সোজা॥' গানটির রেকর্ড নং এন ১৭৩৬৮ এইচ.এম.ভি., ১৯৩৯ শিল্পী : রঞ্জিত রায়

১	২	৩
২৩. লাম্ পম্ লাম্ পম্ লাম্ পম্	'লাম্ পম্ লাম্ পম্ লাম্ পম্' নজরুল রচনাবলীতে নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিটি নেই : 'ল্যাংড়ো লেংড়ী হেলায় টেংরী' 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' (২০০৬) গ্রন্থের পঙ্‌ক্তিটি নিম্নরূপ : 'ল্যাংড়া লেংড়ি হিল্লায় ঠেংরি'	'লাম্ পম্ লাম্ পম্ লাম্ পম্' 'নজরুল গীতি' অখণ্ডে (২০০৪) পঙ্‌ক্তিটি নিম্নরূপ : 'ল্যাড়া লেংড়ী হেলায় টেংরী' রেকর্ড নং এন ১৭১৯৮ এইচ.এম.ভি. শিল্পী : রঞ্জিত রায়।
২৪. য়্যা এলাহি, য়্যা এলাহি	'য়্যা এলাহি, য়্যা এলাহি' 'নজরুল-রচনাবলী'তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'পতঙ্গ যেমন ধায় প্রদীপ পানে' 'পরানে আমার শান্তি যে নাহি॥' নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' (২০০৬) গ্রন্থে পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'পতঙ্গ যেমন ধায় দীপ পানে' 'পরানে আমার শান্তি নাহি॥' 'তোমার নামে বরমালা দাও গলে' এই পঙ্‌ক্তিটি 'নজরুল রচনাবলী'তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) আছে কিন্তু 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' (২০০৬) গ্রন্থে নেই।	'য়্যা এলাহি, য়্যা এলাহি' 'হরফ' প্রকাশনী প্রকাশিত 'নজরুল গীতি' অখণ্ড (২০০৪) পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'পরঙ্গ যেমন ধায় দীপ পানে' 'পরানে আমার শান্তি নাহি॥' 'তোমার নামের বরমালা দাও গলে' শেষের পঙ্‌ক্তিটি 'নজরুল গীতি'তে (অখণ্ড, ২০০৪) নাই। গানটির রেকর্ড নং এফ.টি ৪৩৬৯, টুইন শিল্পী : আব্দুল লতিফ

১	২	৩
২৫. যাহাদের তরে এই সংসারে	‘যাহাদের তরে এই সংসারে’ ‘নজরুল রচনাবলী’তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) গানে পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : ‘তাহাদের কেহ হবে না হে নাথ মরণের সাথী মোর॥’ ‘শত পাপ শত অনাচার করে বিভব রতন আনিলাম ঘরে, তোমাতে হয়নি মতি’ ‘মরণ–বলায় কাঁদি তাই প্রভু কি হবে আমার গতি।’ ‘তরিবার আর না হেরি উপায়’ নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত ‘নজরুল সঙ্গীত সমগ্র’তে (২০০৬) পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : ‘তাদের কেউ হবে না হে নাথ মরণ–সাথী মোর॥’ ‘শত পাপ শত অধম করে বিভব রতন আনলেম ঘরে’ তোমাতে হয় নাই মতি’ ‘মরণ–বেলায় তাই কাঁদি প্রভু কি হবে মোর গতি।’ ‘তরিবার আর না দেখি উপায়’	‘যাহাদের তরে এই সংসারে’ ‘নজরুল গীতি’ (অখণ্ড, ২০০৪) পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : ‘তাদের কেহ হবে না হে নাথ সাথী মোর।’ ‘শত পাপ শত অধর্ম্ম করে বিভব রতন আনিলেম ঘরে, ‘তোমাতে হয় নাই মতি’ ‘মরণ–বেলায় তাই কাঁদি প্রভু কি হবে মোর গতি।’ ‘তরিবার আর না দেখি উপায়’ গানটির রেকর্ড নং এফ. টি ৪৩২৭ টুইন, এপ্রিল, ১৯৩৬ শিল্পী : আব্দুল লতিফ

১	২	৩
২৬. আমার হাতে কালি মুখে কালি	'আমার হাতে কালি মুখে কালি' 'নজরুল রচনাবলী'তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'মোর পড়া লেখা হল না মা 'ম' দেখতে দেখি শ্যামা 'ক' দেখলেই কালি বলে' 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' (২০০৬) পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'মোর লেখাপড়া হল না মা আমি 'ম' দেখতেই দেখি শ্যামা আমি 'ক' দেখতেই কালি বলে'	'আমার হাতে কালি মুখে কালি' 'নজরুল গীতি' (২০০৪) পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'মোর লেখাপড়া হল না মা আমি 'ম' দেখতেই দেখি শ্যামা 'ক' দেখলেই কালি বলে' রেকর্ড নং এন ২৭২৬৫ এইচ. এম. ভি., এপ্রিল ১৯৪২ শিল্পী : কে মল্লিক
২৭. আমি বেলপাতা জবা দেব না	'আমি বেলপাতা জবা দেব না' 'নজরুল-রচনাবলী'তে (১৯৯৩, ৩য় খণ্ড) পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'হাতে দিয়ে ফল দিতে যাই আমি হাতে হাতে তাই ফল পাই।' 'হৃদয়ে পাই না রস আমি আঁখিতে আঁখি-তারা রাখিব তাই আনিয়াছি আঁখি ছলছল॥' 'নজরুল-সংগীত সমগ্র'তে (২০০৬) পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'হাতে দিয়ে ফল দিতে যাই মাগো হাতে হাতে তার ফল পাই।' 'পাই না হৃদয়ে রস তাই আঁখিতে রাখিব বলে মা আনিয়াছি আঁখি ছলছল।'	'আমি বেলপাতা জবা দেব না' 'নজরুল গীতি'তে (অখণ্ড, ২০০৪) পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'হাত দিয়ে ফল দিতে যাই, হাতে হাতে তার ফল পাই (মাগো)' 'পাই না হৃদয়ে রস তাই আঁখিতে রাখিব বলে মা আনিয়াছি আঁখি ছলছল।' গানটির রেকর্ড নং কিউ এস ৬০৩ সেনোলা, জুন, ১৯৩৪ শিল্পী : কৃষ্ণদাস ঘোষ সুর : নজরুল

১	২	৩
২৮. ওগো প্রিয়তম তুমি চলে গেছ আজ আমার পাওয়ার বহু দূরে।	'ওগো প্রিয়তম তুমি চলে গেছ আজ আমার পাওয়ার বহু দূরে।' 'নজরুল-রচনাবলী'তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) স্তবকগুলো নিম্নরূপ : 'বাজে মনের মাঝে (বাজাতে যে বেণু বনের মাঝে) আজিও তারি রেশ মনে বাজে॥' 'তব কদম–মালার কেশর–গুলি ছেয়ে আছে বনের ধূলি, আজকে করুণ রোদন-তুলি বয় যমুনা ভাটির সুরে। (আর উজান বহে না।) আজকে আমার দুখে দুখী সারা গোকুল অশ্রুমুখী (কাঁদে বসে মুখোমুখী) হয়ত তুমি আজকে সুখী আমায় ভুলে রাজার পুরে॥' 'একলা আঁধার তমাল বনে বসে আছি উদাস মনে, 'তাদের দেশের আকাশে আজ আমার দেশের চাঁদ উঠেছে' 'সেথা শুক্লাতিথি চতুর্দশীর চাঁদ উঠেছে। আজ মোর আকাশে কৃষ্ণাতিথি আমার দেশে বাদল ঝুরে।'	'মনের মাঝে বেণু বাজে (প্রিয় বাজাতে যে বেণু বনের মাঝে) আজো তার রেশ মনে বাজে॥' 'তব কদম–মালার কেশর–গুলি আজি ছেয়ে আছে ওগো পথের ধূলি, ওগো আজকে করুণ রোদন তুলি বয় যমুনা ভাটির সুরে॥ (আর উজান বয় না।) ওগো আজিকে আঁধার তমাল বনে, বসে আছি উদাস মনে,' 'ওগো সেথা শুক্লাতিথি চতুর্দশীর চাঁদ উঠেছে।' সখি তাদের দেশের আকাশে আজ আমার দেশের চাঁদ উঠেছে। 'ওগো মোর গগনে কৃষ্ণতিথি আমার দেশে বাদল ঝুরে।' নিম্নোক্ত স্তবকটি এই গ্রন্থে নাই। 'আজকে আমার দুখে দুখী সারা গোকুল অশ্রুমুখী (কাঁদে বসে মুখোমুখি) হয়ত তুমি আজকে সুখী আমায় ভুলে রাজার পুরে॥' 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' (২০০৬) গ্রন্থের নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিটি ছাড়া বাকী পঙ্‌ক্তিগুলো একইরূপ। 'বাজে মনের মাঝে বেণু বাজে গানটির রেকর্ড নং এন ৭৩২৪ এইচ. এম. ভি., শিল্পী : হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ; সুর.: নজরুল

১	২	৩
২৯. (আর) কত দুখ্ দেবে, বল মাধব বল	'(আর) কত দুখ দেবে, বল মাধব বল' 'নজরুল রচনাবলী'তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'তবে যেন আঁখি ছলছল' তব শ্রীচরণ তলে চাই আমি ঠাঁই', 'আমি কি এতই ভার এ জগতে' 'ক্ষুদ্র মানুষও অপরাধ ভোলে' 'তোমার চেয়ে কি অপরাধ বড় দিলে না পায়ে স্থান।' '(হে) নারায়ণ। আমি নারায়ণী সেনা' (মোর) কুরুকুলে দিতে ব্যথা কি বাজে না' 'নজরুল-সঙ্গীত সমগ্র' (২০০৬) গ্রন্থে পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'তুমি কেন আঁখি ছলছল' 'তব শ্রীচরণ তলে আমি চাই ঠাঁই', 'আমি এতই ভার এ জগতে যে,' 'ক্ষুদ্র মানুষ অপরাধ ভোলে' 'তোমার চেয়ে পাপ বেশি হ'ল (মোরে) দিলে না চরণে স্থান।' 'হে নারায়ণ। আমি নারায়ণী সেনা', 'মোর কুরুকুলে দিতে ব্যথা কি বাজে না।'	'(আর) কত দুখ দেবে, বল মাধব বল' 'নজরুল-গীতি'তে (অখণ্ড, ২০০৪) পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'তবে কেন আখি ছলছল' আমি চাই তব শ্রীচরণ ঠাঁই' 'আমি কি এতই বার এ জগতে' 'ক্ষুদ্র মানুষ ভোলে অপরাধ' 'তোমার চেয়ে কি পাপ বেশি হল (মোরে) দিলে না চরণে স্থান!' '(হে) নারায়ণ। আমি নারায়ণী কেনা' '(মোর) কুরুকুলে দিতে প্রাণে কি বাজে না' গানটির রেকর্ড নং জে.এন.জি. ৫৪৭৩ মেগাফোন, মে, ১৯৪০ শিল্পী : ভবানী দাস

১	২	৩
৩১. (আমার) কালি বাঞ্ছা-কল্প তরুর ছায়া-তলে আয় রে।	'আমার কালি বাঞ্ছা-কল্প তরুর ছায়া-তলে আয়রে।' নজরুল রচনাবলী ৩য় খণ্ডে (১৯৯৩) গানের পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'পুত্র কন্যা বিভব রতন নে চেয়ে যার ইচ্ছা যেমন আমার এ মন থাকে যেন বাঞ্ছামনীর পায় রে।' '(এবার) খালি হাতে তালি দিয়ে চাইব কালিকায় রে॥' নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' (২০০৬) গ্রন্থে পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'ওরে পুত্র কন্যা বিভব রতন, চেয়ে নে যার ইচ্ছা যেমন, ওরে আমার এ মন থাকে যেন বাঞ্ছামনীর পায় রে।' 'এবার খালি হাতে তালি দিয়ে (আমি) চাইব কালিকায় রে॥'	'আমার কালি বাঞ্ছা-কল্প তরুর ছায়া-তলে আয়রে' 'নজরুল গীতি' অখণ্ডে (২০০৪) গানের পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'ওরে পুত্র কন্যা বিভব রতন, চেয়ে নে যার ইচ্ছা যেমন, আমার এ মন থাকে যেন বাঞ্ছামনীর পায় রে॥' 'এবার খালি হাতে তালি দিয়ে আমি চাইব কালিকায় রে॥' গানটির রেকর্ড নং এন. ২৭৩৫২ এইচ.এম.ভি., ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩ শিল্পী : মৃণাল কান্তি ঘোষ।
৩২. জয় কৃষ্ণ-ভিখারিনি তুলসী	'জয় কৃষ্ণ ভিখারিণি তুলসী' 'নজরুল রচনাবলী'তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) একটি পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ : 'কলির কুলষ-ধারিণী তুলসী' 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র'তে (২০০৬) পঙ্‌ক্তিটি নিম্নরূপ : 'কলির কুলষ-বারিণী তুলসী'	'জয় কৃষ্ণ ভিখারিনি তুলসী' 'নজরুল-গীতি'তে (অখণ্ড, ২০০৪) পঙ্‌ক্তিটি নিম্নরূপ : 'কলির কুলষ-বারিণী তুলসী' পত্রিকা : প্রবর্তক, পৌষ, ১৩৪৪ শিরোনাম : শ্রী তুলসী বন্দনা
৩৪. তুমি আমার চোখের বালি।	'তুমি আমার চোখের বালি।' 'নজরুল রচনাবলী' ৩য় খণ্ডে (১৯৯৩) একটি পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ : 'আমার চোখে পড়ল তোমার রূপের কালিদ॥' 'নজরুল সঙ্গীতসমগ্র' গ্রন্থে পঙ্‌ক্তিটি নিম্নরূপ : 'আমার চোখে পড়ল কখন, তোমার রূপের কালি॥'	'তুমি আমার চোখের বালি।' 'নজরুলগীতি' অখণ্ডে (২০০৪) পঙ্‌ক্তিটি নিম্নরূপ : 'আমার চোখে পড়ল কখন, তোমার রূপের কালি॥' গানটির রেকর্ড নং এফ.টি. ১২৪৫০ টুইন, জুলাই, ১৯৩৮ শিল্পী : কুঞ্জলাল সিংহ।

১	২	৩
৩৫. তোর জননীরে কাঁদাতে কি	‘তোর জননীরে কাঁদাতে কি’ ‘নজরুল রচনাবলী’তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : ‘(তুই) কোন শিব-লোক আলো করে’ ‘তুই নাকি মা মেয়ে হয়ে ঘুমাস তাহার বুকের পরে।’ ‘কোথায় আছিস সে কোন রূপে’ ‘সব মাকে তুই শান্তি দিয়ে’	‘তোর জননীরে কাঁদাতে কি’ ‘নজরুল গীতি’ অখণ্ডে (২০০৪) পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : ‘(তুই) কোন শিব-লোক করলি আলো ‘তুই নাকি তার শূন্য বুকে আসিস মেয়ের মূর্তি ধরে।’ ‘মা কোথায় আছিস সে কোন রূপে’ ‘কোন মাকে তুই শান্তি দিয়ে’, ‘নজরুল সঙ্গীত সমগ্র’ গ্রন্থেও (২০০৬) গানের পঙ্‌ক্তিগুলো অনুরূপ। গানটি ‘হরপার্বতী’ নাটকের। শিল্পী : হরিমতী।
৩৬. মোর দুখ-নিশি কবে হবে ভোর	‘মোর দুখ-নিশি কবে হবে ভোর’ ‘নজরুল রচনাবলী’তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : ‘আমারই আঁখির লোর॥’ ‘মুখ লুকায়ে কাঁদে নিশীথের আঁধার অন্তরে মম।’ ‘শূন্য মন্দিরে একেলা কাঁদি মালার ডোর॥’ ‘নজরুল সঙ্গীত সমগ্র’ ২০০৬ গ্রন্থে পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : ‘আমারই বিরহী আঁখির লোর॥’ ‘নিশীথের আঁধার মুখ লুকায়ে কাঁদে অন্তরে মম।’ ‘ফেলে নববধূ সাজ পূজারিণী-সাজে শূন্য মন্দিরে একা কাঁদি জড়ায়ে ছিন্ন মালার ডোর॥’	‘মোর দুখ-নিশি কবে হবে ভোর’ ‘নজরুলগীতি’ অখণ্ডে (২০০৪) পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : ‘আমারই বিরহী আঁখির লোর॥’ ‘নিশীথের আঁধার মুখ লুকায়ে কাঁদে অন্তরে মম।’ ‘শূন্য মন্দিরে আমি একা কাঁদি জড়ায়ে ছিন্ন মালার ডোর॥’ গানটির রেকর্ড নং জে.এন. জি. ৫৪৬৪ মেগাফোন, মার্চ, ১৯৪০ শিল্পী : কুসুম গোস্বামী

১	২	৩
৩৭. মোরা ভেসে যাব কৃষ্ণ নামের স্রোতে	'মোরা ভেসে যাব কৃষ্ণ নামের স্রোতে' 'নজরুল রচনাবলী' ৩য় খণ্ডে (১৯৯৩) পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'মোরা ভেসে যাব কৃষ্ণ নামের স্রোতে।' 'ঐ নামের মন্ত্রগুণে পথের মানুষ গোঠের বেণু শুনে ভুলের কূলে খেলে যে, সে ওঠে ফুলের রথে॥' 'ঐ নাম পেলে যে সুমুখে তার শ্যাম দেখা দেবার তরে নিতুই ঘোরে অবিরাম।' 'ধীরে ধীরে প্রেম-যমুনায় আনে ঐ নামের গুণে গঙ্গা স্রোত নামে গো পর্বতে।'	'মোরা ভেসে যাব কৃষ্ণ নামের স্রোতে' 'নজরুল-গীতি' অখণ্ডে (২০০৪) পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'মোরা ভেসে যাব কৃষ্ণ নামের স্রোতে গো'। 'ঐ নামেরই মন্ত্রগুণে পথের মানুষ গোঠের বেণু শুনে গো। ভুলের কূলে কূলে খেলে যে সে ওঠে ফুলের রথে॥' 'ঐ নাম পেলে যে, সুমুখে তার শ্যাম গো দেখা দেবার তরে নিতুই ঘোরে অবিরাম গো।' 'ধীরে ধীরে প্রেম যমুনা আনে ঐ নামের গুণে গঙ্গাধারা নামে হিমগিরি হতে।' নজরুল সঙ্গীত সমগ্র গ্রন্থে পঙ্‌ক্তিগুলো একইরূপ। গানটির রেকর্ড নং এফ.টি. ১৩৬৪৫, টুইন, সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ শিল্পী : পরাণ রায় ও মেনকা ব্যানার্জী
৩৮. শোনালো শ্রবণে শ্যাম শ্যাম নাম	'শোনালো শ্রবণে শ্যাম শ্যাম নাম' 'নজরুল-রচনাবলী'তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'শোনালো শ্রবণে শোনা শ্যাম শ্যাম নাম।' 'ধেয়ায় যে নাম সদা ঘরে প্রতিজনা লো, নাম শোনা লো, শোনা লো (সখি গো) (আজ) ভোলায় যে গৃহকাজ' 'শুনিতে যে নাম সদা কান পেতে রই' 'যে নাম ধেয়ায় সদা হৃদি-ব্রজধাম॥'	'শোনালো শ্রবণে শ্যাম শ্যাম নাম' 'নজরুল গীতি' অখণ্ডে (২০০৪) পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'শোনালো শ্রবণে শ্যাম শ্যাম নাম'। 'সখি ধেয়ায় যে নাম প্রতি ঘরে প্রতি জনা লো' সখি ভোলায় যে গৃহকাজ', 'যে নাম শুনিতে লো কান পেতে রই 'যে নাম অন্তরে জপি অবিরাম লো॥' 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' গ্রন্থে গানের পঙ্‌ক্তিগুলো একইরূপ। গানটির রেকর্ড নং এফ.টি. ৪০৪৫ টুইন ১৯৩৫ শিল্পী : হরিমতী কথাসুর : নজরুল

<table>
<tr><th colspan="2">১</th><th>২</th><th>৩</th></tr>
<tr><td>৩৯.</td><td>সখি শ্যামের স্মিরিতি শ্যামের পিরিত</td><td>'সখি শ্যামের স্মিরিতি শ্যামের পিরিতি'<br>'নজরুল-রচনাবলী'তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) গানটি নিম্নরূপ :
'সখি শ্যামের স্মৃতি শ্যামের প্রীতি
জীবন মরণের সাথী
মম জীবন মরণের সাথী।
জনম জনম কব মাধব মাধব
ঐ ধ্যানে রব দিবারাতি॥
ধ্যানে রহিব—
ভুলি গৃহকাজ ভুলি লোক-লাজ ধ্যানে রহিব
সব কলঙ্ক গঞ্জনা সহি নিশিদিন ধ্যানে রহিব।
ললাটে ও নাম লিখে ধাইব দিকে দিকে
আমি যাব গো—
প্রতি ঘরে ঘরে আমি যাব গো
কৃষ্ণ কাজল দিয়া শ্রীকৃষ্ণ নাম জনে জনে লেখাব গো
সখি গো—
শ্যাম মাথার বেণী, শ্যাম মালার মণি
শ্যাম নাম নয়ন-তারা
শ্রীকৃষ্ণ নয়ন-তারা
শ্রীকৃষ্ণ নয়ন-তারা
কে বলে কৃষ্ণ কালো সখি কৃষ্ণ আমার নয়ন-তারা
সে যে অন্ধকারে দেখায় আলো
শ্রীকৃষ্ণ নয়ন-তারা॥'</td><td>'সখি শ্যামের স্মিরিতি শ্যামের পিরিতি'<br>'নজরুল গীতি' অখণ্ডে (২০০৪) গানটি নিম্নরূপ :
'সখি শ্যামের স্মিরিতি শ্যামের পিরিতি
মম জীবন মরণের সাথী।
জনম জনম কব মাধব মাধব
ওই ধ্যানে রব দিবা রাতি॥
আমি ওই ধ্যানে রহিব—
ভুলে গৃহকাজ ভুলে লোক-লাজ
আমি ওই ধ্যানে রহিব—
কৃষ্ণকলি মেখে কলঙ্ক পশরা হাসিমুখে বহিব।
শ্যাম মাথার মণি, শ্যাম মালার মণি
(সখি) শ্যাম মোর নয়নতারা
কৃষ্ণ মোর কৃষ্ণ নয়ন তারা
তৃষিত জীবনে শ্যাম নাম মোর শীতল সুরধুনি ধারা।
প্রাণ জুড়াইব,
ওই সুরধুনি-ধারায় প্রাণ জুড়াইব।
দারুণ বিরহ-দহন জুড়াইতে শ্যাম
নাম সুরধুনি ধারা॥'<br>'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' (২০০৬) গ্রন্থে গানটি স্তবকগুলো একইরূপ।
গানটির রেকর্ড নং এইচ.এম.ভি. ১৯৩৮
শিল্পী : নীহার বালা
রেকর্ডটি বাতিল হয়।</td></tr>
</table>

১	২	৩
৪০. হে নিঠুর তোমাতে নাই আশার আলো	'হে নিঠুর তোমাতে নাই আশার আলো' 'নজরুল রচনাবলী'র (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) পঙ্‌ক্তিটি নিম্নরূপ : 'চোখে তব কাজলের ছলনা মাখা', এবং নিম্নোক্ত স্তবকটি আছে 'মায়াময় চোর ! চুরি করি গোপনে ধেনু চরাবার ছলে পালাও বনে। ভক্তে ডুবাতে শ্যাম অকূল নীরে ছল করে বসে থাক যমুনা-তীরে সুখের ঘরে তুমি আগুন জ্বালো॥'	'হে নিঠুর তোমাতে নাই আশার আলো' 'নজরুল-গীতি' অখণ্ডে (২০০৪) পঙ্‌ক্তিটি নিম্নরূপ : 'চোখে তব ছলনা কাজল মাখা,' নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তি নেই। 'মায়াময় চোর ! চুরি করি গোপনে ধেনু চরাবার ছলে পালাও বনে। ভক্তে ডুবাতে শ্যাম অকূল নীরে ছল করে বসে থাক যমুনা-তীরে সুখের ঘরে তুমি আগুন জ্বালো॥' নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' (২০০৬)-এ গানের স্তবকটি একইরূপ। গানটির রেকর্ড নং এন ৯৭৭১ এইচ.এম.ভি., ১৯৩৬ শিল্পী : কৃষ্ণচন্দ্র দে।

১	২	৩
৪১. শোন মেঘ-ঘনশ্যাম ডাকে আমারে দিসনে লো পথে বাধা।	'শোন মেঘ-ঘনশ্যাম ডাকে আমারে দিসনে লো পথে বাধা।' 'নজরুল রচনাবলী'তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) নিম্নোক্ত স্তবকগুলো আছে। 'পথের শঙ্কটে কন্টকে সখি কৃষ্ণ প্রেমময়ী মরে না ! (যদি দেহ মরে যায়, বিদেহ প্রেম তার মরে না মরে না) সখি এইত অভিসারের লগন ! গৃহতারা মেঘে মগন রাধারে যেতে দেখিবে না কেহ শ্যাম মেঘ হয়ে আবরিবে দেহ। কৃষ্ণ প্রেম বৃষ্টি ধারায় নাইবি যদি চল্ (দেখ) আকাশ ভরা মোর বিরহীর আঁখি ছলছল (সে অভিমানে গলেছে কেঁদে কেঁদে কার বিরহে অভিমান গলেছে ! ঝড় হয়ে সে দুলেছে, বিজলি হয়ে জ্বলেছে— অভিমানে গলেছে !) চল মান ভাঙাব আমার অভিমানীর মান ভাঙাব এই বৃষ্টি হবে শেষ তার দেখব মধুর বেশ ইন্দুধনুর রঙে সখি সজল আকাশ রাঙাব !' নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' (২০০৬) গ্রন্থে উক্ত স্তবকগুলো নেই।	'শোন মেঘ-ঘনশ্যাম ডাকে আমারে দিসনে লো পথে বাধা।' 'নজরুল গীতি' অখণ্ডে (২০০৪) নিম্নোক্ত স্তবকগুলো নেই। 'পথের শঙ্কটে কন্টক সখি কৃষ্ণ প্রেমময়ী মরে না ! (যদি দেহ মরে যায়, বিদেহ প্রেম তার মরে না মরে না) সখি এইতো অভিসারের লগন ! গৃহতারা মেঘে মগন রাধারে যেতে দেখিবে না কেহ শ্যাম মেঘ হয়ে আবরিবে দেহ। কৃষ্ণ প্রেম বৃষ্টি ধারায় নাইবি যদি চল (দেখ) আকাশ ভরা মোর বিরহীর আঁখি ছলছল (সে অভিমানে গলেছে কেঁদে কেঁদে কার বিরহে অভিমান গলেছে ! ঝড় হয়ে সে দুলেছে, বিজলি হয়ে জ্বলেছে— অভিমানে গলেছে !) চল মান ভাঙাব আমার অভিমানীর মান ভাঙাব এই বৃষ্টি হবে শেষ তার দেখব মধুর বেশ ইন্দুধনুর রঙে সখি সজল আকাশ রাঙাব !' গানটি 'অভিসার' পালা কীর্তনের শ্রীরাধার গান। শিল্পী : শৈলদেবী।

	১	২	৩
৪২.	গভীর ঘুম ঘোরে স্বপনে শ্যাম কিশোরে হেরে প্রেমময়ী রাধা।	'গভীর ঘুম ঘোরে স্বপনে শ্যাম কিশোরে হেরে প্রেমময়ী রাধা।' 'নজরুল রচনাবলী'তে (১৯৯৩, ৩য় খণ্ড) স্তবকগুলো নিম্নরূপ : '(ভয়হীন মান শ্রীরাধার, তাই শ্রীরাধা চির অভিমানিনী, পরম শুদ্ধ প্রেম শ্রীরাধার, তাই নির্ভয় অভিমানিনী)। ভাবে, রাধার হৃদয় আধার যাহার সে কেন ভজে কামিনী। রাধা বুঝতে নারে চির সরল অমৃতময় গরল কেন হয়—বুঝতে নারে। কাঁপে থরথর সরা কলেবর ভাবে রাধা এ কি বিপরীত। 'প্রেম–ভিক্ষু' কহে বুঝি বুঝিবার নহে চঞ্চল শ্যামের রীত॥ (বোঝা যায় না, চঞ্চল শ্যামের রীত বোঝা যায় না অবুঝ মনের বোঝা যায় না তবু বোঝা যায় না) কখন সে রাধার কখন সে চন্দ্রার বোঝা যায় না। 'প্রেম ভিক্ষু' কহে বুঝি বুঝিবার নহে চঞ্চল শ্যামের রীত॥'	'গভীর ঘুম ঘোর স্বপনে শ্যাম কিশোরে হেরে প্রেমময়ী রাধা।' 'নজরুল গীতি' অখণ্ডে (২০০৪) স্তবকগুলো নিম্নরূপ : 'শ্রীরাধার মান ভয়হীন, তাই শ্রীরাধা অভিমানিনী পরমশুদ্ধ প্রেম শ্রীরাধার, নির্ভয় অভিমানিনী। কৃষ্ণকেও সে ভয় করে না, নির্ভয় অভিমানিনী রাধা বুঝতে নারে গো। চির সরল অমৃতময় গরল কেন হয় বুঝতে নারে গো। কাঁপে থরথর সারা কলেবর, ভাবে রাধা একি বিপরীত। 'প্রেম–ভিক্ষু' কহে বুঝি বুঝিবার নহে চঞ্চল শ্যামের রীত॥ বোঝা যে যায় না চঞ্চল শ্যামের রীত অবুঝ মনের বোঝা যায় না তাতে তবু কখন সে রাধার, কখন সে চন্দ্রার॥' 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' গ্রন্থে স্তবকগুলো একইরূপ। গানটির রেকর্ড নং এন ২৭১৫২ এইচ.এম.ভি., ১৯৪১ শিল্পী : মৃণাল কান্তি ঘোষ

১	২	৩
৪৩. হাসিয়া মরি রাই কৃষ্ণ শ্যাম নাই যাবি হেন কোন দেশে	'হাসিয়া মরি রাই কৃষ্ণ শ্যাম নাই যাবি হেন কোন দেশে' 'নজরুল রচনাবলী' ৩য় খণ্ডে (১৯৯৩) উক্ত গান এবং 'তুই ফিরে যে আসবি শুভ্র জ্যোতিরূপে' আলাদা দুটি গান হিসাবে আছে। গানের প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ : 'হাসিয়া মরি নাই কৃষ্ণ শ্যাম নাই যাবি হেন কোন দেশে (সে যে) সকল দিগন্ত দিগ পন্থ আগলি আছে শ্যাম বেশে॥' নিম্নোক্ত স্তবক নজরুল রচনাবলীতে আছে। '(অভিমানিনী শ্রীরাধার তবু মান যায় না। যমুনার জল নিতে গিয়ে দেখে—শ্রীকৃষ্ণ যমুনা জলে লীলা করেছেন আর তাঁর বক্ষে রাধারই মত কে একটি কিশোরী লীলা করছে।) কেন মরিতে আসিলাম যমুনায়, ললিতা, কেন বিপরীত হেরিলাম। কৃষ্ণ—যমুনা—জলে কারে লয়ে কুতূহলে জল খেলা করে ঘনশ্যাম॥'	'হাসিয়া মরি রাই কৃষ্ণ শ্যাম নাই যাবি হেন কোন দেশে' 'নজরুল-গীতি' অখণ্ডে (২০০৪) উপরোক্ত গানের অংশ হিসাবে 'তুই ফিরে যে আসবি শুভ্র জ্যোতিরূপে' গানের স্তবকগুলো বিন্যস্ত হয়েছে। গানের প্রথম পঙ্‌ক্তি দুটি নিম্নরূপ : 'হাসিয়া মরি রাই কৃষ্ণ শ্যাম নাই যাবি হেন কোন দেশে। সে যে সকল পন্থ দিগ্‌ দিগন্ত আগলি আছে শ্যাম দেশে॥' 'নজরুল গীতি' অখণ্ডে (২০০৪) এবং নজরুল সঙ্গীত সমগ্র (২০০৬) নিম্নোক্ত স্তবক নেই। '(অভিমানিনী শ্রীরাধার তবু মান যায় না। যমুনার জল নিতে গিয়ে দেখে—শ্রীকৃষ্ণ যমুনা জলে লীলা করেছেন আর তাঁর বক্ষে রাধারই মতো কে একটি কিশোরী লীলা করছে।) কেন মরিতে আসিলাম যমুনায়, ললিতা, কেন বিপরীত হেরিলাম। কৃষ্ণ—যমুনা—জলে কারে লয়ে কুতূহলে জল খেলা করে ঘনশ্যাম॥' গানটি বেতারে প্রচারিত 'অভিমানী' গীতি চিত্রে ব্যবহৃত হয়। শিল্পী : ইলা ঘোষ সুর : নজরুল

১	২	৩
৪৪. দুর্জয় অভিমান ত্যাজ ত্যজ রাধে	'দুর্জয় অভিমান ত্যজ ত্যজ রাধে' 'নজরুল রচনাবলী' ৩য় খণ্ডে (১৯৯৩) পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'তোরই আপনার মায়া' 'তুই সে পূতো স্বর কিশোরের বেণুকা' 'ভ্রমরা তুই তাঁর চরণ-কমলে' 'অরুণ-বর্ণ তোর তুই যে চন্দ্রা' 'ভুলাইছে মোরে কোন ছলে।' 'তোর গোপন রূপের আজ সব কথা বল।' 'সবই জানি ব্রজ-নারী-সবই জানে গো' 'দিনে তুই গুণ্ঠিতা কুণ্ঠিতা কুলবধূ'	'দুর্জয় অভিমান ত্যজ ত্যজ রাধে' হরফ প্রকাশনী প্রকাশিত' নজরুল-গীতি' অখণ্ডে (১৯৯৪) পঙ্‌ক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'তারই আপনার মায়া' 'তুই সে পীতাম্বর কিশোরের বেণুকা' 'ভ্রমরী তুই তাঁর চরণ-কমলে' 'অরুণ-বর্ণা হয়ে তুই যে চন্দ্রা হস' 'ভুলাইলি মোরে কোন ছলে।' 'তোর লীলার আজ সব কথা বলব।' 'সবই জানি ব্রজ রাণী-সবই জানি গো 'দিনে তুই কুণ্ঠিতা গুণ্ঠিতা কুলবধূ' 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' (২০০৬) গ্রন্থে পঙ্‌ক্তিগুলো একইরূপ। গানটি 'অভিমানিনী' গীতিচিত্রের। তারিখ ০৯.১১.১৯৪০
৪৫. (ঠাকুর) তেমনি আমি বাঘা তেঁতুল	'(ঠাকুর !) তেমনি আমি বাঘা তেঁতুল' 'নজরুল রচনাবলী' ৩য় খণ্ডে (১৯৯৩) স্তবকটি নিম্নরূপ : 'কেঁদে হেঁই হেঁইয়ে করে, তোমার তার তরে প্রেম নেই।' তুমি আয়ান ঘোষকে ধরা দিলে দেখলে পুঁতো যেই সেদিনও নদীয়াতে কলসি কানার ঠ্যালাতে' '(ঐ নবদ্বীপে) ভোগ দিল না গোবিন্দ ঘোষ' 'তোমার চাঁচর কেশে মুড়িয়ে ঢালব মাথায় ঘোল।' নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তি দুটি নেই : 'আমার ভাঙা কুঁড়ের চালে।' 'ধরর যেদিন বুঝবে ইয়ে',	'(ঠাকুর !) তেমনি আমি বাঘা তেঁতুল' 'নজরুল-গীতি' অখণ্ডে (২০০৪) স্তবকটি নিম্নরূপ : 'কেঁদে হেঁই হেঁইয়ে যে করে, তার তরে তোমার প্রেম নেই।' তুমি আয়ান ঘোষকে দেখা দিলে দেখলে লাঠি যেই সেদিনও নদীয়াতে কলসি কানার এক ঘায়েতে' (ঐ অগ্রদ্বীপে ভোগ দিল না গোবিন্দ ঘোষ 'চাঁচর কেশ মুড়িয়ে ঢালব মাথায় ঘোল' নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিদ্বয় আছে— 'আমার ভাঙা কুঁড়ের চালে ধরব যেদিন বুঝবে ইয়ে,' গানটির রেকর্ড নং এন. ২৭২০৩, এইচ.এম.ভি., ১৯৩৮ শিল্পী : হরিদাস ব্যানার্জী।

বর্ণানুক্রমিক সূচি

অ

আ

খ

গ

থ

দ

প

ফ

ব

ভ

ম

য

শ

স

হ